Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত

শফীউদ্দীন সরদার

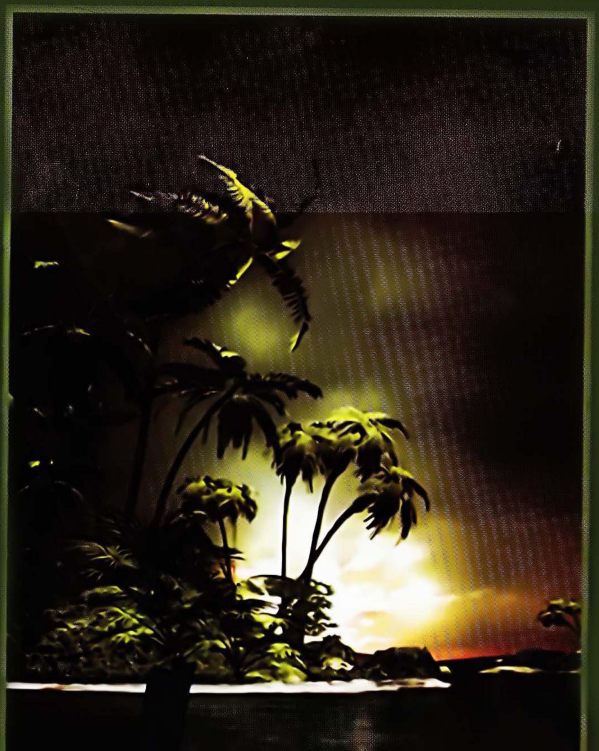

রোকন

বইঘর

দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত
www.boighar.com

দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত

www.boighar.com

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর
www.boighar.com
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭

দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত
শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১২
www.boighar.com
দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
www.boighar.com
মূল্য : ২৪০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0045-0

DIPANTARER BITTANTO : By ShafiUddin Sarder
Published by : S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** October 2012 © by the publisher
www.boighar.com
Price : 240 Taka only

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

www.boighar.com

আজাদী আন্দোলনের সকল সৈনিক–
যাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে
আজ আমরা স্বাধীন

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের
উত্তম প্রতিদান দিন।

–লেখক

দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

ভূমিকা

www.boighar.com

'একটা মিথ্যা কথা দশবার বললে সেই মিথ্যাটাই সত্য হয়ে যায় আর সত্যটা চলে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।' এই প্রবাদটির প্রেক্ষিতেই আমার এই 'দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত' গ্রন্থটি লেখা।

www.boighar.com

একটি অমুসলমান সম্প্রদায় হাজারটা মিথ্যাচারের, প্রতারণার আর বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ঈসায়ী সতেরশ' সাতান্ন সনে এই পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশটি তুলে দেয় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা এদেশের মালিক হওয়ার পর মুহূর্ত থেকে ঐ সম্প্রদায়টি দেবতাজ্ঞানে ইংরেজদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা করা শুরু করে। এই পূজা ভক্তির বদৌলতে ঐ সম্প্রদায়টি লাভ করে প্রভূত ক্ষমতা, সম্পদ, পদ, পদবী, খেতাব, পুরস্কার এবং ইংরেজদের অনুগ্রহে হয়ে যায় জমিদার ও রাজা মহাজারা। এই সম্প্রদায়টি দেশের সর্বত্রই রাজা-মহারাজা ও জমিদার হয়ে বসে যায় এবং ইংরেজদের পক্ষে ও ইংরেজদের ছত্রচ্ছায়ায় এরাই দেশের শাসককুলে পরিণত হয়।

এই অপরিসীম অনুগ্রহ লাভের কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে ইংরেজদের তারা তাদের 'ভাগ্যবিধাতা' বলে অভিহিত করে এবং ইংরেজদের বন্দনায় তারা সকাল-সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠে।

অথচ হাস্যকর ব্যাপারটা হলো এই যে, ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর থেকে এই দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্যে এই অমুসলমান সম্প্রদায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল যাবত ইংরেজদের তাড়ানোর সংগ্রামে প্রাণপাত করেছে মর্মে এরা একের পর এক মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছে এবং আজও করে চলেছে। এইসব মিথ্যা কাহিনীর মধ্যে তারা তুলে ধরেছে, ইংরেজদের তাড়ানোর জন্যে একমাত্র তারাই দীর্ঘকাল যাবত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে, তারা ছাড়া অন্য কোন

সম্প্রদায় বা কোন কেউই ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা আঙ্গুলও তুলেনি।

এদের এই কল্পিত কাহিনীর বিপরীতে আসল ইতিহাস হলো এই যে, ঈমানদার শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়, অর্থাৎ মুসলিম মনীষীরা, ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর মুহূর্ত থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং ঈসায়ী সতেরশ' সাতান্ন সন থেকে আঠারশ' সনের শেষভাগ পর্যন্ত লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নেমে লাখ লাখ মুসলিম মনীষী মৃত্যুবরণ করেছে, লাখ লাখ মুসলিম মনীষী ইংরেজদের দ্বারা অমানুষিক ও পাশবিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে, জেল ফাটক খেটেছে, লাখ লাখ মুসলিম মনীষী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে, লাখ লাখ মুসলিম মনীষী দ্বীপান্তরে গিয়েছে।

অথচ এই দিবালোকের মতো সত্য ইতিহাসের ছিটে-ফোঁটাও ঐ অমুসলমান সম্প্রদায়ের কল্পকাহিনীর মধ্যে আসেনি।

আগামী প্রজন্মের কাছে ওদের এই মিথ্যাটাই যাতে করে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং সত্য ইতিহাসটা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে না যায়, এই উদ্দেশ্যেই এই 'দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত' গ্রন্থটি আমার লেখা।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের সামনে কল্পকাহিনীকারদের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসুক আর মুসলিম মনীষীদের অকাতর ও হৃদয়বিদারক আত্মদানের বিষয় অবগত হয়ে দু'ফোঁটা চোখের পানি না ফেলুক, আগামী প্রজন্ম এই মনীষীদের স্মরণে অন্তত একটু শ্রদ্ধাবনত হোক, এই কামনা করি। আমিন।

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার
১৮/০৯/২০১২

আমাদের কথা

www.boighar.com

চাপাপড়া ইতিহাসের কংক্রিট দরোজা যেসব দরদী ঐতিহাসিক নিপুণ হাতে হাতুড়ি-শাবল চালিয়ে আলগা করেছেন তাঁদের অন্যতম এক দক্ষ কারিগর শফীউদ্দীন সরদার। আল্লাহ তায়ালার কাছে হাজার শোকর, বর্ষীয়ান এ কর্মবীরের শেষ কয়েকটি বই আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এ শুধু আমাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা আর দোয়ার বরকতেই সম্ভব হয়েছে।

প্রায় দুইশ' বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই উপমহাদেশের সত্যিকার ইতিহাসের উপর যতটা অবিচার হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জনপদে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এখানে হিরোকে জিরো আর খলকে হিরো বানিয়ে পূজা চলেছে অনেক। সাম্রাজ্যহারা মুসলিম জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই বৃটিশদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় এই দুইশ' বছর ছিলো কেবলই মুসলমানদের জন্যে এক জুলমতের জামানা। তদুপরি প্রায় হাজার বছর ধরে মিলেমিশে থাকা হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সাদা-ভল্লুকরা তাদের অন্যায় শাসনকে বিলম্বিত করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু অবাক করা কথা হলো, অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় আগে বৃটিশরা বিতাড়িত হলেও এখন পর্যন্ত বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সত্যিকার নায়কদের আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি। বরং এমন সব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা এতটাই মাতামাতিতে মত্ত থাকি যে, নিজেদের মাত্র দু'তিনটা শতকের ইতিহাস সম্পর্কেও জানতে ও জানাতে তেমন গরজবোধ করছি না।

এই উপমহাদেশ বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত করতে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি হলেও কৃতিত্বের তালিকায় তাদের নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দখলদার বৃটিশদের কবল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করতে কত রক্তক্ষয় হয়েছে, কত জীবনের কুরবানী এই মুসলমানরা দিয়েছে মোটা দাগে হলেও তার কোনো শুমার আমাদের সামনে নেই। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসে শফীউদ্দীন সরদার স্বাধীনতাকামী আলেম-সমাজের জেহাদ সংগ্রাম, বিশেষত বৃটিশ-শাসনের মধ্যবর্তী সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি অত্যন্ত দরদ দিয়ে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বাধীনতাকামী মুসলিম সেনানায়করা যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিলেন পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সেই আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে– তারই হৃদয়বিদারক চিত্র ফুটে ওঠেছে ঐতিহাসিক উপন্যাস দ্বীপান্তরের বৃত্তান্তে। এখানে লেখক ইতিহাসই তুলে ধরেছেন গল্পের ঢংয়ে, বাস্তব চরিত্রের রূপায়নে।

www.boighar.com

আশা করি শেকড়সন্ধানী ঔপন্যাসিক শফীউদ্দীন সরদারের ভক্ত অনুরক্ত পাঠকরা এ থেকে ভিন্ন স্বাদের ছোঁয়া পাবেন। আর ইতিহাস-অন্বেষী পাঠকের জন্যে এটি একটি অসাধারণ সংগ্রহ হিসেবেও বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। আমরা সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি।

www.boighar.com

তারিখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈ.

সমর ইসলাম
পরিচালক (সার্বিক)
বইঘর

ধনাঢ্য পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান কাসিদ আহসান উল্লাহ। মানিক চকবাজারে প্রাসাদতুল্য বাড়ি তাঁর। বিশাল অট্টালিকা। শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় পিতামাতা যত্ন সহকারে তাঁকে বিদ্যা শিক্ষা দান করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশ ও ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করে তিনি দুর্লভ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবি-ফারসিসহ ইংরেজি, বাংলা, গণিত, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানের অন্যান্য সকল শাখায় ঈর্ষণীয় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি যখন স্থায়ীভাবে গৃহে ফিরে এসেছিলেন তখন অজ্ঞাত অসুখে আক্রান্ত হয়ে তাঁর আব্বা এবং আম্মা দু'জনই পরপর ইন্তেকাল করেন। ভাইবোন কেউ না থাকায় বিশাল বাড়িতে তিনি একা হয়ে যান। এতে করে বিরাট ভাবান্তর আসে তার মধ্যে। অবশেষে জেহাদী জীবন বেছে নেন তিনি। কাসিদের দায়িত্ব গ্রহণ করে জেহাদের মূল ডেরা, অর্থাৎ সদর দপ্তরে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) অর্থ ও মুজাহিদ পাঠানোর কাজে লিপ্ত হন। এতে করে বিয়ে-শাদী করার সুযোগ তো পানইনি, মানিকচকের ঐ বিশাল বাড়িতে সব সময় তিনি থাকতেও পারেন না। মাঝে মাঝেই তাঁকে বাড়ি ছেড়ে, কাসিদের কাজে সীমান্তে ছুটোছুটি করতে হয়। তারপর...?

উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পড়ুন– **দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত**

www.boighar.com

১

www.boighar.com

উস্তাদ : আর বাঘের বাঘ, কি, রসূলের জাহির–
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর।
সাগরিদগণ : আর বাঘের বাঘ, কি রসূলের জাহির–
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর।
উস্তাদ : এক বাঘের নাম চিতার মাও,
সোনাপীরের ধোয়ায় পাও–
সাগরিদগণ : আর বাঘের বাঘ, কি রসূলের জাহির–
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর।
উস্তাদ : এক বাঘের নাম ভয়ংকরী,
বলে, পীর তুর পায়ে পড়ি–
সাগরিদগণ আর বাঘের বাঘ, কি রসূলের জাহির–
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর।
উস্তাদ : এক বাঘের নাম আউল বাউল,
রাস্তায় বসে ভাজে চাউল–
সাগরিদগণ : আর বাঘের বাঘ, কি রসুলের জাহির–
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর।

www.boighar.com

খেয়াপারের বিরাট এক নৌকা। বিশাল ও প্রশস্ত এক নদী পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে যাচ্ছে। নৌকা বোঝাই নানা পেশার, নানা নেশার আর নানা ধান্দার লোক। নদীটা শুধু প্রশস্তই নয়, খরস্রোতা। আর এতটাই প্রশস্ত যে, আধা ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে খেয়া-তরীটা এক পাড় থেকে অপর পাড়ে পৌঁছতে। এই দীর্ঘ সময় নৌকায় থাকার ফলে, নৌকার এক এক স্থানে এক এক দল লোক নানা রকম আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজব ও নানা গীত জুড়ে দিয়েছে। এখানে নৌকার এই মাঝামাঝি স্থানে নৌকার ধার ঘেঁষে বসে তরুণ হজরত আলী তার চেয়ে আরো কম বয়সী সাগরিদদের নিয়ে মশ্‌ক করছে

বইঘর.ও রোকন
সোনাপীরের গীত। পাশেই বসেছিলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। এই গীত শুনতে শুনতে তিনি হজরত আলীকে প্রশ্ন করলেন– এসব কি গাইছো রে ভাই? কিসের ধুয়া গাইছো? www.boighar.com

ছিমছাম পোশাকের তার চেয়ে কিছু বড় এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি প্রশ্ন করায় ছেদ পড়লো হজরত আলীর গীতে। গীত থামিয়ে সে ঢোক চিপে বললো– এইটা? এইটা সোনাপীরের গীত স্যার।

কাসিদ আহসান উল্লাহ হাত তুলে বললেন– উঁ-হুঁ, স্যার নয়; ভাইসাহেব, ভাইজান, এসব বলো।

হজরত আলী খুশি হয়ে বললো– ভাইজান? বড়ই খোশ, বড়ই খোশ! আপনি একজন বিরাট দিলের মানুষ আছেন ভাইজান। মোটেই অহংকারী নন!

: তা যা-ই হই, তোমরা– মানে তুমি–

: আমার নাম হজরত আলী। হজরত আলী মণ্ডল।

: তুমি কি বংশগতভাবে একজন গায়েন?

: জি না ভাইজান। কিছু জমিজমা আছে, কিন্তু সংসারে কেউ নেই। তাই এই গান-গীত গেয়ে জীবন কাটাই।

: তা এখানে...

এখানে এই পোলাপাইনদের নিয়ে সোনাপীরের গীত মশ্‌ক করছি। পৌষমাস এসে গেছে তো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা সোনাপীরের গীত গেয়ে ধান মাঙতে বেরোবো।

: মাঙতে বেরুবে?

না-না, আমাদের খাওয়ার জন্যে নয়। আমরা মেঙে খাইনে, খেটে খাই। দিনের বেলা কাজ কাম শেষ করে রাত একটু ভারী হলে আমরা মাঙতে, মানে মাঙোনে বেরোই।

: মাঙোনে?

: জি-জি, সোনাপীরের শিরনী পাকানোর জন্যে ধান মাঙতে বেরোবো। মেঙে আনা ধান ছাড়া ঐ পীরের শিরনী ঘরের ধান দিয়ে হয় না। তাই আমরা...

ঐ পীর মানে?

মানে জব্বোর কামেল পীর বা ফকির, ভাইজান। বিরাট তার মাজেজা। গানের ধরন দেখেই তো বুঝতে পারছেন, কত বড় কামেল ফকির উনি। বাঘ-ভাল্লুক, ভূত-প্রেত যেমনি উনাকে ভয় করে তেমনি ভক্তি করে। আমরাও

ঐ পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে এই পৌষ মাসের পুষনের দিনে, মানে পৌষ সংক্রান্তির রাত পোহানোর সাথে সাথে প্রতি বছর ঐ মাঙা ধানের চাল দিয়ে মাঠে ময়দানে বসে শিরনী পাকাই আর সেই শিরনী বিতরণ করি ছোট বড় সবার মাঝে।

: আচ্ছা!

বাপরে বাপরে বাপ! যে সে পীর নন উনি! একেবারে ডাকসাঁইটে পীর। জীন-ইনসান, পশু-পাখি সবাই প্রাণ ঢেলে খেদমত করে উনার। বাঘ-সিংহেরা তো ঐ পীরের খেদমতে হরওয়াক্ত তৈয়ার। ঠিক ঐ কালুগাজী চম্পাবতীর কাহিনীর মতো ব্যাপার স্যাপার।

হ্যাঁ, ঐ কাহিনীর মতো এটাও একটা কেচ্ছা-কাহিনী। এর মধ্যে কোন আসমানী মোজেজা নেই।

সে কি! নেই?

: না, কিছুই নেই।

তাজ্জব! তাহলে যে উনাকে কামেল পীর মনে করে উনার শিরনী করি আমরা?

সেরেফ শেরেক (শিরক) করো তোমরা।

বলেন কি ভাইজান! জীবনে তো আল্লাহ রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ কিছুই করতে পারলাম না, তাই ভাবলাম এই পীর সাহেবের গুণগান করে তার মাধ্যমে কিছু সওয়াব কামিয়ে নিই।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন– এই থামো থামো। তুমি এমন বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলছো, লেখাপড়া কিছু জানো নাকি?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে হজরত আলী বললো– মক্তবটা ভালভাবেই পাশ করেছিলাম ভাইজান। কিন্তু আমার আম্মাজান ইনতেকাল করার সাথে সাথে আপনজন বলতে সবাই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আর পড়াশোনা করার কোন উৎসাহ পাইনি। শুধু তাই নয়, সবাইকে হারিয়ে মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে, কিছুই আর ভাল লাগেনি আমার। করার কিছু না থাকায়, এই গান-গীত গেয়ে এখন জীবন কাটাই।

আচ্ছা। তাই গান-গীত গাও?

জি ভাইজান। সোনাপীরের গান গেয়ে ঐ পীরের মাধ্যমে কিছু সওয়াব কামানোর উদ্দেশ্যেই এই গানটা বেশি বেশি গাই। কিন্তু আপনি বলছেন–

: হ্যাঁ বলছি। সওয়াব কামাই হবে না ওতে; বরং গুনাহ হবে।

: ভাইজান!

আল্লাহ তায়ালা কোন পীর দরবেশকে অলৌকিক ক্ষমতা দেননি। ওদের মধ্যে কোন ঐশ্বরিক মোজেজা নেই। ওদের বন্দনা করা মানেই গুনাহ করা।

বলেন কি? এতদিন শুধু ভূতের বেগার খাটলাম! কোন সওয়াবই অর্জন হলো না তাতে?

না, হলো না। যদি সওয়াব অর্জন করতে চাও, তাহলে ঐ সব কেচ্ছা-কাহিনীর পেছনে না ছুটে নামায-রোযা করো, আল্লাহ রসুলের যিকির-আযকার করো, পরকালের অশেষ পুণ্য, মানে সওয়াব অর্জন করার সাথে ইহকালের অনেক শান্তি আর সজীবতা লাভ করবে।

: তাই? কিন্তু ঐ পীরের গীতগুলো তো বড়ই মন কাড়ে ভাইজান!

কাড়ুক। ওতে কোন সওয়াব নেই। তার চেয়ে ঐ যে ঐ মাঝিটা যে গান গাইছে, ওটা শোনো। ওটা শুনলে কিছু সওয়াব হবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে।

বলেই তিনি মন দিলেন সেই দিকে। তা দেখে হজরত আলীও সেই দিকে মন দিলো। ভাটির স্রোতে হাল ধরে থেকে মাঝিটা তখন তন্ময় হয়ে গাইছে–

জীবন পারাবারের মাঝি আলোক-অন্ধকারে
প্রাণ রসদের খেয়াতরী, এপার ওপাড় দিচ্ছে পাড়ি,
দিনের শেষে অপর পাড়ে ভিড়ায় তরীটারে....।

কথাবার্তা বন্ধ করে আশপাশের সকলেই আগ্রহ ভরে মাঝির এই গানটা শুনছিল। কিন্তু সব পণ্ড করলো। টোকাই মার্কা এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সে লাফ দিয়ে মাঝির কাছে এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো– এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

বাধা পড়লো মাঝির গানে। সে গান থামিয়ে প্রশ্ন করলো– মানে?

টোকাইটা হুকুমের সুরে বললো– মানে ইংলিশ। ইংলিশ বোলো, ইংলিশ! ইংলিশছে বাত করে।

থমকে গিয়ে মাঝি বললো– ইংলিশ?

টোকাইটা বললো– জরুর! ইংলিশ রাজত্বে বাস করবে আর ইংলিশ বলবে না!

গানটা থেমে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ! তখনই তিনি উঠে

বইঘর ও য়েফিন

টোকাইটার কাছে গেলেন এবং তাকে প্রশ্ন করলেন– তুমি তাহলে ওটা কি বলছো? ইংলিশ?

টোকাইটা বুক ফুলিয়ে বললো– আলবাত্! এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

বটে? ওটার মানে কি হলো?

মানে? মানে হলো– আমি একজন এক নম্বরের জেন্টল ম্যান। এ্যান্টেনাস এ্যান্ট।

এ্যান্ট! বলো কি? এ্যান্ট মানে তো পিঁপড়া।

সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে টোকাইটা আরো বুক ফুলিয়ে বলে চললো– হোক হোক, ডাই পিঁপড়ে যা হয় হোক। এ্যান্টেনাস্ এ্যান্ট্ ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

কাসিদ আহসান উল্লাহ বিরক্ত হয়ে বললেন– আরে থামো। কি এসব বলছো?

:, ইংলিশ ইংলিশ। ইংলিশ ছাড়া আমি কোনো কথাই বলি না আজকাল।

হুঁউ। তোমার ইংলিশের ধরন দেখেই তা বুঝেছি। পেশাটা কি তোমার? কি করে খাও?

কি করে খাই?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। চুরি করে নাকি?

চুরি? নো-নো। সার্ভিস, সার্ভিস করে খাই। বিরাট সম্মানী পেশা আমার।

বটে! তা সার্ভিসটা তোমার কোন চুলোয়? কি রকম সার্ভিস তোমার?

হোম সার্ভিস, হোম সার্ভিস।

হোম সার্ভিস? একদম? ফরেন সার্ভিস নয়?

আরে দূর দূর! ফড়িং সার্ভিস হবে কেন? একদম হোমে সার্ভিস আমার।

হোমে? তাই বলো। তা কার হোমে?

আমার স্যারের হোমে।

স্যারের হোমে? নাম কি তোমার স্যারের?

ডগ সাহেব, ডগ সাহেব। খাঁটি বিলাইতি লোক। এই এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

কি নাম বললে? ডগ সাহেব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ডগ সাহেব। কানে কি কম শুনেন?

কি আশ্চর্য! ডগ কোন মানুষের নাম হয়?

টোকাইটা কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললো– হয় না? তাহলে ডগ সাহেব নয়, হগ সাহেব। আমারই তাহলে ভুল হয়ে গেছে।

কাসিদ সাহেব হেসে বললেন– যাব্বাবা! কুকুর থেকে শূকর?

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, কুকুর না হলে শূকর। আস্ত শূকর।

: সাব্বাশ! আস্ত শূকর?

বিলকুল। বিলাইতি কারবার, বুঝলেন? কোনো ঘুরপ্যাঁচ নেই। হগ বললে হগ, ডগ বললে ডগ।

মারহাবা মারহাবা! তা তোমার নামটা কি?

: আমার নাম? খাসা নাম। মিঃ ফ্যাটিগ চেন।

: ফ্যাটিগ চেন! কি তাজ্জব! এ আবার কি নাম?

: ইংলিশ নাম। খাস্ ইংলিশ নাম।

ইংলিশ নাম? বাংলা নামটা কি তাহলে?

: বাংলা নাম?

হ্যাঁ। ফ্যাটিগ মানে তো ফ্যাক খাটা। শাস্তি ভোগ করা। চেন মানে শিকল। শিকলে বেঁধে তোমাকে ফ্যাক খাটানো হয় বলেই কি নামটা তোমার ফ্যাটিগ চেন?

দূর দূর! তা হবে কেন? আমার সাহেব আমাকে 'ফ্যাটিগ চেন' বলে ডাকেন। আমার সাহেবের রাখা নাম। ওটা কি কোন ফালতু ঘটনা? এই জন্যেই তো নামটা আমার জবরদস্ত নাম।

: তাজ্জব! তোমার জবরদস্ত নামটার তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে।

পারবেন কি করে? ইংলিশ নাম বুঝতে হলে ইংলিশ জানতে হয়। আমার মতো ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, খামুশ! বেহুদা কাঁহাকার! তোমার কি কোন বাংলা নাম নেই? ঐ ইংলিশ সাহেব ছাড়া তোমার বাপ-মা কি কোন নামই রাখেননি তোমার?

রাখবেন না কেন? ঐ নামটা তো আমার বাপ-মায়ের রাখা নামই। আমার সাহেব ওটাকে ইংলিশ করে নিয়েছেন।

কি রকম?

সাহেব ফটিক বলতে পারেন না বলে 'ফ্যাটিগ' আর চান– মানে চান্দ; ঐ চান বলতে না পেরে বলেন 'চেন'। নইলে তো আমার বাংলা নামটা হলো– ফটিক চান।

আহসান উল্লাহ সাহেব হেসে উঠে বললেন– ও, ফটিক চান, মানে ফটকে?

ফটকে? মানে?

মানে, আসল নামটা তোমার তাহলে ফটকে। ফটিক চান্দ বা ফটিক চান বলতে যায় আর ক'জন? তোমাকে নিশ্চয়ই সবাই ফটকে বলে ডাকে। বলো, ঠিক বলছি কিনা?

ফটিক চান ফটকে থতমত করে বললো– বলুক, বলুক তা, বললেই কি আমার দাম কম হয়ে যাবে?

দাম! তুমি খুবই দামী মানুষ নাকি?

দামী নই মানে? আমার ডগ সাহেবকে বলে এখনই আমি আপনাকে ফাটকে তুলতে পারি, তা জানেন?

ফাটকে? ফটকে তুলবে আমায় ফাটকে? তবেই হয়েছে।

হাসতে লাগলেন আহসান উল্লাহ সাহেব। ফটিক চান ফটকে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– হাসছেন কেন? বিশ্বাস হয় না? আমার ডগ সাহেবকে বললে এক নিমিষের মধ্যে আপনাকে উনি ফাটকে তুলে ফেলবেন। আমার ডগ সাহেব যে সে মানুষ নয়।

তাই? তা ডগ আবার মানুষ হয় নাকি?

কি বললেন? মানুষ হয় না? মানুষ হয় না মানে? আমার হগ সাহেব, থুড়ি থুড়ি, ডগ সাহেব, মানে ডগলাস– ডগলাস, তার উপর মরদের বেটা মরদ।

আচ্ছা! তোমার সাহেবের নাম তাহলে ডগলাস সাহেব?

ডগলাস ডগলাস! এই এলাকার বাঘ। এদেশের মানুষের মতো কোন ছাগল ভেড়া নয়।

বলো কি? এদেশের মানুষ ছাগল বেড়া?

বিলকুল বিলকুল। সবগুলো ভেড়া।

আর তোমার ইংলিশ সাহেবরা?

বাঘ বাঘ। প্রত্যেকেই আস্ত বাঘ। ভাগ্যে, ওরা এদেশে এসে দেশটা দখল করে নিয়েছিল। নইলে আজীবন আমাকে এদেশের এইসব ভেড়ার দলের চাকর হয়ে থাকতে হতো।

বটে!

এখন দেখুন, কেমন বাঘের চাকরি করি আমি। আমার স্যার তো স্যার, আমাকে দেখেও এ দেশের সব ব্যাটা এখন থর থর করে কাঁপে।

শরম করে না তোমার? স্বদেশী ভাই বেরাদরদের ভেড়া আর বিদেশী বেপারীদের বাঘ বলতে লজ্জা হয় না তোমার?

তা হবে কেন? আমার ইংলিশ স্যারেরা হলেন গিয়ে দেবতুল্য লোক। দেবতার সুখ্যাতি করতে লজ্জা হবে কেন?

কে-ন, তা বোঝার মতো জ্ঞান কি তোমার আছে? তা থাকলে কি স্বদেশী স্বজনদের ভেড়া আর বিদেশী কুকুরদের দেবতা বলো তুমি?

দুই চোখ বিস্ফারিত করে ফটিক চান ফটকে বললো– আচ্ছা, এই সা বাত? ধরে ফেলেছি, আপনাকে ঠিক ধরে ফেলেছি এবার।

ধরে ফেলেছো কি রকম?

আপনি ঠিক আমার ইংলিশ হুজুরদের দুশমন। আপনি একজন এলেমদার মুসলমান। মোল্লা-মুসল্লী মানুষ। আমার স্যারদের আপনি দুশমন না হয়েই যান না।

: তাই নাকি?

ধরে ফেলেছি। আপনি আমাকে ধরতে না পারলেও আপনাকে আমি ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছি।

: কি রকম? তোমাকে ধরতে না পারলেও মানে?

ফটিক চান ফটকে দম্ভের সাথে বললো– টিকটিকি টিকটিকি। সাহেবদের পক্ষের একজন তুখোর গোয়েন্দা আমি। আপনাদের মতো ইংলিশ-বিরোধী লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করার জন্যেই আমায় ইংলিশ হুজুরেরা নিয়োগ করেছেন। আমাকে মোটা মাইনে দেন মাসে মাসে।

: সাব্বাশ!

সাব্বাশ নয়, সাব্বাশ নয়। এবার আপনার নাম ধামটা বলে দিন! আমার ডগ সাহেবের, মানে ডগলাস সাহেবের কাছে এখনই পেশ করি গিয়ে।

: আমার নাম ধাম?

হ্যাঁ, নামধাম মানে ঠিকানা। আমার ডগ সাহেবের কাছে আপনার সঠিক বৃত্তান্তটা পেশ করলে উনি জব্বোর খুশি হবেন।

: আমার কি বৃত্তান্ত পেশ করবে তুমি?

বৃত্তান্ত মানে, আপনি একজন জিহাদী। মুজাহিদ বাহিনীর লোক। আর জিহাদের একজন মস্ত বড় যোগানদার। আপনি গোপনে টাকা পয়সা আর জিহাদী লোকদের যোগাড় করে সীমান্ত এলাকায় আপনাদের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে থাকেন।

সদর দপ্তর?

মূল ডেরায়। সেরেফ টাকা পয়সা আর মুজাহিদ পাঠানোই নয়, আমার ইংলিশ হুজুরেরা কোথায় কি করছে, কাকে ধরছে, কাকে মারছে– সেসব খবরও পৌঁছে দেন আপনি। আপনি একজন সংবাদদাতা– মানে কাসিদ।

www.boighar.com

কাসিদ শব্দের মূল অর্থ সংবাদদাতা বা বার্তাবাহক। কথাটার উৎপত্তি হয় কারবালার ঐ মর্মন্তুদ ঘটনা থেকে। কারবালার ময়দানে ইমাম হুসেন (রা.)-এর সদলবলে শহীদ হওয়ার বার্তা বা সংবাদ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে যাঁরা 'হায় হুসেন– হায় হুসেন' বলে মাতম করতে করতে ছুটে ছিলেন, তাঁদের বলা হয় কাসিদ।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব মুজাহিদ বাহিনীর এমনই একজন কাসিদ। তিনি একজন মস্তবড় বিদ্বান মানুষ। একজন অত্যন্ত দর্শনধারী লোক। তবে এই কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব ষোল-সতের বছর আগের সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের উপদেষ্টা হাকিম আহসান উল্লাহ সাহেব নন। ইনি কাসিদ আহসান উল্লাহ মালদহী। মালদহ জেলার অন্তর্গত মানিকচক বাজারে তাঁর বাড়ি। নেশায় পেশায় ইনি অনেকটা ফজলে হক খয়রাবাদী বা মওলানা মোহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীর মতোই একজন ইংরেজ বিরোধী মানুষ।

এক ধনাঢ্য পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান এই কাসিদ আহসান উল্লাহ। মানিক চকবাজারে প্রাসাদতুল্য বাড়ি তাঁর। বিশাল অট্টালিকা। শিশুকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় তার পিতামাতা যত্ন সহকারে তাঁকে বিদ্যা শিক্ষা দান করেন। তিনিও বিপুল আগ্রহভরে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশ ও ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করে তিনি দুর্লভ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবি-ফারসিসহ ইংরেজি, বাংলা, গণিত, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানের অন্যান্য সকল শাখায় ঈর্ষণীয় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি যখন স্থায়ীভাবে গৃহে ফিরে এসেছিলেন তখন অজ্ঞাত অসুখে আক্রান্ত হয়ে তাঁর আব্বা এবং আম্মা

দু'জনই পরপর ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। ভাইবোন কেউ না থাকায় বিশাল বাড়িতে তিনি একা হয়ে যান। এতে করে বিরাট ভাবান্তর আসে তার মধ্যে। অবশেষে তিনি সকল দিক ত্যাগ করে জেহাদী জীবন বেছে নেন। কাসিদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি জিহাদের মূল ডেরায়, অর্থাৎ সদর দপ্তরে (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) অর্থ ও মুজাহিদ পাঠানোর কাজে লিপ্ত হন। এতে করে বিয়ে-শাদী করার সুযোগ তো পানইনি, মানিকচকের ঐ বিশাল বাড়িতে সব সময় তিনি থাকতেও পারেন না। মাঝে মাঝেই তাঁকে বাড়ি ছেড়ে, কাসিদের কাজে সীমান্তে ছুটোছুটি করতে হয়।

মাইনে করা লোক আয়েজ উদ্দিন ও ময়েজ উদ্দিন তাঁর গেটের ঘরে থেকে বারো মাস পাহারা দেয় তার বিশাল বাড়ি। বাড়িতে সব সময় না থাকার কারণে কোন কাজের ঝি বা রাঁধুনিও রাখা হয়নি তাঁর। যখন বাড়িতে থাকেন তখন জিহাদী লাইনের কিছু শিষ্য সাগরিদ এসে তাঁর রান্নাবান্না ও গৃহকাজ করে দেয়। কখনো কখনো এসব তিনি নিজেও করেন। আয়েজ উদ্দিন ময়েজ উদ্দিনও মাঝে মধ্যে হাত লাগায় তাঁর এসব কাজে।

ঈসায়ী ১৮৫৭ সনের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পর সারাদেশে ইংরেজদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ শক্ত হওয়ার ফলে, জেহাদী কর্মকাণ্ড দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসে আর কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের কাজেও তেমন তোড়জোর থাকে না। তাই আহসান উল্লাহ সাহেব ইংরেজ কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত ও দ্বীপান্তরে প্রেরিত মুসলিম মনীষীদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করার কাজের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন ইদানিং।

ফটিক চান ফটকের কথার জবাবে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব প্রশ্ন করলেন– আচ্ছা! তাহলে কাসিদ শব্দের অর্থ তুমি বোঝো?

ফটিক চান ফটকে বললো– কেন বুঝবো না? বললাম না, ইংলিশ স্যারদের পরে আমি একজন তুখোর গোয়েন্দা? দিন দিন, আপনার নাম-ঠিকানাটা চটপট দিয়ে দিন। আমার ডগলাস সাহেবকে আজই এ খবর...

কথা শেষ হলো না ফটকের। এই সময় হঠাৎই ঘটে গেল এক মস্ত বড় দুর্ঘটনা। তাঁদের খেয়া নৌকাটা যখন নদীর অপর পাড়ের কাছাকাছি এলো তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। অন্যান্যদের সাথে কাসিদ সাহেব দেখলেন তাঁদের খেয়া-নায়ের সামনে দিয়ে এইমাত্র একটা ছইওয়ালা ছোট নাও উজান

বইঘর ও রোকন

বেয়ে বেরিয়ে গেল আর বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই বিপরীত দিকে থেকে ভাটির স্রোতে বিপুল বেগে ধেয়ে আসা বিশাল এক মালবাহী নৌকা ঐ ছইওয়ালা ছোট নৌকাটার উপর উঠে পড়লো এবং ছোট নৌকাটা তলিয়ে দিয়ে ভাটিতে চলে গেল। এত দ্রুত চাপা দিয়ে চলে গেল যে, ছোট নৌকাটা সেকেন্ড কয়েক আর দেখাই গেল না। পরে যখন ছোট নৌকাটা জেগে, মানে ভেসে উঠলো তখন নৌকার ছই ও লোকজন কেউ নৌকাতে নেই। দেখা গেল নৌকার মাঝি ও একজন পুরুষ চড়নদার সাঁতরিয়ে নদীর তীরের দিকে যাচ্ছে আর একজন মেয়েছেলের চুল নদীতে ডুবছে আর ভেসে উঠছে এবং মেয়েটা ভেসে যাচ্ছে নদী বরাবর। দেখেই বোঝা গেল সাঁতার জানে না মেয়েটা।

দেখামাত্র খেয়া নায়ের কিছু লোক হায় হায় করে উঠলো। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব হায় হায় করতে না গিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে এবং দ্রুত বেগে সাঁতরিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেললেন। কাসিদ সাহেবের দেখাদেখি হজরতুল্লাহ মণ্ডলও ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে এবং ঐ মেয়েটার দিকে ছুটলো। কিন্তু কাসিদ সাহেব ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে জাগিয়ে ধরে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে এলেন এবং ডাঙ্গায় উঠে গেলেন। হজরত আলীও তাঁর পেছনে এসে ডাঙ্গায় উঠে পড়লো।

স্রোতের টানে তাঁরা এপাড়ের খেয়াঘাট থেকে বেশ কিছুটা ভাটিতে এসে ডাঙ্গায় উঠলেন। মেয়েটা অনেকখানি পানি গিলে ফেলেছিল। তাকে শুইয়ে দিয়ে পেটে কিছুটা ঠাশা দিলে পেটের পানি বেরিয়ে গেল আর জ্ঞান ফিরলো মেয়েটার। জ্ঞান ফেরার কিছু পরই হুঁশ ফিরলো তার। আর হুঁশ ফেরার পরেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। এরপর দিশেহারাভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো সে। মেয়েটা কোন বৃদ্ধাও নয়, বালিকাও নয়। সে পূর্ণবয়স্কা এক যুবতী। তাকে এদিক ওদিক চাইতে দেখে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– কি দেখছো? তুমি আর পানিতে নেই, তুমি এখন ডাঙ্গায়।

মেয়েটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষীণকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ! ডাঙ্গায়? কিভাবে ডাঙ্গায় এলাম?

ব্যস্তভাবে কাপড় চোপড় ঠিক করতে লাগলো মেয়েটা। কাসিদ সাহেব বললেন– আমি তোমাকে তুলে এনেছি।

আশ্বস্ত হলো মেয়েটা। বললো, আলহামদুলিল্লাহ। কাসিদ সাহেব প্রশ্ন করলেন– তোমার নাম?

মেয়েটা এবার স্পষ্টকণ্ঠে বললো– লায়লা বানু।

সচকিত হয়ে উঠলেন কাসিদ সাহেব। নামটা বশে চেনা। তাই ফের প্রশ্ন করলেন– লায়লা বানু? কোন লায়লা বানু?

মানিকচক বাজারের আহমদুল্লাহ খান সাহেবের নাতনী আমি।

লাফিয়ে উঠলেন কাসিদ সাহেব। শশব্যস্তে বললেন– সোবহান আল্লাহ– সোবহান আল্লাহ। তুমি খান সাহেবের নাতনী? কি তাজ্জব, কি তাজ্জব!

ভাল করে চেয়ে দেখে লায়লা বানু বললো– আপনি বোধ হয় কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব! তাই নয়?

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি আহসান উল্লাহ। আমাকে কি করে চিনলে?

: আপনাকে আমি চিনি। আমাদের বাড়িতে আপনাকে অনেক বার দেখেছি।

: কই, আমি তো তোমায় দেখিনি।

দেখবেন কি করে? আমি তো আব্রু করেছিলাম।

গলায় পেঁচিয়ে থাকা ভেজা ওড়নাটা মাথায় তুলে দিয়ে আব্রু করার চেষ্টা করলো লায়লা বানু। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বিপুল বিস্ময়ে আহমদুল্লাহ খান সাহেবের নাতনীর দিকে চেয়ে রইলেন।

আহমদুল্লাহ খান সাহেব। প্রবীণ আহমদুল্লাহ খান সাহেব মালদহের মানিকচক বাজারের আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিত্তশালী হলেও তিনি অত্যন্ত সদাশয়, নিরহংকারী, পরহেজগার ও পরোপকারী লোক। এতে করে তাঁর মহল্লার আপামর জনসাধারণ যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাঁকে। মনে প্রাণে তিনিও একজন ইংরেজ বিরোধী লোক ও জিহাদ আন্দোলনের সমর্থক এবং সাহায্যদাতা।

পরিবারটা তাঁরও ছোট। আপন বলতে একমাত্র নাতনী লায়লা বানু। সে ছাড়া আর আপন কেউ নেই। বিশ্বস্ত এক ঝি, বিশ্বস্ত এক বাজার সরকার আর নাতনী লায়লা বানুকে নিয়ে তাঁর সংসার। ঝি মরিয়ম বয়স্কা, বিশ্বস্ত ও পুরাতন। বাজার সরকার আজম শেখও বয়স্ক, বিশ্বস্ত ও পুরাতন বাজার সরকার, তথা কাজের লোক। বলতে গেলে কাজের ঝি মরিয়ম বিবিই সংসারটা তাঁর সামলায়। লায়লা বানুকে শিশুকাল থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করার দরুন তার প্রতি মরিয়ব বিবির সীমাহীন দরদ।

খান সাহেবের নাতনী লায়লা বানুও হাই মাদ্রাসা পাশ বিদূষী মেয়ে। কাছে কোলে ফাজেল কামেল পড়ার কোন মাদ্রাসা না থাকায় স্থানীয় হাই মাদ্রাসায়

পড়াশুনা করেছে সে। শাদির বয়স তার আগেই হয়েছে। মেয়েও খুবই সুন্দরী। তাকে শাদি করার জন্যে অনেক বড় ঘরের ছেলেরাও খুবই আগ্রহী। কিন্তু খান সাহেব আগ্রহী নন। একমাত্র নাতনীকে শাদি দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে তিনি একা পড়তে চান না। তিনি চান, একজন সুশিক্ষিত, সুদর্শন ও সৎচরিত্রের ছেলের সাথে শাদি দিয়ে নাতনীকে নিজ বাড়িতে রাখতে। কিন্তু ঘরজামাই রাখার মতো এমন ছেলে তিনি এখনও পাননি। তবে এমন ছেলে পাওয়ার খোঁজ করছেন তিনি।

এসব খবর সবই জানেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। লায়লা বানুর দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকার পর কাসিদ সাহেব ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– হায়-হায়! কি করি এখন? খেয়া নাও তো আবার আমাদের পারঘাটের দিকে চলে যাচ্ছে। ফিরে আসতে অনেক দেরী হবে। তোমাকে এখন তোমার দাদুর বাড়িতে কিভাবে পৌঁছে দিই?

লায়লা বানু শীতে মৃদু মৃদু কাঁপছিল। তা লক্ষ্য করে আহসান উল্লাহ সাহেব আরো চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন– হায়-হায়! ভেজা কাপড়ে এইভাবে এতক্ষণ থাকলে তো তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে নির্ঘাত! কি গজব, কি গজব! কি করি এখন?

হজরত আলী এতক্ষণ তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। এবার সে সোচ্চারকণ্ঠে বললো– ভয় নেই ভাইজান, ভয় নেই। উনার জন্যে শুকনো শাড়ি, জামা, পেটিকোট আর আপনার জন্যে শুকনো লুঙ্গি জামা এখনই এনে দিচ্ছি। আমারও তো ভেজা কাপড় বদলানো দরকার।

কাসিদ সাহেব বললেন– সেকি! কোথা থেকে আনবে?

হজরত আলী বললো– এই পারঘাটের পেছনেই শ'দেড়শ' গজ দূরে এক বর্গাদারের বাড়ি। এক দৌড়ে যাবো আর আসবো–

সেকি! তোমার বর্গাদার মানে?

সে সব কথা পরে বলবো ভাইজান। আগে কাপড় চোপড় আনি... দৌড়ের উপর চলে গেল হজরত আলী মণ্ডল। ছইওয়ালা ঐ ছোট নৌকার মাঝি ও পুরুষ চড়নদারটা অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে এদের কথাবার্তা শুনছিল। এই সময় তারা দেখতে পেলো তাদের ছইহীন নাওটা জেগে উঠে দ্রুত ভাটিতে ভেসে যাচ্ছে। তা দেখেই পুরুষ চড়নদারটা ব্যস্তকণ্ঠে বললো– তাহলে হুজুর মেয়েটাকে আপনিই ওর বাড়িতে পৌঁছে দিন। ঐ যে আমাদের নৌকাটা ভেসে যাচ্ছে। ভাড়া করা নৌকা। নৌকাটা ধরে আমরা নৌকার মালিকের

কাছে পৌঁছে দিই। আমাদের ছইটা গেছে, যাক–

বলেই ওরা দুইজন দৌড় দিলো ভেসে যাওয়া নৌকার দিকে।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব লায়লা বানুকে প্রশ্ন করলেন– নৌকায় চড়ে কোথা থেকে আসছিলে?

লায়লা বানু বললো– আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। ক্রোশখানেক ভাটিতেই সেই আত্মীয়ের বাড়ি। সঙ্গে আসা ঐ মাঝি আর চডনদার দু'জনই সম্পর্কে আমার চাচা হন। আমার আত্মীয়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কাজের লোক। আমার আত্মীয় ব্যস্ত থাকায়, ওদের সাথেই আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই হজরত আলী নিজে কাপড় বদল করে এঁদের জন্যে শুকনো কাপড়-চোপড় নিয়ে ছুটে এলো। কাসিদ সাহেবের নির্দেশে লায়লা বানু একটু দূরে সরে গিয়ে পোশাক বদল করে এলো। কাসিদ সাহেবও ইতিমধ্যে পোশাক বদল করে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তিনজনই ভেজা কাপড়-চোপড়গুলো নেয়ে চলে এলেন খেয়াঘাটে। খেয়া নাও ফিরে আসতে তখনও দেরী ছিল। তাই হজরত আলী তাঁদের একপাশে এক নিরিবিলি ছাউনির নীচে নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চ পেতে বসালো। বসার পর কাসিদ সাহেব হজরত আলীকে প্রশ্ন করলেন– কার বাড়ি থেকে আনলে এইসব শুকনো কাপড়-চোপড়? তোমার বর্গাদার না কার যেন বাড়ি থেকে?

হজরত আলী বললো– জি, জি, আমার বর্গাদারের বাড়ি থেকেই।

: বর্গাদার মানে?

সে অনেক কথা।

হোক অনেক কথা। তুমি বলো। পারের নৌকা আসতে তো এখনও দেরী আছে।

অগত্যা হজরত আলী বলে গেল তার বিররণ–

হজরত আলী মণ্ডল। মক্তবটা ভালভাবেই পাশ করা এক তরুণ। মক্তব পাশের পর পরই তার আম্মা মারা যাওয়ায় সংসারে সে একদম একা হয়ে যায়। তার পিতা বা ভাইবোন কেউ ছিল না। এতে করে মক্তব পাশ করার পর পড়াশুনায় আর সে মন বসাতে পারেনি। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এখন সে গান গীত গেয়ে দিন কাটায়। গাঁয়ের এক কাজের মেয়ে পাকশাক করে দেয়

বইঘর ও রোকন

তাকে।

অনেকখানি তার জমিজমা। মানিকচকের খেয়াঘাটের অপর পাড়ে তার বেশ কয়েক একর জমি চাষ করে মেহের আলী নামের এক লোক। খেয়াঘাটের পাড়ের পেছনেই তার বাড়ি। বর্গা হিসাবেই হজরত আলীর জমি চাষ করা শুরু করে ঐ বর্গাদার। প্রথম প্রথম কিছু কিছু ফসল, মানে ফসলের দাম, হজরত আলীকে দিতো সে। ইদানিং আর বিশেষ কিছু দেয় না। হজরত আলীর সে পয়সার দরকারও পড়ে না। খেয়াঘাটের এপারে মানিকচক বাজারের পাশেই গাঁয়ের মাঠে অনেকখানি জমিজমা আছে হজরত আলীর। সেই আবাদই সে পুরোপুরি সংগ্রহ করে না। মেহের আলী বর্গাদারের আবাদ না পেলে তার কি এসে যায়? তবে মেহের আলী বর্গাদার আর তার পরিবারের সকলেই বড়ই ভালবাসে হজরত আলীকে। অন্তর থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। কালেভদ্রে এক বেলা হজরত আলী মেহের আলীর মেহমান হলে মেহের আলী বর্তে যায়। মানিকচক বাজারের পাশেই এক গ্রামে হজরত আলীর বাড়ি। সেই গ্রামের ছোট ছোট কয়েক জন সাগরিদ নিয়ে হজরত আলী নদী পার হয়ে আসছিল।

তার সাগরিদদের কথা উঠতেই কাসিদ সাহেব প্রশ্ন করলেন– ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার সেই ছেলেরা গেল কোথায়?

হজরত আলী বললো– এই পারঘাটের আধামাইল পেছনে জমজমাট মাদার গানের, মানে মাদার পীরের গানের জমজমাট আসর বসেছে। আমাকে না পেয়ে ওরা নিজেরাই ঐ আসরে ছুটে গেছে।

ও, আচ্ছা।

একটু পরই খেয়া নাও ঘাটে এসে ভিড়লে তাঁরা তিনজনই উঠে পড়লেন পারের নৌকায়। নায়ে উঠার সময় হজরত আলী বললো– আমি আর ঐ মাদার গানের আসরে যাবো না। বাড়িতেই ফিরে যাবো, বলুন...

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– বাড়িতেই ফিরে যাবে?

জি। আমার আর আপনাদের গায়ের শুকনো কাপড়চোপড়গুলো সংগ্রহ করে নিয়ে ফেরত পাঠাতে হবে তো। লোক দিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আপনাকেই আমার কাছে পাঠাতে হবে। আমি গিয়ে ফেরত দিয়ে আসবো।

খেয়াল হতেই কাসিদ সাহেব বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো। চলো চলো...

২

আগ্রহ আর চেপে রাখতে পারলো না হজরত আলী মণ্ডল। কয়েকদিন পরেই সে ছুটে এলো কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের সাথে দেখা করতে। কিন্তু হজরত আলী থাকে গাঁয়ে। মানিকচক বাজারের সবাইকে সে চেনেও না, পথঘাটও তার ঠিকমতো জানা নেই। বড় রাস্তাটাই সে চিনে শুধু। এর উপর আরো যা বিস্ময়কর তা হলো– কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের নামটাও সে জানে না। ঐ প্রথমবারই তার দেখা। তিনি একজন কাসিদ এটাও তার মনে নেই। শুধু মনে আছে তিনি একজন সংবাদদাতা। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই কাসিদ সাহেবকে তার এত ভাল লেগেছে যে, দেখলেই চিনতে পারবে– এই ভরসার উপরই সে ছুটে এসেছে মানিকচক বাজারে।

বাজারে এসে একে ওকে সে কথা বললে আহসান উল্লাহ সাহেবকে কেউ চিনতে পারলো না।

শেষে যখন বললো– তিনি একজন মস্তবড় আলেম, ধবধবে সাদা পোশাক পরে থাকেন, ফেরেশতার মতো সুন্দর চেহারা এবং একজন বলিষ্ঠ নওজোয়ান– তখন কেউ কেউ অনুমান করতে পেরে বললেন– এই বড় রাস্তা বরাবর চলে যাও। রাস্তাটা ডান দিকে যেখানে মোড় নিয়েছে, সেই মোড়ের প্রথম বাড়িটাই উনার। উনিই সে লোক হতে পারেন।

সেই মোতাবেক চলে এলো হজরত আলী। মোড় ঘুরেই দেখলো প্রথম বাড়িটা কোন সাধারণ বাড়ি নয়। সেটা বিরাট এক অট্টালিকা। মস্ত বড় বাড়ি। এ বাড়ি তার সেই সাদাসিধে ভাইজানের হবে, হজরত আলী এটা বিশ্বাস করতে পারলো না। রাস্তার অপরদিকে মসজিদ। এই বড় বাড়িটার পরে হয়তো অন্য কোন বাড়ি হবে। সেটা কোনটা তা জানার জন্যে সে লোক খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কাছে কোলে কোথাও কেউ নেই। শুধু শুনতে পেলো, ঐ মস্তবড় বাড়িটার গেটের ঘরে কারা যেন কথা বলছে। তাই সে গেটের ঘরের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। তা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাড়ির পাহারাদার আয়েজ উদ্দিন ও ময়েজ উদ্দিন। আয়েজ উদ্দিন নাখোশকণ্ঠে বললো– এই, কে? কে ওখানে?

বইঘর ও রোকন

হজরত আলী বললো– আমি হজরত আলী, মানে–

আয়েজ উদ্দিন প্রশ্ন করলো– হজরত আলী! বাড়ি কোথায় তোমার?

এই বাজারের পরেই যে এক মস্তবড় গাঁ আছে, সেই গাঁয়ে আমার বাড়ি।

গাঁয়ে বাড়ি? তা এখানে কি চাও?

আমার ভাইজানকে। মানে–

: ভাইজানকে! কে, তোমার ভাইজান?

মানে এখানেই তাঁর বাড়ি। বাড়িটা কোনটা আমি চিনতে পারছিনে।

তার নাম কি?

জি? মানে– তা জানিনে।

তাজ্জব! নাম জানো না? কি করে তোমার ভাইজান?

করে মানে, খুব ভাল লোক। পরহেজগার লোক।

আরে দূর। পাগল কাঁহাকার! ভাগো– ভাগো–

: না না, আমি পাগল নই। পাগল নই। আমি ভাল মানুষ। সুস্থ মানুষ।

সুস্থ মানুষ? তা তোমার ভাইজান কি করে খায়? পেশা কি তার?

পেশা? পেশা মানে উনি সংবাদদাতা।

: সংবাদদাতা মানে?

বুঝলেন না? সংবাদদাতা বুঝলেন না? হায় হুসেন, হায় হুসেন।

এবার ক্ষিপ্তভাবে সামনে এলো ময়েজ উদ্দিন। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– ভাগ, ভাগ শালা বদ্ধ পাগল। ভাগ এখান থেকে।

ভাগবো মানে?

মানে? ঘাড়ে লাথি পড়লেই বুঝবে মানেটা কি। ভাগ শিগ্‌গির। নইলে মারবো লাথি।

লাথি তুললো ময়েজ উদ্দিন। ক্ষেপে গেলো হজরত আলীও। বললো– কি? আমাকে লাথি মারবে?

মুগুর মারবো, মুগুর–

বলেই সে আয়েজ উদ্দিনকে বললো– আয়েজ উদ্দিন ভাই, কোৎকাঁটা বের আরে আনো তো। শালার কোমরটাই আগে ভাঙ্গি।

হজরত আলী বললো– বটে! একা আছি বলে আমি একদম একা ভেবেছো?

যাই, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে এখনই আমার সাগরিদদের ডেকে আনি। তারা এলেই বুঝতে পারবে ঠ্যালাটা কেমন!

আয়েজ উদ্দিন এবার উপহাস করে বললো– আরে, পাগলটা বলে কি! এই, তোর আবার সাগরিদ এলো কোত্থেকে? তারা আবার কে? তোর মতো আর একদল পাগল নাকি?

: জি-না। গাঁয়ের ছেলেরা। ছোট ছোট ছেলেরা।

ছেলেরা। তারা করে কি?

তারা গান গায়। সোনাপীরের গান, মাদার পীরের গান– সব রকম গান জানে। ছোট ছোট ছেলে ছোকড়া হলে হবে কি? এক একটা বিচ্ছু। ওরা এলে তোমাদের পিষে ফেলবে।

আরে, শালা তো জ্বালালো। তোর ঐ পিচ্চিরা পিষে ফেলবে আমাদের? কোৎকা দেখেছিস? আমাদের কোৎকা?

: রাখো তোমার কোৎকা। ওসব কোন কাজে আসবে না।

: আসবে না?

না। ঐ যে ঐ ফীল সূরাটা আছে না– 'আলম তারা কায়ফা ফালাহ রাব্বুকা বিয়াসহা বিল ফীল'– মানে বিরাট হস্তিবাহিনীকে ছোট ছোট আবাবিল পাখির ঝাঁক যেভাবে দলে মথে ফেলেছিল, আমার ঐ পিচ্চিরা এলে রাস্তার ইট পাটকেল ছুড়ে ঐভাবে ভর্তা করে ফেলবে তোমাদের।

আরে-আরে! শালা পাগল আবার সূরা শুনায়রে। এই, তুই নামাজের সূরা শিখলি কোথায়?

: মক্তবে, মক্তবে। আমি মক্তব পাশ। তোমাদের মতো মূর্খ নই।

ময়েজ উদ্দিন লাফিয়ে উঠে বললো– তবে রে! ধর শালাকে। ধর ধর–

পায়ের কাছেই কিছু ভাঙ্গা ইট ছিল। ঐ একটা ইট তুলে নিয়ে হজরত আলী হুংকার দিয়ে বললো– খবরদার! হুঁশিয়ার!! এগুলেই এই ইট ছুঁড়ে মেরে মাথাটা একদম ছাতু করে ফেলবো। পালাও, পালাও এখান থেকে–

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। বাইরে বিরাট হৈ চৈ শুনে ছুটে গেটের বাইরে এলেন। কি হয়েছে কি হয়েছে বলতেই হজরত আলীর উপর চোখ পড়ায় আহসান উল্লাহ সাহেব উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠলেন– আরে, হজরত আলী যে! হজরত আলী তুমি এসেছো? সে কি? এসো এসো, কাছে এসো–

বলেই দুই হাত প্রসারিত করে আহসান উল্লাহ সাহেব ছুটে গেলেন। হাতের ইট ফেলে দিয়ে হজরত আলী আপ্লুতকণ্ঠে বলে উঠলো– ভাইজান...

আহসান উল্লাহ সাহেব ছুটে গিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন হজরত আলীকে। আয়েজ উদ্দিন আর ময়েজ উদ্দিন তা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এক পাশে। তাদের একমাত্র ভয়– এতদিনের আর এত সুখের চাকরিটা তাদের আজ বুঝি যায়।

বুকে জড়িয়ে ধরে ঐভাবেই হজরত আলীকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে এলেন কাসিদ সাহেব। তাকে নিয়ে গিয়ে বসার ঘরে বসালেন। বাড়ির ভেতরে আসতে আসতে হজরত আলী বিস্ফারিতনেত্রে সব কিছু দেখতে দেখতে এলো। বসার আসনে বসে সে আনন্দ-বিস্ময়ে বললো– কি তাজ্জব ভাইজান! এত বড় বাড়ি আপনার? এত সুন্দর আসবাবপত্র? এ তো একদম রাজবাড়ি!

আহসান উল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন– আরে না না, রাজবাড়ি হবে কেন? রাজবাড়ি কত বেশি বড় আর আসবাবপত্র কত বেশি মূল্যবান! আমার এসব তো তার ত্রিশ ভাগের এক ভাগও নয়।

হজরত আলী বললো– তবু কমই বা কি ভাইজান? এত বড় বাড়ি আর এত সুন্দর জিনিসপত্র কয়জনের আছে?

তা অবশ্য সব লোকের নেই। আমি আমার বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান তো! তাই তাঁরা সখ করে আমার জন্যে এসব করেছেন।

আচ্ছা। তা কাউকে দেখছি না যে! এতবড় বাড়ি। লোকজনে তো গম গম করার কথা। আপনার আব্বা আম্মা কোথায়? অন্দরে আছেন বুঝি?

না।

না! কোথাও গেছেন কি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ইহলোকের অপর পাড়ে।

মানে?

তাঁরা ইন্তেকাল করেছেন।

চমকে উঠলো হজরত আলী। আহতকণ্ঠে বললো– ভাইজান! একি বলছেন? তাঁরা ইন্তেকাল করেছেন?

হ্যাঁ।

ওঃ! বড়ই আফসোসের কথা!

মুহূর্ত খানেক দম ধরে বসে রইলো হজরত আলী। এর পর ফের প্রশ্ন করলো– কিন্তু আর লোক? বাড়ির আর লোক কোথায়?

আর লোক মানে?

মানে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, চাকর নফর–

কেউ নেই।

কেউ নেই? সেকি! ঝি-চাকরানী, মানে রাঁধুনী, বাজার করা লোক–

তারাও কেউ নেই।

কি তাজ্জব, কি তাজ্জব! আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন ভাইজান?

: না না, তা করবো কেন?

: তা না হলে আপনার বাড়ির কাজকর্ম, পাকশাক– এসব কে করে?

: আমিই করি। মাঝে মাঝে আমিই করি।

: আপনি? আপনি করেন? কি অসম্ভব কথা।

তবে সব সময় আমি করি না, মাঝে মধ্যে করি। বেশির ভাগ সময় অন্যেরা করে।

অন্যেরা করে! অন্যেরা কারা?

তোমার মতো আমারও কিছু সাগরিদ আছে হজরত আলী। তবে তারা ছেলে মানুষ নয় আর গান গীতের সাগরিদ নয়। আমার কওমের কাজের সঙ্গী।

কওমের কাজ! সেটা আবার কি ভাইজান?

সেটা এখন বুঝবে না। পরিচয় যখন হয়েছে, আস্তে আস্তে বুঝবে।

ও আচ্ছা। তা হলে তারাই গৃহকর্ম আর পাকশাক করে দেয়?

হ্যাঁ, বেশির ভাগ তারাই করে দেয়। তাছাড়া বললামই তো, মাঝে মাঝে আমিও করি।

ভাইজান!

আমার গেটের ঐ পাহারাদার দুইজন– আয়েজ উদ্দিন ময়েজ উদ্দিন– তারাও সময় সময় হাত লাগায়।

কি তাজ্জব! তাতে আপনার অসুবিধা হয় না?

বইঘর ও রোকন
: তা কিছুটা হয় বৈকি? কিন্তু উপায় তো নেই ।

কেন, ঘরদোরের কাজ আর পাকশাকের কাজের জন্যে মানুষ রাখবেন!

কি করে রাখবো? মাঝে মাঝে আমি বাড়িতে থাকিনে । বাড়ি একদম শূন্য থাকে । শূন্য বাড়িতে ও সব ঝি-চাকর রেখে যাওয়া কি ঠিক? সব কিছু তো উধাও হয়ে যাবে ।

: তাহলে গেটে ওরা থাকে যে । ওরাও তো কিছুতে হাত দিতে পারে ।

না । ওরা বাড়ির বাইরে ঐ গেটের ঘরে থাকে । বাড়ি পাহারা দেয় । ভেতরে আসার পথ তাদের নেই । সে হুকুমও নেই ।

আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলো হজরত আলী । পরে ফের সরবে বলে উঠলো– কি আজব ব্যাপার! কি আজব ব্যাপার! তাহলে একটা কাজ করলে হয় না ভাইজান? একজন বিশ্বাসী কাউকে সব সময়ের জন্যে বাড়ির ভেতরে রেখে দিলে হয় না? তাহলে আপনাকে কখনো কোন কাজে হাত লাগাতে হয় না ।

কাসিদ সাহেব বললেন– তা অবশ্য হয় আর সেটা খুবই প্রয়োজন । কিন্তু তেমন বিশ্বাসী লোক পাই কোথায়?

বিশ্বাসী লোক পাচ্ছেন না?

না । তোমার মতো একটা বিশ্বাসী লোক পেলে–

সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী বললো– এ্যাঁ! আমাকে বিশ্বাসী লোক মনে করেন ভাইজান? আমাকে তো একদিনই শুধু দেখেছেন ।

তা দেখেছি । আর তাতেই মনে হয় তুমি একজন বিশ্বাসী লোক । মানে তোমাকে বিশ্বাস করা যায় ।

তাতেই আপনার তা মনে হয়!

হ্যাঁ, তাতেই হয় । আমি একজন কওমের খাদেম হজরত আলী । কওমের কাজে নিযুক্ত শত শত লোক নিয়ে আমার কারবার । বিশ্বাসী লোক ছাড়া কওমের কাজ হয় না । কাজেই বিশ্বাসী লোক চিনতে আমার খুব একটা ভুল হয় না ।

ভাইজান!

ঐ একবার তোমার সাথে একবেলা থেকে আমি যা বুঝেছি, তাতে তোমার মতো কাউকে পেলে আমি লুফে নিতাম । কিন্তু তুমি তো আর তোমার সংসার ফেলে–

আবার কথার মাঝেই হজরত আলী বললো– আমার আবার সংসার কি ভাইজান? আমিও তো আপনার মতোই একজন একক লোক। শুধু মাইনে করা একজন কাজের ঝি আছে, সেই আমার পাকশাক করে।

: ঝি তোমাকে পাকশাক করে দেয়?

: জি ভাইজান। আপনি আমাকে রাখলে আমি বর্তে যেতাম।

: হজরত আলী।

আপনার মতো লোকের সাথে থাকতে পারাটা তো পরম সৌভাগ্যের কথা। মস্তবড় নসীবের ব্যাপার ভাইজান। অত পুণ্য কি আমার আছে!

কাসিদ সাহেবও বিপুল আগ্রহভরে বললেন– তুমি থাকবে হজরত আলী! আমার বাড়িতে তুমি থাকবে? যখন বাড়িতে থাকি, তখন বড়ই একা হয়ে যাই। কথা বলার কেউ নেই। তুমি থাকলে আমার দম সরবে হজরত আলী। সব সময় গল্প আলাপে থাকতে পারবো আমরা।

আমি থাকবো ভাইজান! যদি হুকুম করেন, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে আমি আগামী কালই চলে আসবো।

: আসবে? বেশ বেশ, তাহলে তাই এসো হজরত আলী, তাই এসো। আগামী কালই চলে এসো।

যদি বলেন, আমার সেই কাজের ঝিকেও আনতে পারি। সেও খুব বিশ্বাসী আর গৃহকর্মে খুব দক্ষ।

বেশ বেশ। তাহলে তাকেও নিয়ে এসো। শূন্যবাড়িতে আমার কিছু লোক সমাগম হোক।

: আচ্ছা ভাইজান। একটু থেমে হজরত আলী ফের বললো, কিন্তু...

আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– কিন্তু কি?

আবেগের মাথায় খুব তাড়াহুড়া হয়ে যাচ্ছে না ভাইজান? আমার আপনার দু'জনেরই আর একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখলে হয় না? বিশ্বাসের প্রশ্ন যেখানে–

কাসিদ সাহেব কিছুটা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– আমার দেখা হয়ে গেছে হজরত আলী।

: ভাইজান!

আমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে তুমিও ঝাঁপ দিলে আমার পেছনে।

বইঘর ও রোকন
নৌকা বোঝাই কত লোক ছিল। আর কিন্তু কেউ ঝাঁপ দেয়নি। এতো দরদ আর কারো ছিল না।

তা– মানে–

কাজেই আমার দেখা হয়ে গেছে। তোমার আরো চিন্তা-ভাবনা করে দেখার থাকলে, দেখো। দেখে যদি মনে করো তোমাদের চলে আসা উচিত, তাহলে চলে এসো। আমি পথ চেয়ে থাকবো।

জি আচ্ছা ভাইজান, জি আচ্ছা!

সেদিন চলে গেল হজরত আলী। কিন্তু বেশিদিন তার চিন্তা-ভাবনা করে দেখার কিছু ছিল না। এখানে আসার জন্যে সে প্রথম থেকেই খুব আগ্রহী ছিল। তাই দিন তিনেক পরেই সে কাজের ঝিটাকে নিয়ে একেবারেই চলে এলো তার বাড়ির বিলি বন্দোবস্তটা পুরোপুরিভাবে করে রেখে। এতে করে যার পর নেই খুশি হলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব।

মালদহের পুলিশ কমিশনার মিঃ ডগলাস তার মুনসীকে ডেকে বললেন– ইউক্রেজী ক্যাডার (কাজী কাদের) ও ফ্যাটিগ চেন (ফটিক চান) যা রিপোর্ট দাখিল করিল, টাহার কি করিলে?

মুনসী কাজী কাদের বললো– নাতো স্যার, কিছু তো করিনি। ডগলাস সাহেব বললেন– হোয়াই? কেনো করিলে না?

আপনি হুকুম দেননি স্যার, তাই। হুকুম পেলেই আমি তদন্তে নেমে যাবো।

তাই যাও। ওখানে উও পলিশ ষ্টেশান নাম্বার থার্টিন মে ও.সি. আছে ব্লাড্ সাকার (বাদল সরকার)। উও আদমী জবরদস্ত আদমী। ভেরী ইন্টেলিজেন্ট এ্যান্ড এক্সপার্ট। টামাম হডিস ঠিক ঠিক করিয়া ডেবে। পাত্তা লাগাও–

জি আচ্ছা স্যার।

তখনই মুন্সী কাজী কাদেরের টেলিফোন গেল ১৩ নং থানার ও.সি. ব্লাড সাকারের (বাদল সরকারের) কাছে। কাজী কাদের বললো– হ্যালো, এটা কি তের নম্বর থানা? মানে, রাতুয়া ফাঁড়ি? www.boighar.com

ওপার থেকে উত্তর এলো– ইয়েস। তের নম্বর রাতুয়া পুলিশ ষ্টেশান। আপনি কে বলছেন?

আমি মিঃ ডগলাস স্যারের মুন্সী কাজী কাদের বলছি।

ও মাই গড! আদাব দাদা, আদাব– আদাব। আমি তের নম্বর– মানে,

রাতুয়া থানার ও.সি. বাদল সরকার বলছি। বলুন দাদা, কি হুকুম?

: হুকুম মানে, মানিকচক বাজারের খবর কিছু রাখেন?

কেন রাখবো না দাদা? মানিকচক বাজার তো আমার থানার পাশেই।

ওখানে নাকি সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অমাত্য হাকিম আহসান উল্লাহ খান এসে ডেরা গেরেছে?

: আহসান উল্লাহ খান মানে?

আরে সম্রাটের সেই বেঈমান অমাত্য। সম্রাটের অমাত্য হয়ে বরাবর যে সম্রাটের বিরুদ্ধে আর আমাদের স্যারদের পক্ষে কাজ করলো, সেই হাকিম আহসান উল্লাহ খান।

: দাদা!

স্বার্থ আর সুবিধার লোভে যে স্বধর্ম আর স্বজাতি ত্যাগ করে গোপনে আমাদের স্যারদের পক্ষ নিলো, সেই আহসান উল্লাহ। হাকিম আহসান উল্লাহ খান।

কি তাজ্জব! সে এখানে আসবে কেন?

আসতে পারেই তো। স্যারদের জন্যে এত করার পরেও স্যারেরা কোন কদর না দিয়ে, নকরী ইনাম কিছুই না দিয়ে যাকে সরাসরি পথে নামিয়ে দিলেন, যে লোক স্বজাতি দ্রোহিতার দরুন জনসমাজে গাদ্দার আর ধিকৃত হিসাবে পরিগণিত হলো আর নিদারুণ অভাবের মধ্যে কোন প্রকারে জীবনযাপন করতে লাগলো, সে লোক প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আসতে পারেই তো এখানে। আমার ডগলাস স্যারও তো একজন ইংরেজ। তার উপর পুলিশ অফিসার।

কি যে বলেন দাদা! ঐ অবস্থায় সে একা এসে স্যারদের উপর প্রতিশোধ নেবে?

একা নেবে কেন? জনগণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালালে তো অঘটন একটা ঘটতেই পারে। বারাকপুরের সিপাইদের কথা কি ভুলে গেছেন? তাদের বিদ্রোহের কথা?

: না, তা ভুলিনি। কিন্তু এই আজগুবি খবর কে দিলো আপনাদের?

ফটিক চান। স্যারের সোর্স ফ্যাটিগ চেন। সে নাকি আহসান উল্লাহকে মানিকচক খেয়াঘাটে দেখেছে।

এবার হো হো করে হেসে উঠলো ও.সি. বাদল সরকার। বললো– কি যে

বইঘর ও রোকন
বলেন দাদা! ফ্যাটিগ চেন ফটকে একটা গণ্ডমূর্খ অদ্না আদমী। সে কাকে দেখতে কাকে দেখেছে আর তাই নিয়ে আপনারা হৈ চৈ শুরু করেছেন?

কাজী কাদের থমকে গিয়ে বললো– এ্যাঁ, কি ব্যাপার! তাহলে কি আহসান উল্লাহ বলে কোন কেউই মানিকচকে নেই? মানে কোন সন্দেহজনক লোক?

না, আছে। আছে একজন। কিন্তু সে ঐ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের হাকিম আহসান উল্লাহ খান নয়।

: আছে? সে কি সন্দেহজনক কেউ?

: হ্যাঁ, কিছুটা সন্দেজনকই বটে।

: মানে? কে সে?

সে কাসিদ আহসান উল্লাহ।

: কাসিদ আহসান উল্লাহ?

: হ্যাঁ, জেহাদী আন্দোলনের এক লোক।

অর্থাৎ?

আগে জেহাদী আন্দোলনের মূল ঘাঁটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় খবর বার্তা পাঠাতো। টাকা পয়সা, মুজাহিদ এসবও পাঠাতো। এখন তাকে আর তেমন তৎপর দেখিনে।

আচ্ছা!

খোঁজ নিয়ে বুঝেছি তাকে নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

ও আচ্ছা। থ্যাংক ইউ– থ্যাংক ইউ।

টেলিফোন রেখে দিলো মুন্সী কাজী কাদের। এর পর সে ডগলাস সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ালে ডগলাস সাহেব প্রশ্ন করলেন– ইউ ক্রেজী ক্যাডার, বার্টা কুচু পাইলে?

কাজী কাদের বললো– হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি।

কি পাইলে?

এই আহসান উল্লাহ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অমাত্য হাকিম আহসান উল্লাহ নয়। এ জন অন্যজন।

অন্যজন! অন্যজন কোন জন আছে?

এ আহসান উল্লাহ কাসিদ আহসান উল্লাহ।

কাসিড! হোয়াট ইজ কাসিড? কাসিড কোন চীজ আছে?

বইঘর ও রোকন
: বার্তাবাহক স্যার। ম্যাসেঞ্জার। জেহাদী আন্দোলনের লোক।

চমকে উঠলেন ডগলাস সাহেব। বললেন– হোয়াট?

কাজী কাদের বললো– আগে জেহাদী আন্দোলনের ঘাঁটিতে খবরবার্তা পাঠাতো। সেই সাথে টাকা পয়সা আর মুজাহিদও পাঠাতো। বার্তা-খবর যে পাঠায় তাকে কাসিদ বলে।

ও মাই গড। টাহলে হামাডের মুভমেন্ট আই মীন চলাফেরা সম্বন্ধে বার্তা-খবর পাঠাইতো জরুর?

: আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বার্তা খবর পাঠানোই ছিল তার বড় কাজ।

ও গড, সেভ মী!

: না স্যার, এখন আর জেহাদ আন্দোলনও তেমন নেই, খবর-বার্তা পাঠানোর কাজও তেমন নেই। ওসব ঐ আটান্ন সালের বিদ্রোহ দমনের সাথে সাথেই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন কিছু থাকলে ঐ টিমটিমে ধোয়াটুকুই আছে, আগুন আর নেই।

টবু বিপডজনক ক্রেজী ক্যাডার! ঐ ঢোঁয়াটাও ড্যাঞ্জারাস। উও আডমী এখোন কোঠায় ঠাকে?

ঐ মানিকচক বাজারে।

কীপ্ ওয়াচ অন হিম। উহার উপর টীক্ষ্ণ নজর রাখো। ও.সি. ব্লাড সাকার কো এলাট করিয়া ডাও।

: জি আচ্ছা স্যার, জি আচ্ছা। তাই দিচ্ছি।

: হ্যাঁ, টাই ডাও।

ডগলাস সাহেব আর প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে আতংকের একটা ছায়া রয়েই গেল।

মানিকচকের বিশিষ্ট ব্যক্তি আহমদুল্লাহ খান সাহেবের বাড়িতে ইদানিং কমে গেছে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের আসা যাওয়া। প্রকাশ্যে বিশেষ তোড়জোর না থাকলেও আহমদুল্লাহ খান সাহেবও একজন ইংরেজ বিরোধী লোক আর জিহাদ আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ও সাহায্যদাতা। জিহাদ আন্দোলনের ঘাঁটিতে তিনি অনেক অর্থকড়ি পাঠিয়েছেন কাসিদ আহসান উল্লাহর মাধ্যমে। আর এই আন্দোলনের কূটকৌশল নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন কাসিদ সাহেবের সাথে। ইদানিং জিহাদ আন্দোলন

স্তিমিত হয়ে আসায় খান সাহেবের অর্থকড়ি পাঠানোও কমে গেছে আর জিহাদ আন্দোলন সম্বন্ধে কাসিদ সাহেবের সাথে তাঁর আলাপ আলোচনাও পাতলা হয়ে এসেছে। এতে করে পাতলা হয়ে এসেছে তাঁর বাড়িতে কাসিদ সাহেবের আসা যাওয়া।

বেশ কয়েকদিন পরে সেদিন আবার খান সাহেবের বাড়িতে এলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। সরাসরি ভেতরে না গিয়ে তিনি বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ালেন। সংবাদ পেয়েই আহমদুল্লাহ খান সাহেব ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন কাসিদ সাহেবকে এবং তাঁকে টানতে টানতে এনে একদম অন্দরের এক বারান্দায় বসালেন। অতঃপর পাশে বসতে বসতে খান সাহেব অভিযোগ করে বললেন– কাসিদ সাহেব হঠাৎ এমন ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন কেন, বলুন তো? এত বড় একটা ঘটনার পর এমন লাপাত্তা হয়ে থাকাটা কি উচিত হলো আপনার?

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন– লাপাত্তা! লাপাত্তা হলেম কোথায় মুরুব্বী?

হলেন না? আমার অজান্তে নাতনিটাকে এনে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই হাওয়া হয়ে গেলেন। বুড়ো মানুষ না হলে আমি নিজেই ছুটে যেতাম আপনার খোঁজে। তা যেতে না পারায় আমি শুধু আপনার পথ চেয়ে আছি আজ কয়দিন থেকেই।

তাই কি?

তাই নয়? একি যেমন তেমন ব্যাপার? আমি শুনেছি, সব ঘটনা শুনেছি। ঘটনাটা শুনার পর থেকেই আমি আপনার পথ চেয়ে আছি। কিন্তু আপনার পাত্তা নেই।

তা মানে, কোন ঘটনার কথা বলছেন? জিহাদের কোন ঘটনা কি?

খান সাহেব নাখোশকণ্ঠে বললেন– জিহাদের ঘটনা মানে? আমার নাতনি লায়লা বানুর ঘটনা। মৃত্যুর হাত থেকে তাকে ফিরিয়ে আনলেন আপনি আর সে কথাটা বলতেও এলেন না?

কাসিদ সাহেব হালকা কণ্ঠে বললেন– ও, সেই কথা?

হ্যাঁ, সেই কথা। অন্য একজন এসে ওপার থেকে লায়লা বানুর প'রে আসা শুকনো কাপড়গুলো ফেরত নিয়ে গেল। কিন্তু আপনি এলেন না। আপনার আসাটা কি উচিত ছিল না সঙ্গে সঙ্গেই। এ আশাটা কি করতে পারিনে আমি?

তা মানে, সময় পাইনি মুরুব্বী। আসবো আসবো করতে করতে হঠাৎ একটু ব্যস্ত পড়ায়...

তাই আমাদের ধন্যবাদটা দেওয়ারও সুযোগ দিলেন না। হায় হায়, নিশ্চিত মউত থেকে মেয়েটাকে বাঁচালেন আপনি, একি কোন ছোটখাটো ব্যাপার?

না মুরুব্বী। বাঁচানোর মালিক আমি নই, আল্লাহ তায়ালা। ও কথায় গুনাহ হয়।

তাকি আমি বুঝি না? কিন্তু উপলক্ষটা তো আপনিই। আপনি সঙ্গে সঙ্গে ঐভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মেয়েটা ডুবে যেতো আর দম বন্ধ হয়ে মারা যেতো কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেই।

হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক। উনি যে একটুও সাঁতার জানেন না, তা ভাবতেই পারিনি। দেখলাম, উনি শুধু ডুবেই যাচ্ছেন– আর ভেসে যাচ্ছেন স্রোতে।

কি করুণ ব্যাপার! কি নিদারুণ ব্যাপার কাসিদ সাহেব! কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো...

জি-না, জি-না। ধন্যবাদ যা দেবার তা আল্লাহ তায়ালাকে দিন। আমি কিছু করিনি।

কিছু করিনি মানে? আপনাকে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে পরিশ্রমটা করিয়ে নিলেন, তা কি সামান্য কিছু?

: জি-জি, সামান্যই। আমি এমন কিছু পরিশ্রম করিনি।

একটু আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল লায়লা বানু। এবার সে সামনে এসে বললো– উনি মিথ্যা বলছেন।

চমকে উঠে খান সাহেব বললেন– এ্যাঁ!

লায়লা বানু বললো– আপনার কাসিদ সাহেব সত্যি কথা বলছেন না।

লায়লা বানুকে ভাল করে দেখে আহমদুল্লাহ খান সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন– আরে সেকি, সেকি! আমার লায়লা বানু বেগমের আজ এমন একেবারেই হালকা আব্রু!

লায়লা বানু বললো– অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আগে যখন তুমি কাসিদ সাহেবের সামনে আসতে তখন আব্রুর আবরণে সারা দেহ মুড়ে নিয়ে আসতে। মানুষ না আবরণের একটা গাঁইট, তা বোঝাই যেতো না। সে আব্রুর বহর আজ গেল কোথায়?

বইঘর ও রোকন

উনার সামনে এখন আব্রুর ঐ বাহুল্য নিস্প্রয়োজন হেতু, ঐ বাহুল্য ত্যাগ করে এসেছি।

কেন, কেন? নিস্প্রয়োজন কেন?

কেন আবার! উনার সামনে ঐ বাহুল্যের আর প্রয়োজন নেই, তাই। ওটা শেষ হয়ে গেছে।

শেষ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ দাদু। তাই, যে টুকু আব্রু একেবারে না করলে নয়, উড়নার সাহায্যে সেটুকুই করে এসেছি মাত্র।

: কিন্তু শেষ হয়ে গেল কি কারণে?

কি কারণে তা বুঝতে পারলে না দাদু? উনি যখন আমাকে পানি থেকে তুললেন আর ডাঙ্গায় এনে পেট টিপে যেভাবে পেটভর্তি পানি মুখ দিয়ে বের করে দিলেন, তখন কি আব্রু বলে এতটুকু কোন কিছু ছিল আমার? যা ছিল তা ভেজা কাপড়ের নামমাত্র একটা আবেষ্টনী। একেবারেই একটা শিশু বরাবর উনি আমাকে কোলে পিঠে করে টেনেছেন।

: তা বটে– তা বটে।

ঐ অবস্থার পর আজ আবার আব্রুর বস্তার মধ্যে নিজেকে পুরে নিয়ে উনার সামনে আসাটা কি উনাকে উপহাস করা হয় না?

তা ঠিক, তা ঠিক। উনাকে তোমার আর শরম করার সত্যিই কিছু নেই। তা কি যেন বলছিলে?

: বলছিলে মানে?

ঐ যে বললে– কাসিদ সাহেব সত্যি কথা বলছেন না?

ও-হ্যাঁ, সত্যি সাত্যিই উনি সত্যি কথা বলছেন না। উনি যে বললেন– আমার জন্যে উনি যা পরিশ্রম করেছেন তা অতি সামান্য, এমন কিছু বেশি পরিশ্রম নয়– এটা তাঁর ডাঁহা মিথ্যা কথা।

: মিথ্যা কথা?

জি দাদু। আমার জন্যে নিদারুণ পরিশ্রম করেছেন উনি। আপাদমস্তক পরিপাটি আবরণ নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে কাঁধে করে তুলে আনা, পানি খেয়ে আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম– দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল– ডাঙ্গায় এনে অভিজ্ঞ হেকিমের মতো অনেকক্ষণ যাবত আমার পেটে পিঠে চাপ দিয়ে পেট ভর্তি পানি মুখ দিয়ে বের করে দেয়া, ভেজা কাপড়ে থাকলে

নিউমোনিয়া হয়ে যাবে ভয়ে ব্যস্ত হয়ে আমার জন্যে শুকনো কাপড় যোগাড় করা, ধুলো-মাটির মধ্যে থেকে তুলে এনে ভাল স্থানে ভাল আসনে বসানো, খেয়া নায়ে আমাকে নদী পার করে নিয়ে আসা, আর সব শেষে আমাকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া– এসব কি সামান্য পরিশ্রম? বলুন এত তকলিফ করাটা কি সত্যিই নগণ্য পরিশ্রম বলে মনে করো তুমি?

খান সাহেব সরবে বললেন– না না, মোটেই না, মোটেই না। মোটেই সামান্য পরিশ্রম নয়। এই কাসিদ সাহেব তোমার জন্যে অসাধ্য সাধন করেছেন। নিশ্চিত মউত থেকে বাঁচিয়ে তোমাকে উনি নতুন জীবন দান করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার এই নয়া জিন্দেগীর মালিক এখন একমাত্র এই কাসিদ সাহেবই। তোমার মালিক এখন ইনিই।

এবার কাসিদ সাহেব নীরব থাকতে পারলেন না। বললেন– ছিঃ ছিঃ! এ কি বলছেন মুরুব্বী? মানুষের জিন্দেগীর মালিক আল্লাহ তায়ালা। আমি সে মালিক হতে যাবো কেন?

কেন যাবেন তা বুঝতে পারছেন না কাসিদ সাহেব? ওতো মরেই গিয়েছিল। আপনিই ওকে বাঁচিয়েছেন। কাজেই ও এখন আপনার সম্পত্তি। এর মালিক এখন আপনিই।

বাড়ির পুরাতন ঝি মরিয়ম বিবি অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব কথা শুনছিল। সেও এবার খোশকণ্ঠে বলে উঠলো– ঠিক বলেছেন হুজুর। একদম হক কথা বলেছেন। আমার লায়লা আমার মালিক এই কাসিদ সাহেব ছাড়া আর কেউ নয়, আর তা হতেও পারে না।

এই সময় ব্যস্তভাবে সেখানে এলো বাড়ির বাজার সরকার আর একমাত্র মুখপাত্র প্রবীণ আজম শেখ। সে এসে বললো– হুজুর, হাজী আব্দুল গনি চৌধুরী সাহেব এসেছেন। আবার এসেছেন লায়লা আম্মার শাদির ব্যাপারে কথা বলতে।

খান সাহেব নাখোশকণ্ঠে বললেন– চৌধুরী সাহেব আবার এসেছে? কি বলেন আবার?

আজম শেখ বললো– ঐ পুরনো গীত হুজুর। বলছেন, তাঁর ছেলে বা তাঁর ঘর তো পছন্দ না করার মতো মোটেই কিছু নয়। ধনাঢ্য হলেও তারা ঈমানদার, পরহেজগার আর সৎ মানুষ। হুজুরের মনমানসিকতা আর তাঁদের মনমানসিকতা একদম এক। তাঁর ছেলেও বিদ্বান, সুদর্শন আর চরিত্রবান।

কাজেই যে কোন শর্তে লায়লা আম্মাকে তিনি তার ছেলের বউ করে নিতে বিশেষ আগ্রহী।

এর জবাবে তুমি কিছু বলোনি?

: বলেছি হুজুর। বলেছি, তাঁর ছেলে যদি ঘরজামাই হয়ে থাকতে রাজী থাকে, একমাত্র তাহলেই এ শাদি সম্ভব, নইলে নয়। তবু উনার এক কথা– ঐ একটা মাত্র শর্ত ছাড়া আর সকল শর্ত মানতে উনি রাজী আছেন। অন্য আর যে শর্ত দেবেন, তাই উনি মেনে নিবেন।

: বলোনি, ঐ একটিমাত্র শর্ত ছাড়া আমাদের আর কোন শর্ত নেই?

বলেছি হুজুর। তবু তিনি আর একবার জানতে এসেছেন, আপনার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

: উনি কোথায়?

রাস্তায় এক দোকানে বসে আছেন।

তাহলে তুমি গিয়ে তাকে বলো, আমার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন নেই। উনি খামাখা আমাকে বিরক্ত করতে আর যেন না আসেন।

জি হুজুর!

বলো, আমি ব্যস্ত আছি আর এক কথা বার বার বলার আমার রুচি নেই। যাও, উনাকে সাফ সাফ এ কথা বলে দাও।

জি আচ্ছা হুজুর।

আজম শেখ চলে গেল। কাসিদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। এবার বললেন– আমিও আসি মুরুব্বী। খুবই ব্যস্ত আছি বাড়িতে। পরে আবার আমি শিগ্‌গিরই আসবো। দয়া করে এখন এজাযত দিন, আমি যাই...

খান সাহেব বললেন– যাবেন? নাশ্‌তা-পানি কিছু না করে...

পরে মুরুব্বী। অল্প দিনের মধ্যে আবার আমি আসবো, আর তখন শুধু নাশ্‌তা-পানি নয়, পুরোপুরি ভুঁড়িভোজ করে তবে যাবো। এখন আমি আসি মুরুব্বী। অপরাধ নেবেন না। আল্লাহ হাফেজ...

চলে গেলেন কাসিদ সাহেবও। খান সাহেব উঠে দাঁড়ালে, মরিয়ম বিবি বললো– একটা কথা বলার ছিল হুজুর!

খান সাহেব বললেন– কথা!

জি হুজুর। অনেকদিন আগেই কথাটা আমার মনে উঠেছে। আজ যখন এ

ব্যাপারে আবার কথাটা উঠলো, তখন দয়া করে শুনলে আমি বলতাম!

: তাই? তা বলো, কি কথা বলতে চাও–

: লায়লা আম্মার শাদির কথা হুজুর।

খান আহমদুল্লাহ সাহেব কিছুটা নাখোশকণ্ঠে বললেন– শাদির কথা? তুমি আবার কার সাথে শাদির প্রস্তাব আনছো?

মরিয়র বিবি বললো– কাসিদ সাহেবের সাথে হুজুর।

জ্যামুক্ত ধনুকের মতো মাথা তুললেন আহমদুল্লাহ খান সাহেব। আগ্রহভরে বললেন– কাসিদ সাহেবের সাথে? মানে, কাসিদ আহসান উল্লাহর সাথে?

: জি হুজুর।

সেটা তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আকর্ষণীয় প্রস্তাব। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি করে?

কেন হুজুর?

: উনি কি ঘর জামাই থাকতে রাজী হবেন? আর সে প্রস্তাব তাঁকে দেয়াটা কি সম্ভব?

একথা উঠতেই লায়লা বানু সরে গিয়ে আড়ালে দাঁড়ালো আর কান পেতে রইলো। মরিয়ম বিবি বললো– কেন সম্ভব নয় হুজুর? উনার তো তিনকূলে কেউ নেই। এই একই জায়গায় বাড়ি। লায়লা আম্মাকে শাদি করে এখানে এসে থাকতে তার অসুবিধে হবে কেন?

: তা মানে–

লায়লা আম্মা আপনার বাড়িতেই থাকবে। কাসিদ সাহেব যখন ইচ্ছে তখন এখানে আসবেন, যখন ইচ্ছে তখন নিজ বাড়িতে থাকবেন। উনি তো অধিক সময় বাইরে বাইরেই থাকেন। নিজ বাড়িতেই তেমন একটা থাকেন না। বাইরে থেকে যখন ফিরে আসবেন, তখন এখানে এসে উঠবেন। এরপর মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাবেন।

খান সাহেব সপুলকে বললেন– কথাটা তো মন্দ বলোনি তুমি?

মরিয়ম বিবি বললো– জি হুজুর। বর হিসাবে কাসিদ সাহেব কি অত্যন্ত লোভনীয় বর নয়? সুদর্শন, পণ্ডিত, চরিত্রবান আর পরহেজগার লোক। এমন বর লাখে কি একটা পাওয়া যায়?

ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো। দশ লাখেও একটা পাওয়া যায় না। তাহলে

তো কথাটা তার কাছে তুলে দেখতে হয়।

দেখুন হুজুর। আমার বিশ্বাস, এমন প্রস্তাব উনিও লুফে নেবেন। এদিকে আবার আমাদের লায়লা বানুও মনে মনে এমনটিই...

কথা শেষ করতে না দিয়ে খান সাহেব বিপুল আগ্রহে বললেন– তাই নাকি, তাই নাকি?

মরিয়ম বিবি বললো– তো কি আর অমনি অমনি বলছি হুজুর!

খান সাহেব বললেন– ঠিক আছে, ঠিক আছে। শিগ্‌গিরই তাহলে এ প্রস্তাব তাকে দেবো আমি। শিগ্‌গিরই, শিগ্‌গিরই–

বলতে বলতে খান সাহেব তাঁর শয়নকক্ষে চলে গেলেন। পরে পরেই লায়লা বানু এসে মরিয়ম বিবিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো– এ তুমি কি বললে খালা? দাদু সাহেব তো এখন যে কোন সময় দৌড়ে গিয়ে এ প্রস্তাব কাসিদ সাহেবকে দেবেন। অথচ আমি কাসিদ সাহেবের পূর্বাপর কিছুই জানলাম না।

মরিয়ম বিবি বললো– পূর্বাপর জানলাম না মানে?

মানে, কেমন উনার বাড়িঘর, কে আছেন তাঁর বাড়িতে, কি তার বিষয় সম্পত্তি, কি ভাবে তাঁর দিন চলে, কখন কোথায় থাকেন– এসব না জেনে অন্ধের মতো গিয়ে একজনের হাতে পড়াটা কি ঠিক?

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক কথা। চলো, একদিন যাইনে কেন আমরা দু'জন তাঁর বাড়িতে? মানে গোপনে।

যাবে?

তুমি যদি সাহস করো, তাহলে অবশ্যই যাবো। গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে আর স্বকর্ণে সব শুনে আসবো।

: ঠিক খালা, ঠিক ঠিক। চলো, আগামী কালই যাই তাহলে।

আগামী কালই? মানে এত শিগ্‌গিরই?

বিলম্বে বিস্তর বিপত্তি খালা। দাদু যদি ইতিমধ্যেই প্রস্তাবটা কাসিদ সাহেবকে দিয়ে ফেলেন আর কাসিদ সাহেব যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে তো আর না করার কোন পথ থাকবে না।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

তাই, দাদু এ প্রস্তাব দেয়ার আগেই গিয়ে দেখে এলে আর পছন্দ না হলে দাদুকে আটকালে, তাহলে আর পরিস্থিতিটা নাজুক হবে না।

আম্মা!

প্রস্তাব দেয়ার পরে না করার মতো নাজুক পরিস্থিতিতে দাদুকে পড়তে হবে না।

: ঠিক ঠিক, তোমার এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক।

তাই বলছি, চলো আগামীকালই আমরা দু'জন গোপনে যাই খালা...

: হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলো, তাই চলো–

পরের দিন লায়লা বানু আর মরিয়ম বিবি যথাযথ আব্রু করে গোপনে বেরিয়ে পড়লো। মানিকচক বাজারের কোনদিকে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ি– এ ধারণা মোটামুটি তাদের ছিল। তাই লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে তারা এসে ঠিক কাসিদ সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ালো। অতঃপর এইটেই কাসিদ সাহেবের বাড়ি, লোকজনের কথায় তা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাসিদ সাহেবের কাসিদগিরি কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তারা অনেক কিছুই জানতো। কিন্তু তাঁর বাড়িঘর আর বিষয় সম্পদ সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। তাই, এত বড় বাড়ি আর তার ফটক দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।

কালো বোরকায় আপাদমস্তক মোড়া দুই জেনানা এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো দেখে গেটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বাড়ির পাহারাদার আয়েজ উদ্দিন ও ময়েজ উদ্দিন। আয়েজ উদ্দিন আগন্তুকদের উদ্দেশ্য করে বললো– এই, কে তোমরা? এখানে কি চাও?

জবাবে মরিয়ম বিবি প্রশ্ন করলো– এটা কি কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ি?

আয়েজ উদ্দিন বললো– সে খবরে তোমাদের কি দরকার?

মরিয়ম বিবি বললো– আমরা তার সাথে দেখা করবো। এটা কি তাঁর বাড়ি?

: তা তোমাদের বলবো কেন?

: বললামই তো। আমরা তার সাথে দেখা করবো।

তোমরা তাঁর কে হও? তোমরা কি তাঁর আত্মীয়?

: না, ঠিক আত্মীয় নই। তবে উনি আমাদের খুব পরিচিত।

পরিচিত? ব্যস, শুধু ঐটুকুই? কে তোমরা?

এই মানিকচক বাজারেরই লোক আমরা?

বাজারের লোক? তোমাদের নাম কি? কে তোমাদের বাপ মা?

সেটা তাঁকেই বলবো। বলো না, এটা কি তাঁরই বাড়ি?

আরে জ্বালা। তার বাড়ি হলেই বা তোমাদের লাভ কি? তাঁর সাথে কি দেখা করতে দেবো তোমাদের?

মরিয়ম বিবি পুরোপুরি নিশ্চিত হলো এবার। বললো– ও এটাই তাহলে তাঁর বাড়ি। তা তিনি কি বাড়িতে আছেন?

: হ্যাঁ, আছেন। কিন্তু তা জেনে তোমরা কি করবে?

দেখা করবো। তাকে একটু ডেকে দাও না?

এ্যাহ্! মামার বাড়ির আবদার! চেনা নেই জানা নেই, তাঁকে ডেকে দেবো তোমাদের সাথে দেখা করতে?

বললামই তো, আমরা তাঁর খুব পরিচিত। ডেকে না দাও, গেট খোলো, আমরা ভেতরে যাই। ভেতরে দেখা করি।

ও কথায় ডাল গলবে না। যেভাবে মুখোশ এঁটে এসেছো। তাতে তোমরা জেনানা না মর্দানা– সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। মুখ খোলো, মুখ দেখি। তারপর চিন্তা করে দেখবো তোমাদের ভেতরে যেতে দেয়া যায় কিনা।

মরিয়ম বিবি রুষ্ট কণ্ঠে বললো– কি বললে? মুখ দেখবো? আয়েজ উদ্দিন বললো– হ্যাঁ, চাঁদ বদনগুলো একটু দেখি।

খবরদার! বদমায়েশ, বেয়াদব! এই বেয়াদবীর পরিণাম কি, তা বুঝতে পারবে উনাকে বলে দিলেই।

এবার ময়েজ উদ্দিন বললো– বিদায় করে দাও আয়েজ উদ্দিন ভাই। এদের মেজাজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এদের উদ্দেশ্য ভাল নয়, কোন বদমতলব নিয়ে এরা এসেছে।

আয়েজ উদ্দিন বললো– হ্যাঁরে ময়েজ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এইভাবে মুখোশ এঁটে এসে যে রকম দুর্ধর্ষ ডাকাতি করছে ডাকাতেরা তা বলা-কওয়ার বাইরে। জেনানা মর্দানা বলে কোন বাছ-বিচার নেই। সবাই কাপড়ের নীচে অস্ত্র রাখে মারাত্মক।

মরিয়ম বিবি ফের বললো– কি হলো? তাহলে ডেকেও দেবে না, আবার ভেতরে যেতেও দেবে না?

আয়েজ উদ্দিন বললো– কখ্খনো না। অজানা অপরিচিত লোকদের সবাইকে যদি আপছে আপ ভেতরে যেতে দেই, তাহলে আমরা এখানে আছি কি

জন্যে? সেরেফ কুকুর বিড়াল তাড়ানোর জন্যে?

ময়েজ উদ্দিন বললো– লাঠি হাঁকাও আয়েজ উদ্দিন ভাই, লাঠি লাগাও...

বলে ময়েজ উদ্দিন এগিয়ে এলো লাঠি হাতে আর আয়েজ উদ্দিন ময়েজ উদ্দিন দু'জনই এক সাথে তেড়ে এসে সগর্জনে বললো– ভাগো। ভাগো শিগ্‌গির এখান থেকে। নইলে পড়লো লাঠি মাথায়।

মরিয়ম বিবি বললো– তার মানে?

ফের মানে? পালাও, পালাও শিগ্‌গির!

মেঘের মতো গর্জন করতে লাগলো তারা। গোলমাল শুনে ভেতর থেকে দৌড়ে এলো হজরত আলী। ফটক খুলে বাইরে এসে বললো– কি হয়েছে, কি হয়েছে?

হজরত আলীকে দেখেই এবার লায়লা বানু সরবে বলে উঠলো– আরে, এই তো হজরত আলী। সেকি সেকি! হজরত আলী, তুমি আছো এখানে?

চেনা চেনা গলা। হজরত আলী থতমত করে বললো– কে? কে আপনি?

লায়লা বানু বললো– আমাকে চিনতে পারলে না হজরত আলী! তোমার ভাইজান নদী থেকে আমাকে তুলে আনার পর তুমি আমাদের শুকনো কাপড় এনে দিলে...

হজরত আলী লাফিয়ে উঠে বললো– হায় আল্লাহ! আপামণি, মানে হুজুরাইন, আপনি এখানে! আসুন– আসুন, ভেতরে আসুন আপনারা।

তোমার ভাইজান কি বাড়িতে আছেন?

আছেন, আছেন। আসুন, ভেতরে আসুন। সরাসরি আসেননি কেন ভেতরে?

কি করে আসবো। এই লোক দুটো তো যেতে দেয়নি ভেতরে। উল্টো আরো লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে আমাদের।

: কি গজব, কি গজব! সে কি কথা। তাড়া করেছে আপনাদের?

: হ্যাঁ। দেখছো না, লাঠি ওদের হাতেই আছে?

তাজ্জব! এতদূর? ঠিক আছে, এখনই এর চরম ব্যবস্থা করছি ভাইজানকে বলে দিয়ে। আপনারা আসুন, আসুন আপামণি, মানে হুজুরাইন!

: আবার হুজুরাইন কেন হজরত আলী? আমি তো তোমার সেই আপামণিই।

জি-জি। আসুন আপামণি আসুন–

লায়লা বানু ও মরিয়ম বিবিকে একরকম ঠেলে নিয়েই ভেতরে চলে গেল হজরত আলী। আয়েজ উদ্দিন কম্পিতকণ্ঠে ময়েজ উদ্দিনকে বললো– ময়েজ রে! চাকরিটা এবার সত্যি সত্যিই গেল!!

হজরত আলী এদের নিয়ে বাহির আঙ্গিনা ও বসার ঘর পার হয়ে সরাসরি অন্দরমহলে চলে এলো। অন্দর মহলে এসেই সে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের উদ্দেশ্যে হাঁকতে লাগলো– ভাইজান, ভাইজান! কে এসেছেন দেখুন। ও ভাইজান...

কাসিদ সাহেব তাঁর শয়ন কক্ষেই ছিলেন। বেরুতে বেরুতে বললেন– কে এসেছেন মানে? একদম অন্দর মহলে আবার কে এলো?

কে এলো– বেরিয়ে এসে দেখুন না? সাথে আর একজনও এসেছেন।

: আর একজন!

বলতে বলতে কাসিদ সাহেব বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বোরকা-পরিহিতা লায়লা বানু ও মরিয়ম বিবি অন্দর মহলে এসে মুখের ঢাকনা তুলে দিয়েছিল। লায়লা বানুই সামনে ছিল। কাসিদ সাহেবের নজর তার উপর পড়তেই তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন– আরে, আরে! সেকি! লায়লা বানু তুমি? পেছনে কে? মরিয়ম খালা নয়? তাইতো! কি তাজ্জব! তোমরা? তোমরা এসেছো? সাথে কে এসেছেন?

বিস্ময়াভিভূত লায়লা বানু ধীরকণ্ঠে বললো– কেউ আসেনি। কাসিদ সাহেব বললেন– কেউ আসেনি! সেরেফ তোমরা দুইজন? কি আশ্চর্য! তোমরা হঠাৎ আমার বাড়িতে?

জবাবে লায়লা বানু প্রশ্ন করলো– এ বাড়ি আপনার?

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– হ্যাঁ, আমার।

এই গোটা বাড়ি? ফটক, বাহির আঙ্গিনা, বসার ঘর, ভেতর আঙ্গিনা, এত ঘরদুয়ার– সব আপনার?

হ্যাঁ, সবই।

এতসব মূল্যবান আসবাবপত্র– এগুলোও আপনার?

হ্যাঁ, আপাতত আমারই। ঘরদুয়ার আসবাবপত্র আপাতত আমারই।

আপাতত মানে?

মানে, এগুলো আমার আব্বা-আম্মার ছিল। তাঁদের অভাবে আমার হয়েছে। আমার অভাবে কার হবে কে জানে?

এবার মুখ খুললো মরিয়ম বিবি। স্মিত হাস্যে বললো– সেকি কথা বাপজান? আপনার অভাবে আপনার ছেলে মেয়ের হবে।

কাসিদ সাহেবও স্মিতহাস্যে বললেন– আমার ছেলেমেয়ের? কি যে বলো খালা!

ইতিমধ্যে হজরত আলীর আনা কাজের ঝি ময়নার মা হজরত আলীর পাশে এসে দাঁড়ালো। তা দেখে মরিয়ম বিবি বললো– ওমা! এরা কে? আপনার কেউ নাকি নেই শুনেছিলাম।

ঠিক শুনেছো। এতদিন কেউ ছিল না। কিছুদিন আগে এরা এসে আমাকে বাঁচিয়েছে।

: বাঁচিয়েছে! কারা এরা বাপজান?

মালিক মুক্তার, সব কিছুর মালিক মুক্তার। আমার অভিভাবক।

লায়লা বানু আবার স্মিতকণ্ঠে বললো– আপনার অভিভাবক মানে? কে আপনার অভিভাবক? এই হজরত আলী?

কাসিদ সাহেব বললেন– এরা দুইজনই। হজরত আলী আর এই ঝি ময়নার মা– এদের দুইজনের উপরই এখন সব কিছুর ভার। আমার আর আমার ঘরদোর সব কিছুর দায়িত্ব এখন এদের উপর। এরাই আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে।

মানে?

মানে, এই যে ঘরদোর আসবাবপত্র সব কিছু এমন চকচকে ঝকঝকে দেখছো, এসব কি এমন ছিল? সব কিছু তো ধুলোবালিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ঘরগুলোর যা অবস্থা হয়েছিল, তা বর্ণনার বাইরে। ধুলোবালি, খড়কুটা, ঝুল-ময়লা, মাকড়সার জাল– মানে এক একটা ঘর এক একটা অরণ্য বরাবর ছিল। এরাই দুইজন সাফ করেছে সব কিছু।

এরাই সাফ করেছে সব?

এরাই। আর আজও করে।

: আজও করে?

সেরেফ এই কাজই নয়। বাজার সওদা, পাক শাক, মাজা-ঘষা, ধোয়া-মোছা– সব কাজ প্রতিদিন ওরাই করে।

বলেন কি?

বইঘর ও রোকন
কঠিন হয়ে যায়। দুইজনের পক্ষে দুরূহ হয়ে যায়। কিছু রেখে ছেড়ে করার কথা এদের এত করে বলি, তবু শুনে না। সব কিছু ষোলআনাই করে এরা। ঘেমে তেতে যায়, তবুও করে।

: তাজ্জব!

এদের পাশে নারী-পুরুষ কমপক্ষে আরো জনা দু'য়েক লোক এসে দাঁড়ালে, তবেই সকলে মিলে আরামে আয়েশে তারা কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারতো।

: তাহলে আনুন না আরো জনাদুয়েক কাজের লোক।

: ব্যস! আনতে চাইলেই কি তা পাওয়া যায়?

বেশি বেতন দিলেই তো পাওয়া যায়?

বেশি বেতন দিলে লাখে লাখে পাওয়া যায়, একথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বাসী লোক কি পাওয়া যায়?

: বিশ্বাসী লোক?

হ্যাঁ, বিশ্বাসী লোক। আমার তো চাকর-চাকরাণী চাইনে। চাই এদের মতোই আমার আর আমার সবকিছুর মালিক মুক্তার অভিভাবক। একান্তই পরিচিত আর বিশ্বাসী লোক ছাড়া অভিভাবক আর কে হতে পারে, বলো?

তা বটে। এ যুগে এমন লোক পাওয়া বড়ই কঠিন।

এবার হজরত আলী বললো– আমি বলি, ভাইজান, আপনি বিয়ে শাদি করেন। শ্বশুরবাড়ি থেকেই বিশ্বাসী লোক পাবেন। কিন্তু ভাইজান কি সে কথায় কান দেবেন?

কাসিদ সাহেব বললেন– থাক থাক, তোমাকে আর বাহাদুরী করতে হবে না। ময়নার মা, তুমি যাও, হাত মুখ ধোয়ার জন্যে এদের গোসলখানায় নিয়ে যাও। হাত মুখ ধুয়ে এসে এরা সহজভাবে বসুক। সেই সাথে এদের খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করো।

এ কথায় লায়লা বানু জোর আপত্তি তুলে বললো– না-না, খাওয়া দাওয়ার সময় পাবো না আমরা।

www.boighar.com

কাসিদ সাহেব বললেন– তা না পাও, নাশ্‌তা-পানিটা তো করতে হবে। আমার বাড়িতে পয়লা এলে, শুধু মুখে ফিরে যাবে তোমরা, তা কি হয়? যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসে বোরকার বহর খাটো করে আরামে বসো।

বলেই ফের হজরত আলীকে বললেন– হজরত আলী! তুমি যাও, চট করে

বইঘর ও রোকন

দোকান থেকে ভাল মিষ্টি আর কিছু ফলমূল নিয়ে এসো, জলদি।

সব যোগাড় যন্তর হয়ে গেলে আপত্তির মুখেও কাসিদ সাহেবের তাকিদে নাশ্‌তা পানি করতেই হলো লায়লা বানু আর মরিয়ম বিবিকে। নাশ্‌তা-পানি অন্তে লায়লা বানু আহসান উল্লাহ সাহেবকে একটু আড়ালে নিয়ে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার জনাব, কতদিন আর এই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করবেন? দেখে শুনে একটা বিয়ে শাদি করলেই তো পারেন। www.boighar.com

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– কি বললে? বিয়ে শাদি?

হ্যাঁ। তাতে করে সংসারে একজন নিজের লোক আসে। কতদিন আর পরের উপর নির্ভর করে থাকবেন? সঙ্গীবিহীন জীবন কোন জীবন নাকি?

: তা বটে, তা বটে।

এতদিনও যে তা করেন নি বড়? কার আশায় বসে আছেন? মনে ধরা কেউ আছে নাকি?

: আমার? বড় হাসালে! আমার আবার মনে ধরা কে থাকবে?

বলেন কি? আপনার মনে ধরা না থাকলেও, আপনাকে তো মনে ধরতে পারে অন্যের। আপনার মতো লোককে মনে ধরবে না কারো, এটা কি হয়? অনেকজনেরই মনে ধরে, থাকবে নিশ্চয়ই। তাদের কাউকে শাদি করুন, জীবন সুন্দর হবে। খোঁজ নিয়ে দেখুন।

খোঁজ নেবো? কার খোঁজ নেবো?

: আপনাকে যাদের মনে ধরেছে, তাদের।

: তাদের কি পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে যে, আমাকে মনে ধরবে তাদের?

কেন কেন? মনে ধরবে না কেন?

একজন ভবঘুরে বাউণ্ডেলকে কার মনে ধরবে, বলো? পথে ঘাটে দিন কাটে যার, স্থিতি নেই যার জীবনের, তাকে মন দিতে যাবে কোন পাগল?

তার মানে? পথেঘাটে দিন কাটলেই, একজন বিত্তহারী, মনপাগল করা, সুপুরুষকে মন দেবে না কেউ? চাইবে না শাদি করতে?

: না, চাইবে না। এছাড়া যে আরো একটা বিপত্তি আছে মস্তবড়।

: বিপত্তি?

মারাত্মক বিপত্তি। দুরন্ত বাধা। কবরে ঢোকার মতো এক পা যার ঢুকে আছে ফাটকে, যার যাবজ্জীবন জেল, ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হতে পারে যে কোন

মুহূর্তে, তাকে শাদি করতে চাইবে– এমন উন্মাদিনী কে আছে এই দুনিয়ায়!

: তার অর্থ? ফাঁসি, দ্বীপান্তর– এসব কি বলছেন আপনি?

কেন বলছি তা বুঝতে পারছো না? আমি একজন কাসিদ। জিহাদ আন্দোলনের লোক। এক্ষণে তেমন কিছু না করলেও অতীতে আমি অনেক ক্ষতি করেছি ইংরেজদের। অনেক বিপদে ফেলেছি আমি তাদের। তারা কি ভুলে গেছে সে কথা? ইংরেজ সরকারের বিষনজরে পড়ে আছি বরাবর। তাদের তরফ থেকে কখন যে কোন বদহুকুম আসবে আমার উপর– তার কি কিছু ঠিক আছে?

তাতে কি হয়েছে? বদ হুকুম আসতে পারে– এই চিন্তাতেই কি একজন বিত্তশালী আর চরিত্রবান সুপুরুষকে শাদি করবে না কেউ?

না, করবে না। করতে পারে না। জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না কেউ। তুমি নিজে না বোঝো, তোমার দাদু আহমদুল্লাহ খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, উনি তা যথার্থই বোঝেন। কারণ, উনার জীবনও নিরাপদ নয়।

তা না হলেও পরিবার পরিজন নিয়ে ঘর করেছেন তিনিও। আজও করছেন। ভবিষ্যতের চিন্তায় আটকে থাকেনি কিছু।

: লায়লা বানু!

ভবিষ্যতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি যদি কারো নসীবে তা লিখে থাকেন, তা এড়িয়ে যেতে পারবে না কেউ।

: বলো কি! এমন চিন্তা কি করে কোন মেয়ে?

: করে। আর কেউ না করলেও, একজন তা গভীরভাবে করে।

কে সে? বলো, কে সে মেয়ে?

লায়লা বানু মাথা নিচু করলো। কাসিদ সাহেব তাকিদ দিয়ে বললো– বলো, কে সে?

লায়লা বানু স্মিতকণ্ঠে বললো– আমি।

চমকে উঠলেন কাসিদ সাহেব। বললেন– তুমি? তুমি এমন চিন্তা করো?

করি।

তুমি আমাকে শাদি করতে আগ্রহী?

মনে প্রাণে।

বইঘর ও ব্লোকন

লায়লা বানু! তুমি মনেপ্রাণে আগ্রহী? কি খোশ নসীব আমার, কি খোশ নসীব!

আমার দাদুও এই সিদ্ধান্তই নিয়ে আছেন। আপনার সাথে আমাকে শাদি দিতে উনি যারপর নেই আগ্রহী। যে কোন সময় এ প্রস্তাব নিয়ে আসবেন উনি আপনার কাছে। আপনি যেন না করে বসবেন না তখন। হতাশ করবেন না যেন তাঁকে।

এই সময় ডাক পড়লো লায়লা বানুর। ডাক দিলো মরিয়ম বিবি। ডাক শুনেই দ্রুত সরে গেলেন কাসিদ সাহেব। মরিয়ম বিবি সরবে ডাকতে ডাকতে এসে লায়লা বানুকে বললো– বেলা একদম পড়ে গেছে আম্মাজান। আর দেরী করা যাবে না। ফিরতে হবে, চলো–

লায়লা বানু বললো– হ্যাঁ খালা, চলো।

দেখা-বোঝা হয়ে গেছে? মানে যে জন্যে আমরা এসেছিলাম?

হয়েছে খালা, হয়েছে। পুরোপুরি হয়েছে। পরে বলবো সব। চলো, সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি, চলো...

সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা। বলা বাহুল্য, হজরত আলীর নালিশে কাসিদ সাহেবের কাছে সেদিন দুর্দান্ত বকুনি খেতে হয়েছিল পাহারাদার আয়েজ উদ্দিন ও ময়েজ উদ্দিনকে।

পরের দিন সকালেই আহমদুল্লাহ খান চলে এলেন শাদির প্রস্তাব নিয়ে। এসেই তিনি খোশকণ্ঠে এ প্রস্তাব কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে দিলেন। প্রস্তাব শুনে আহসান উল্লাহ সাহেব কিছুক্ষণ দম ধরে বসে রইলেন। এরপর বিনয়ের সাথে বললেন– দেখুন মুরুব্বী, আপনার এ প্রস্তাব কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আহমদুল্লাহ খান সাহেব থমকে গিয়ে বললেন– সম্ভব নয় মানে? কি সম্ভব নয়?

আপনার নাতনি লায়রা বানুকে আমার শাদি করা সম্ভব নয়।

কেন, আমার নাতনি কি সুন্দরী নয়? সেকি কুৎসিত?

আহসান উল্লাহ সাহেব শশব্যস্তে বললেন– তওবা তওবা, তওবা। কোন দুশমনও এ অপবাদ তাকে দেবে না। তার মতো অপরূপা আর চিত্তহারী

সুন্দরী মেয়ে কদাচিত দেখা যায়।

: তবে? সে কি কাসিদ সাহেবের অযোগ্য?

কোন দিক দিয়েই নয় জনাব। রূপে-গুণে, শিক্ষায়-স্বভাবে সে একজন অদ্বিতীয়া মেয়ে। তাকে শাদি করতে পারলে যে কোন বাদশাহজাদাও ধন্য হবে।

: তাহলে আপনার আপত্তি কোথায় কাসিদ সাহেব?

আপত্তি কি বলছেন মুরুব্বী? তাকে শাদি করতে পারলে আমার মতো সৌভাগ্যবান আর কেউই হতো না। কিন্তু সে কিসমত যে আমার নেই।

কেন নেই? নেই কেন?

: অনেক যে অন্তরায়। দুর্লঙ্ঘ বাধা। শাদি করার কিসমত আমার নেই।

: নওজোয়ান!

কেন যে নেই আপনিও জানেন মুরুব্বী। আমার যা জিন্দেগী, তাতে কাউকেই আমার শাদি করা চলে না।

: আপনি কি আপনার জেহাদী জিন্দেগীর কথা বলছেন কাসিদ সাহেব?

একশো ভাগ সত্য কথা জনাব। আপনি তো জানেন, আমার অতীত কৃতকর্মের জন্যে আমি ইংরেজ সরকারের চরম বিষনজরে পড়ে আছি। যে কোন সময় আমার জেল, ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হতে পারে। কাজেই, কোন মেয়েকে শাদি করে কেন আমি তার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দেবো?

সেটা তো একটা সম্ভাবনার কথা। চিরসত্য কিছু নয়। এখন তো আপনি তেমন কোন কিছুই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে করছেন না; কাজেই...

আপনি একথা বলছেন মুরুব্বী? আপনিই কি ঐ বিপদ থেকে মুক্ত?

না, তা নই। তবে সে সম্ভাবনাটা এখন কম, তাই বলছি।

কম, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত তো আমরা কেউই নই। আমাদের কৃতকর্মের জন্যে যে কোন সময় তারা আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। পারে না, বলুন?

আহমদুল্লাহ খান সাহেব থমকে গিয়ে বললেন– হ্যাঁ, তা পারে।

তারা যে রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ তাতে তারা আমাদের ফাঁসি বা দ্বীপান্তরও দিতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে বই কি!

আমাদের বাড়িঘর বিষয় সম্পত্তি সব কিছু বাজেয়াপ্ত করতে পারে?

বইঘর ও রোকন

: তাও পারে।

: তবে? তেমন অবস্থায় আপনার নাতনিকে শাদি করলে...

বললামই তো, এগুলো সবই একটা সম্ভাবনার কথা। কোন নিশ্চিত কিছু নয়।

: মুরুব্বী!

ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের সম্ভাবনা এখন খুবই কম। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট এখন আর এসবের বিশেষ পক্ষপাতী নয়। আমি খবর করে জেনেছি।

কিন্তু অতীত অপরাধের জন্যে আমাদের সব কিছু তো বাজেয়াপ্ত করতে পারে তারা। বাড়িঘর বিষয়বিত্ত।

: হ্যাঁ, সেটা পারে।

: জেলে রাখতে পারে?

: তাও পারে।

আপনার তো এখন বৃদ্ধকাল মুরুব্বী। সে বিবেচনায় ইংরেজরা কিছু না করলেও আপনার বয়স তো...

আমাকে মাফ না করতেই পারে। একদম ঠিক কথা বলেছেন কাসিদ সাহেব। একদম সত্য কথা। আমার যা বয়স আর শরীরের যা অবস্থা তাতে যে কোন সময় আমি ইন্তেকাল করতে পারি। এ ব্যাপারে আদৌ সন্দেহ নেই।

কে কখন ইন্তেকাল করবেন, সেটা আল্লাহর হাতে। বয়স কোন ফ্যাকটার নয়। তবু বয়সটাকে তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যায় কি?

: না না, কখ্খনো না।

তবে? আপনিও রইলেন না, আমাদের সব কিছু বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, তখন? ইংরেজরা আমাকে জেল ফাটকে না রাখলেও, সে অবস্থায় আমারই খাওয়ার কিছু থাকবে না। আপনার নাতনিকে খাওয়াবো কি?

: তাজ্জব! নিজেকে তো আপনি বড়ই স্বার্থপর করে তুলছেন কাসিদ সাহেব। আপনি যদি জীবিত থাকেন, সে অবস্থায় আমার নাতনি আর আমার পরিবারের অপর দুইজনের কি হবে, সে চিন্তা আপনি করবেন না? আমার অভাবে তাদের দেখার আর কে থাকবে, বলুন?

: মুরুব্বী!

আপনাকে যদি ঘাসপাতা খেয়ে বাঁচতে হয় তাদেরকেও ঘাসপাতা খেয়ে বাঁচিয়ে রাখা কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে না? আপনি কি সেটা এড়িয়ে যেতে পারবেন?

কাসিদ সাহেব চমকে উঠে বললেন– না না, তা পারবো না, কিছুতেই পারবো না। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই এড়িয়ে যেতে পারবো না। বুক দিয়ে তাদেরকে আগলে রাখবো আমি। কিন্তু সে অবস্থায় আমাদের সবাইকে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে– এই কথা বলছি!

হজরত আলী প্রথম থেকেই এঁদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এঁদের কথাবার্তা শুনছিল আর ছটফট করছিল। এবার সে চিৎকার করে বলে উঠলো– অসম্ভব অসম্ভব! এ আপনি কি বলছেন ভাইজান? অনাহারে মারা যাবেন মানে? আমার এত জমিজমা আছে তাহলে কিসের জন্যে ভাইজান? কে খাবে আমার জমির ফসল? কে আছে আমার? আল্লাহ না করুন, তেমন দুর্দিন যদি আসে, আমার যতখানি জমিজমা আছে তার ফসল দিয়ে শুধু আপনি আর আপামণিরা কেন, আমাদের সহকারে সাত আটজনের দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। রাজার হালে না হোক, আরামে আয়েশে কেটে যাবে। আপনি চিন্তা করছেন কেন?

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বিহ্বল কণ্ঠে বললেন– হজরত আলী!

হজরত আলী বললো– আপামণি আপনাকে বড়ই ভালবাসেন ভাইজান। এটা আমি বুঝে নিয়েছি। শাদিতে আপনি রাজী হয়ে যান। ভবিষ্যতের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সতো সৎ মানুষের উপর কখনো বিরূপ হবেন না।

আহমদুল্লাহ খান সাহেব সানন্দে বলে উঠলেন– মারহাবা মারহাবা! এ ছেলে কে কাসিদ সাহেব?

কাসিদ সাহেব সংক্ষেপে বললেন– আপনার মতোই আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী আর আপনজন ! পরে বলবো সব।

এঁদের কথায় কান না দিয়ে হজরত আলী বললো– বাড়িঘর সব যদি ইংরেজেরা বাজেয়াপ্ত করে নেয়ই গাঁয়ে এই গরীবের কুঁড়েঘরটাতো আছেই। সেখানে আমরা নিশ্চিন্তে থাকবো। ইংরেজদের নজর সেখানে কোনদিনই যাবে না।

কাসিদ সাহেব ফের মুগ্ধকণ্ঠে বললেন– হজরত আলী!

হজরত আলী বললো– খামাখা এই মুরুব্বীকে হতাশ করছেন কেন? আপনি

আপামণিকে শাদি করতে রাজী হয়ে যান ভাইজান। আমি বলছি, আপামণিকে শাদি করলে সত্যিই বড় সুখের জীবন হবে আপনাদের।

আহমদুল্লাহ খান সাহেব আবার আওয়াজ দিয়ে উঠলেন– আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! কি কাসিদ সাহেব, আর আপত্তি আছে?

কাসিদ সাহেব সাগ্রহে বললেন– না মুরুব্বী! আর একবিন্দুও আপত্তি নেই। আমি এক পায়ে খাড়া। আপনি দিন ঠিক করে ফেলুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা করবো। তবে একটাই নাতনি আমার। যোগাড়-যন্তর করে ধুমধামের সাথে শাদিটা সম্পন্ন করতে চাই আমি। তাতে কিছু সময় লাগবে তো।

তা লাগুক। যত সময় লাগে লাগুক। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। দু'মাস ছ'মাস– যা লাগে লাগুক। আমি সব সময়ই রাজি, এই আমার কথা।

হজরত আলী ফের বলে উঠলো– ভবিষ্যতের চিন্তাকে গুলি মারুন ভাইজান। ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে। আল্লাহর কাজ আল্লাহ করুন। তা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে যাবো কেন?

এবার আহমদুল্লাহ খান সাহেব ও কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব দুইজনই এক সাথে আওয়াজ দিলেন– সাব্বাশ! সাব্বাশ!!

৩

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব আরবি ভাষায় লেখা একটি বিরল গ্রন্থ আনার জন্যে হজরত আলী মণ্ডলকে মালদহ সদরে পাঠিয়েছেন। বহু খুঁজে পেতে বইটি সংগ্রহ করে নিয়ে হজরত আলী ফিরে যাওয়ার জন্যে টাংগাষ্ট্যান্ডে এসে বসে আছে টাংগার অপেক্ষায়। সব টাংগাই মানিকচকে যায় না। যেগুলো মানিকচকে যায়, তারই একটার অপেক্ষায় বসে আছে হজরত আলী। স্থানটায় চা-বিস্কুট ও পান-বিড়ি সিগারেটের বেশ কিছু দোকান পাট। খদ্দেরদের জন্যে দোকানগুলোর সামনে লম্বা লম্বা বেঞ্চ পাতা। এরই একটা খালি বেঞ্চে বসে আছে হজরত আলী।

একটু পরেই সাহেবী কায়দায় এসে হজরত আলীর পাশে বসলো ডগলাস সাহেবের তাঁবেদার ফ্যাটিগ চেন অর্থাৎ ফটিক চান ফটকে। সিগারেট ধরিয়ে সাহেবী কায়দায় পর পর কয়েকটা টান দিলো সে। এরপর হজরত আলীর দিকে তাকিয়েই ফটিক চান ফটকে সপুলকে বলে উঠলো– এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। এটা সেই শিষ্য না? গুরুভক্ত শিষ্য?

ফটকে এসে পাশে বসায় হজরত আলী নাখোশ ছিল। তাই ফটকের কথায় কান না দিয়ে সে বসে রইলো চুপচাপ। কিন্তু ফটকে ছাড়ার পাত্র নয়। হজরত আলীর দিকে এগিয়ে এসে বসে ফটকে সরবে বললো– ঠিক ধরেছি, ঠিক ধরেছি। তুমি নির্ঘাত সেই শিষ্য। ঠিক বলিনি? কি, ঠিক বালিনি শিষ্য মশায়?

ফটকের বেয়াড়া তাকিদে কথা বলতেই হলো হজরত আলীকে। বললো– শিষ্য মানে?

জবাব পেয়ে ফটকে আরো উৎসাহভরে বললো– এ্যান্টেনাস এ্যান্ট। শিষ্য মানে শিষ্য। গুরুভক্ত শিষ্য।

গুরুভক্ত!

বুঝলে না? আর বুঝবে কি করে, ইংরেজি তো শেখোনি? ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

গুরুকে যে ভক্তি করে, সেই হলো গুরুভক্ত।

কে গুরুকে ভক্তি করে?

: তুমি। সে কি একটু আধটু ভক্তি? ধামাভরা ভক্তি।

: কি বাজে কথা বলছো?

বাজে কথা, বাজে নয়। তোমার গুরুকে তুমি যে রকম ভক্তি করো, সে রকম ভক্তির তুলনা চলে একমাত্র আমাদের দেবতুল্য স্যারদের প্রতি আমাদের ভক্তির সাথে। তোমার গুরুকে তুমি হাই হাই ভক্তি করো। করো না, বাতাও?

কে আমার গুরু?

: আরে কয়কি! এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! কে তোমার গুরু, সেটাও কি বলতে হবে? গুরু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো দেখে শিষ্যও ঝাঁপ দিলো নদীতে। নিজের জানের মায়া রাখলো না।

: অর্থাৎ?

খেয়া নায়ে নদী পার হওয়ার কথা বলছি। সেই যে সেবার গুরুর পাশে, তুমিও তো ছিলে নায়ে বসে। আমি ঠিক ধরে ফেলেছি।

ও আচ্ছা।

আচ্ছা নয়, আচ্ছা নয়। এমন ভক্তি যদি তুমি আমার ইংলিশ স্যারদের করতে তাহলে আমার বাঘের বাচ্চা বাঘ ইংলিশ স্যারেরা তোমাকেও একটা বাঘ বানিয়ে দিতো। এদেশের একটা হোমড়া চোমড়া হয়ে যেতে নির্ঘাত।

: বটে!

তা না করে তুমি ভক্তি করতে গেলে কিনা এদেশের গরুভেড়া মার্কা একটা ব্লাডি নেটিভকে। একটা বেহোড় কালা আদমীকে।

তোমার ঐ শ্বেত বাঁদরদের চেয়ে আমাদের দেশভক্ত নেটিভরা হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ মানুষ। স্বদেশীর সর্বনাশ সাধনে বিদেশীর দালালী যারা করে তারা গরুভেড়ার চেয়ে নিকৃষ্ট জীব।

: নিকৃষ্ট জীব! নিকৃষ্ট মানে কী? ইংলিশকে বাত করো।

: তুমি ইংলিশ জানো?

জানি মানে? আলবত জানি। এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। ইংলিশ ছাড়া আমি কথাই বলি না।

বইঘর ও রোকন

: থাক থাক! তোমার যা ইংলিশ তা শুনলে শেয়াল কুত্তাও হেসে ফেলবে।

: কি বললে? আমার ইংলিশ খারাপ?

: না না, খারাপ হবে কেন? শেয়াল কুত্তার ইংলিশ শেয়াল কুত্তার মতোই হয়। সে হিসেবে খাশা ইংলিশ তোমার।

: কি? আমি শেয়াল কুত্তা।

: সেটা তুমি বোঝো?

ফটিক চান ফটকে সক্রোধে বললো– বুঝি কিনা টের পাবে। অল্পদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

হজরত আলী প্রশ্ন করলো– মানে?

দিয়েছি ঠুকে। তোমার গুরুর বিরুদ্ধে দিয়েছি রিপোর্ট হাঁকিয়ে। আমার সাথে মামদোবাজি? তোমার গুরুর এবার নির্ঘাত দ্বীপান্তর। দ্বীপান্তর ছাড়া যাতে করে আর অন্য কোন শাস্তি না হয়, সে তদবির ডগলাস স্যারের কাছে স্যারের এই ফটিক চানই করবে।

: তুমি রিপোর্ট হাঁকিয়েছো?

: আলবাত। কড়া রিপোর্ট, আর রেহাই নেই।

: বটে!

আমি ইংলিশ স্যারদের একজন তুখোড় টিকটিকি– মানে গোয়েন্দা, তা জানো? এমন রিপোর্ট পেশ করেছি যে, নির্ঘাত দ্বীপান্তর। এবার গুরুর দ্বীপান্তর দেখে শিষ্য ভেউ ভেউ করে কাঁদবে আর এই ফ্যাটিগ চেন বসে বসে হো হো করে হাসবে।

তুমি রিপোর্ট পেশ করবে কি? তুমি তো ইংরেজিই জানো না। তাই লিখতে জানার প্রশ্নও উঠে না।

উসমে কিয়া হ্যায়? আমার প্রাণপ্রিয় ডগলাস স্যারের মুন্সী ক্রেজী ক্যাডার (কাজী কাদের) আছে না? তাকে আমি মুখে বলেছি আর ক্রেজী ক্যাডার সেটাকে ইংরেজি করে পেশ করেছে।

ও, তাহলে ঐ ক্রেজী ক্যাডার ইংরেজি করে লিখে দিয়েছে?

বললামই তো, সে-ই লিখে দিয়েছে।

তোমার তাহলে লেখার মুরোদ নেই?

তো কি হয়েছে? সবাই কি লিখতে পারে? এই যে তুমি, তোমারও কি সে

মুরোদ আছে।

নেই?

না। মুখে বলা ছাড়া, লেখার মুরোদ যে তোমার আছে, তা আমার মনে হয় না।

: জি-না দালাল মশায়। আমি বলতেও পারি লিখতেও পারি।

পারো? কি লিখতে পারো? আমার ইংলিশ হুজুরদের ইংলিশ তো তোমার বাপেরও লেখার সাধ্য নেই। কি লিখতে পারো তুমি? হিন্দি, না নাগরী?

: নাগরী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাগরী লিখতে পারি আমি।

: নাগরী লিখতে পারো?

পারি পারি। আমি ভূত-নাগ্‌রী লিখতে পারি।

: ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। ও-গড। ভূত-নাগরী আবার কি? ও লিখা দিয়ে কি হয়?

: ভূত নামানো হয়।

: ভূত নামানো হয় মানে?

মানে, বিদেশীদের পা-চাটা বেহুদার ঘাড় থেকে বেহুদাপনার ভূত ঝেঁটিয়ে নামানো হয়।

ফটিক চান ফটকে সরোষে বললো– তার মানে? এ কথা তুমি কাকে বলছো?

হজরত আলী নির্বিকার কণ্ঠে বললো– যে বিদেশীর দালাল, মানে সেবাদাস, তাকে বলছি।

: তার অর্থ? তুমি তাহলে নিশ্চয়ই একথা আমাকে বলছো।

: তা যদি বুঝে থাকো, তা হলে তাই।

হুঁশিয়ার! তোমার এত বড় সাহস? ভুলে যেও না, ক্রেজী ক্যাডারকে দিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছি, তাতে তোমার গুরুর দ্বীপান্তর ঠেকায় কোন শালা!

: দ্বীপান্তর?

: নির্ঘাৎ। কতবার বলবো? ওটা আমি হওয়াবোই হওযাবো।

: হওয়াও। শকুনের কাঁদনে গরু মরে না।

অর্থাৎ?

তোমার চেষ্টাতেই দ্বীপান্তর হবে না, তোমার প্রাণপ্রিয় প্রভু ডগলাসের ইচ্ছাতেও দ্বীপান্তর হবে না।

: হবে না?

না, বাপেরও বাপ আছে তা জানো? ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দ্বীপান্তর আর পছন্দ করেন না। তোমরা কেঁদে করবে কি?

তার মানে– তার মানে?

ফকিরের দৌড় মসজিদ পর্যন্তই। তোমাদের দৌড় ফটিকতক। এর বেশি নয়।

এই সময় মানিকচক যাওয়ার একটা টাংগা এসে হাঁকতে লাগলো– মানিকচক কেউ যাবে? মানিকচক?

হজরত আলী লাফিয়ে উঠে বললো– আমি যাবো, আমি যাবো।

বলেই সে টাংগার দিকে দৌড় দিলো।

মানিকচকে ফিরে এসেই হজরত আলী গ্রন্থটি কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের হাতে দিলো। গ্রন্থটি দেখেই কাসিদ সাহেব আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন– এ্যাঁ! পেয়েছো? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বড়ই অনুশোচনায় ছিলাম।

হজরত আলী বললো– কেন ভাইজান, অনুশোচনায় কেন?

তোমাকে খামাখা হয়রান করার জন্যে। তুমি কিতাবটি পাবে না, এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। তোমাকে পাঠিয়ে দেয়ার পরে আমার সে হুঁশটা হয়েছিল।

: তাই?

এটি একটি দুর্লভ গ্রন্থ। দিল্লী বা অযোধ্যার লক্ষ্ণৌ শহরের কোথাও দু'এক কপি পাওয়াটা সম্ভবপর ছিল। তুমি মালদহ সদরেই এটা পেয়ে যাবে, আমি ভাবতেও পারিনি।

ভাইজান!

এ ছাড়া আরো একটা ব্যাপার ছিল, যা তোমাকে পাঠানোর আগে খেয়াল করিনি। আর পাঁচটা মামুলি জিনিস আনতে পাঠানোর খেয়ালেই তোমাকে পাঠিয়ে ছিলাম।

কি সেটা ভাইজান?

গ্রন্থটি আরবিতে লেখা। নামটাও আরবি নাম। বাংলার নাম গন্ধও গ্রন্থটির কোথাও নেই। তাই, তুমি কিতাবটি চিনতে পারবে কি না– এ নিয়েও সন্দেহ

ছিল আমার।

কেন, সন্দেহ কিসের?

এমন নির্ভেজাল আরবি পড়ে পড়ে বইটি তুমি খুঁজে বেড়াতে পারবে কি না, এই সন্দেহ।

কেন, পড়তে পারবো না কেন?

: তুমি এতটা আরবি জানো?

: মানে?

কিছু কিছু আরবি তুমি জানো, এ ধারণা ছিল আমার। কিন্তু এত বেশি জানো–

সেকি ভাইজান? আমি বলিনি, মক্তবটা আমি ভালভাবেই পাশ করেছি। আর আমি যে মক্তবটা পাশ করেছি সে মক্তবটাও আর পাঁচটা মক্তবের মতো যেন তেল ফালতু মক্তব নয়। একবারও ফেল না করলে, ছয় ছয়টা বছর লাগে সে মক্তব পাশ করতে। সেখানে বাংলা অংক ইংরেজি কিছু কিছু পড়ানো হলেও, তামাম জোর ছিল আরবির উপর। এক তরফাভাবে পড়ানো হয়েছে আরবি। আরবির উপর এত চাপ ছিল যে নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুত পাইনি আমরা।

: আচ্ছা! তাই আরবির উপর তোমার এত দখল?

না, খুব বেশি দখল নয়। তবে, সব আরবির অর্থ সঠিক না বুঝলেও, সব আরবিই আমি পড়তে পারি ছর ছর করে।

: সাব্বাশ! তাই বইটা যোগাড় করতে কোন অসুবিধা হয়নি তোমার।

হয়নি কি বলছেন ভাইজান? বিস্তর খুঁজতে হয়েছে। বইয়ের সকল দোকান তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে এক বৃদ্ধ মওলানা সাহেবের বইয়ের দোকানে গিয়ে হঠাৎই পেয়ে গেলাম বইটা। মওলানা সাহেব বললেন– কিতাবটির একটা কপি আমার বাড়িতে আছে আর একটা কপি এই দোকানে পড়ে আছে অনেকদিন থেকে। ধুলো-বালিতে ঢেকে আছে বইটা। এই বলে ধুলো বালি ঝেড়ে বইটা তিনি আমার হাতে দিলেন। দামও নিলেন খুবই সামান্য।

সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! তাই?

: জি। তা এটি কিসের কিতাব ভাইজান? কি নিয়ে লেখা?

এটি একটি ইসলামি ফতোয়ার কিতাব। ইসলামের বিধান তথা ইসলামের

আদেশ নির্দেশ নিয়ে লেখা। ইংরেজরা কি এ বই রেখেছে। প্রায় সব কপিই পুড়িয়ে ফেলেছে। লুকানো ছাপানোভাবে দু'এক কপি এখানে ওখানে আছে।

ও, তাইতো কথা বলার সময় মওলানা সাহেব এদিক ওদিক চেয়ে ছোট ছোট করে কথা বললেন আর সাবধানে বইটা দিলেন।

এখন আর বইটি নিয়ে বেশি ভয় না থাকলেও ইংরেজরা এটাকে বরদাস্ত করতে চাইবে না আজও।

ও আচ্ছা।

সময় মতো বইটির কিছু কিছু অংশ পড়ে শুনাবো আর অর্থ বুঝিয়ে দেবো। বিশেষ করে ইহুদি-নাসারাদের ব্যাপারে ইসলামের আদেশ উপদেশের দিকটা। এখন যাও, অনেক দূর থেকে এসেছো। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নেবে, যাও...

এবার কিছুটা বিষণ্ন হলো হজরত আলীর মুখমণ্ডল। বললো– যাবো ভাইজান, তবে একটা খারাপ খবর আছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– খারাপ খবর?

জি ভাইজান, খুব খারাপ খবরই বলা যায়। আপনাদের উপর, মানে আপনার আর লায়লা বানু আপার দাদুর উপর ইংরেজদের আক্রোশের ব্যাপার নিয়ে কথা।

কি রকম?

মালদহ সদর থেকে ফিরে আসার সময় টাংগা ষ্ট্যান্ডে ডগলাস সাহেবের পা-চাটা গোলাম ফ্যাটিগ চেনের সাথে দেখা। মানে, ফটিক চান ফটকের সাথে।

ও আচ্ছা। তা কি কয় ফটকে?

: কয়, আপনাকে নাকি দ্বীপান্তরে পাঠিয়েই ছাড়বে সে।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব মুচকি হেসে বললেন– সাব্বাশ! ফটিক চান ফটকে পাঠাবে আমাকে দ্বীপান্তরে?

না ভাইজান, ফটকে পাঠাবে না। পাঠাবে ফটকের প্রভু ঐ ডগলাস সাহেব।

অর্থাৎ?

আপনার বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা জড়িয়ে এক ভয়ংকর রিপোর্ট দিয়েছে ফটকে। সে রিপোর্ট দেখে ডগলাস সাহেব নাকি ঐ সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

ফটকে রিপোর্ট দিয়েছে? সে তো লেখাপড়াই জানে না।

বইঘর ও রোকন
: ফটকে নিজে লেখেনি। সে মুখে বলেছে আর তা সাজিয়ে গুছিয়ে গরম করে লিখে দিয়েছে ডগলাসের মুন্সী কাজী কাদের। ওদের ভাষায় ক্রেজী ক্যাডার। ঐ ক্রেজী ক্যাডারই লিখে দিয়েছে।

বটে! তা কোন বিষয় নিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নিয়েছে ফটকে?

ঐ যে সেবার খেয়া নায়ে নদী পার হওয়ার সময় তার যে সব তর্ক হলো আপনার সঙ্গে, মানে আপনি একজন জিহাদী, এখনো কাসিদের কাজ করছেন, যে কোন সময় যে কোন ইংরেজকে খুন করতে পারেন আপনি– এইসব বিষয় নিয়েই রিপোর্ট লিখিয়ে নিয়েছে ফটিক। এছাড়া, ফটকে ইংরেজদের দেবতা আর তার স্বদেশীদের গরুভেড়া বলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনি যা যা বলেছিলেন– সে সব কথাও নিশ্চয়ই সে তুলে নিয়েছে রিপোর্টে। এটা সে ছাড়েনি।

: আচ্ছা।

আপনি ইংরেজদের এক ভয়ংকর দুশমন, একজন দুর্ধর্ষ খুনী– একথার উপরই সে জোর দিয়েছে বেশি।

: দিক দিক। ফটকে বললেই তাই হবে?

: না ভাইজান, তাই হয়েছে। ডগলাস সাহেব তা আমলে নিয়েছে।

: মানে?

ইতিমধ্যেই রাতুয়ার, অর্থাৎ তের নং পুলিশ ষ্টেশানের ও.সি. বাদল সরকারকে, ওদের ভাষায় ব্লাড সাকারকে দিয়ে তদন্ত করা হয়ে গেছে।

: তদন্ত করা হয়ে গেছে! বাদল সরকার কি তদন্ত করেছে?

কি তদন্ত করেছে তা তো আমি জানিনে। তবে শুনেছি, আপনি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্য হাকিম আহসান উল্লাহ কিনা– সে অমাত্য এই মানিকচকে এসে ডেরা গেড়েছে কিনা– এইসব বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।

: ব্লাড সাকার কি বলেছে?

বলেছে– না, ও অমাত্য নয়। তবে এখানে মানিকচকে কাসিদ আহসান উল্লাহ নামের একজন লোক আছে, যাকে নিয়ে আগে কিছু বিপদের আশংকা ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই।

ব্যস, তাহলে তো হয়েই গেল।

কি হয়ে গেল ভাইজান?

বইঘর ও রোকন

ঐ ফটকের রিপোর্টে কিছু হবে না।

তা কি করে বলা যায় ভাইজান? আপনি একজন কাসিদ– একথা শুনেই নাকি ডগলাস সাহেব আঁতকে উঠেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বাদল সরকারকে এখনও খুবই সতর্ক থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

তুমি এসব খবর কোথায় পেলে? ঐ ফটকে তোমাকে বলেছে?

জি-না ভাইজান। বলেছে মুন্সী কাজী কাদেরের বাজার করা এক লোক। গতকালই বাজারে তার সাথে দেখা। কথায় কথায় তার সাথে আলাপ হওয়ায়, সে এসব কথা বললো। আপনাকে বলবো বলবো করতেই আপনি আমাকে মালদহ সদরে পাঠালেন, তাই বলা হয়নি। মানে, বলার ফুরসুত পেলাম না।

: হুঁ উঁ, ফটকের রিপোর্টে কিছুটা কাজ হয়েছে দেখছি।

: তাহলে কি হবে ভাইজান? সত্যি সত্যিই আপনার যদি দ্বীপান্তর হয়?

: তাই বিশ্বাস করো তুমি?

ফটকে যে আদাপানি খেয়ে লেগেছে ভাইজান! সে নাকি ডগলাস সাহেবকে দিয়ে আপনাকে এ দণ্ড দেওয়ায়েই ছাড়বে।

ঐ ডগলাস কাঁকলাসের কি সাধ্য আছে আমাকে দ্বীপান্তর দেয়ার? সে তো সামান্য একজন পুলিশ অফিসার। বড় লাট ছোট লাট কিছুই নয়।

কিন্তু ডগলাস সাহেব যদি তদ্বির করে? ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ করে?

তবু কিছু হবে না। লায়লা বানুর দাদুর কাছে সেদিন শোনোনি, পার্লামেন্ট আর দ্বীপান্তরের পক্ষপাতী নয়?

: জি জি। সে কথা ফটককেকে আমি শক্তভাবে শুনিয়ে দিয়েছি। কিন্তু...

কিন্তু কি?

সে কথা কি আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন?

দৃঢ়ভাবে না করলেও আমি যথেষ্টই বিশ্বাস করি। কারণ, এদেশের পরিস্থিতি এখন বদলে যাচ্ছে। লড়াইয়ের বদলে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে এদেশে। মুসলমানরাও জিহাদ আন্দোলন বাদ দিয়ে সমঝোতার পথে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে। সুতরাং ডগলাসদের সুপারিশে কিছু হবে না।

পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলো না হজরত আলী। হজরত আলী চিন্তিতকণ্ঠে বললো– কিন্তু...

ফের কিন্তু কি?

দ্বীপান্তর দেয়াতে না পারলেও ডগলাস তো অন্য শাস্তি দিতে পারে আপনাকে।

: অন্য শাস্তি কি শাস্তি?

জেল ফাটক তো খাটাতে পারে আপনাকে?

জেল ফাটক?

: জি। বিভিন্ন অপরাধের জন্যে দেশে তো জেল ফাটক কোনদিন বন্ধ ছিল না, আজও নেই। আর এজন্যে পার্লামেন্টের দরকার পড়ে না। পুলিশের সুপারিশে এদেশের জজেরাই জেলে পাঠাতে পারে কাউকে। যাবজ্জীবন জেলও হরহামেশাই দিচ্ছে এদেশের আদালত।

: হজরত আলী!

দিচ্ছে না, বলুন?

: হ্যাঁ, তা দিচ্ছে বৈ কি! হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধ পেলে তা দিচ্ছে আর ভবিষ্যতেও দেবে।

: আপনাকেও তো তা দিতে পারে?

আমাকে? কেন? এখন আর সাংঘাতিক অপরাধ আমার কি আছে যে আমাকে যাবজ্জীবন দেবে?

: না থাকলেও তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেরাই কোন পাগল মাতাল খুন করে সে দায় আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে?

ওরে বাসরে! অনেক গভীরে গিয়ে চিন্তা করছো তুমি। শত্রুতা করলে মানুষ অনেক রকম শত্রুতাই করতে পারে যখন তখন।

সেই জন্যেই তো বলছি, তাতে করে জেল ফাটক তো দিতে পারে অন্তত।

: হ্যাঁ, তা পারে। তবে তার বেশি আর সম্ভব নয়।

সেই কথাই ফটকেকে আমি বলেছি।

ঠিক করেছো। তবে কথা হলো, ঐ নিয়েই সবাই যদি চিন্তা করে সব সময়, তাহলে কি কেউ সংসার করতে পারবে, না কারো বেঁচে থাকা সম্ভব হবে?

তা মানে, সবার কথা নয় ভাইজান! সবাই তো আর আপনার মতো

এদেশের শাসকদের বিষ নজরে নেই। চিন্তা তো আপনাকে নিয়েই।

দেখো হজরত আলী, আল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের পাতাটাও নড়ে না। আল্লাহ যদি তেমনই চান, তাহলে আমরা ভেবে কি করবো?

: ভাইজান!

তোমার কথাই তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। তোমাকে বলতে হয়– ওসব ফালতু চিন্তাকে গুলি মারো হজরত আলী। সব কিছুই আল্লাহর হাতে। আল্লাহর কাজ আল্লাহ করুন, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করবো কেন?

এবার হেসে ফেললো হজরত আলী। বললো– বাপরে! আমার কথাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন ভাইজান?

কাসিদ সাহেবও হেসে বললেন– না দিয়ে করবো কি? অধিক ফালতু চিন্তা করে তুমি পেরেশান হয়ে পড়েছো! যাও যাও, ঘরে যাও। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নেবে, যাও...

তের নম্বর থানার ও.সি. বাদল সরকার ওরফে ব্লাড সাকারের বর্ণনা অনুসারে কাজী কাদের ওরফে ক্রেজী ক্যাডার, মালদহের পুলিশ কমিশনার ডগলাসকে জানালো, মানিকচকের আহসান উল্লাহ একজন কাসিদ। শুনামাত্র চমকে উঠলেন ডগলাস সাহেব এবং সন্ত্রস্তকণ্ঠে কাজী কাদেরকে বললেন– কীপ ওয়াচ অন হিম। উহার উপর টিক্ষ্ণ নজর রাখো। ও. সি. ব্লাড সাকারকো এলাট করিয়া ডাও।

ডগলাস সাহেবের আদেশ অনুযায়ী কাজী কাদের বাদল সরকারকে এলার্ট, অর্থাৎ সতর্ক থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। ডগলাস সাহেবের নির্দেশ ছিল সতর্ক থাকার। কিন্তু বাদল সরকার নির্দেশ পাওয়া মাত্র সতর্ক থাকার স্থলে পুনরায় পুরোপুরি তদন্তে নেমে গেল। সোজা কথা নয়, বড় সাহেবের হুকুম। তার গাফিলতির জন্যে যদি পান থেকে চুন খসে, তাহলে শুধু চাকরিটাই নয়, মাথাটাও থাকবে না বাদল সরকারের।

কিন্তু পুনরায় তদন্তে নেমে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে নতুন কিছুই পেলো না বাদল সরকার। ফলাফল ঐ যথা পূর্বং তথা পরং। কাসিদ সাহেবকে নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। বাড়ির বুড়ো বলদের মতোই এখন তিনি এক নিরাপদ ব্যক্তি। আসল কথা, জিহাদ আন্দোলনের সাথে আহসান উল্লাহ সাহেব এখনো সম্পর্কটা পুরোপুরি বাদ না দিলেও বাদল সরকার ধরে নিলো–

বইঘর ও রোকন

জিহাদ আন্দোলনের সাথে তাঁর আর বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় মরে গেছে জিহাদ আন্দোলন আর ফুরিয়ে গেছে জিহাদের সাথে কাসিদ সাহেবের সকল সম্পর্ক। সুতরাং তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত বা ভীত হওয়ার কিছুই নেই।

কিন্তু চেরা তুলতে বোরা উঠার মতোই এক তদন্তে নেমে বাদল সরকারের সামনে বেরিয়ে এলেন এমন এক ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে জেনে আঁতকে উঠলো বাদল সরকার। আর এই ব্যক্তিটি হলেন মানিকচক বাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তি আহমদুল্লাহ খান সাহেব। জিহাদ আন্দোলনের সাথে পূর্বে তাঁর যত সম্পর্কই থাক, এক্ষণে তা প্রায় শেষ হয়ে গেলেও, বাদল সরকার পেয়ে গেল একেবারেই উল্টো এক চিত্র। তাঁর সম্বন্ধে বাদল সরকার যে ভুল তথ্য পেলো, তা হলো– এই খান সাহেব একজন মারকুটে জেহাদী। এখনও তিনি জিহাদ আন্দোলনের মূল ঘাঁটি সীমান্ত প্রদেশে অস্ত্র, অর্থ আর পুনর্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে সপ্তাহে সপ্তাহে সীমান্তের মূল ঘাঁটিতে ছুটে যাচ্ছেন। বাদল সরকারের ধারণা মতে এই আহমদুল্লাহ খান পুলিশ কমিশনার ডগলাস সাহেবের প্রাণ তো বটেই, সেই সাথে যে কোন মুহূর্তে তার নিজের প্রাণও বিপন্ন করে তুলতে পারে।

এমন তথ্য পাওয়ার পর বাদল সরকার কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে? সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো মানিকচক বাজারে এবং কয়েকজন সেপাইসহ খান সাহেবের বাড়িতে এলো ঘটনাটা তদন্ত করে দেখতে।

বাড়ির গেটে এসে বাদল সরকার সগর্জনে ডাক হাঁক শুরু করলো। আহমদুল্লাহ খান সাহেব সে সময় হঠাৎ করেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন নিশ্চেষ্ট অবস্থায়। ডাক হাঁক শুনে বাড়ির বিশ্বস্ত কাজের লোক আজম শেখ গেট খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। বাইরে এসে পুলিশ দেখে চোখ তার ছানাবড়া। সে থতমত করে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার, আপনারা?

জবাবে বাদল সরকার গরমকণ্ঠে বললো– আমি এই থানার ও. সি। থানা দারোগা। এটা কি আহমদুল্লাহ খানের বাড়ি?

আজম শেখ বললো– জি স্যার, তারই বাড়ি।

বাদল সরকার হুকুম উঠলো– তাঁকে বোলাও। ডাকো তাঁকে কুইক! এখনই আসতে বলো।

আজম শেখ ইতস্তত করে বললো– কিন্তু স্যার, তাঁর তো আসার উপায় নেই।

বাদল সরকার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– হোয়াট! উপায় নেই মানে? বাড়িতে নেই বুঝি? ঐ সীমান্তে ছুটে গেছে বুঝি?

: সীমান্তে ছুটে গেছেন মানে? উনি সীমান্তে যাবেন কেন?

কেন, সে ব্যাখ্যা তোমাকে দেবো নাকি? যা বলছি তার উত্তর দাও। উনি কি বাড়িতে আছেন না নেই?

: জি স্যার, আছেন।

তবে? ডাক দেয়া বাদ দিয়ে এত টালবাহানা করছো কেন তাহলে? যাতে করে উনি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান, সেই জন্যে?

: না স্যার, পালিয়ে যাবেন কেন? তার পালিয়ে যাওয়ারও সাধ্য নেই।

তার অর্থ?

উনি ভয়ানক অসুস্থ স্যার। তাঁর এখন মরণাপন্ন অবস্থা।

মরণাপন্ন অবস্থা! চলো, ভেতরে গিয়ে দেখি, কেমন মরণাপন্ন অবস্থা!

: না স্যার, এখন তাঁর কাছে যাওয়া যাবে না। তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

ঘুম ভেঙ্গে যাবে মানে?

আজম শেখ করুণ কণ্ঠে বললো– মানে, সাতদিন থেকে তিনি ভীষণ অসুস্থ। গত তিন দিন তিন রাত তাঁর ঘুম না থাকায় মাথায় রক্ত উঠে যায়। এতে করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন আর ভুল বকতে শুরু করেন। ফুটে যায় তাঁর দুই চোখ। হেকিম এসে দাওয়াই দেয়াতে আর তাঁর মাথায় পানি ঢালার ফলে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে গেছেন। হেকিম সাহেব বলেছেন, এই গোটা দিন আর গোটা রাত তাঁকে ঘুমিয়ে থাকতে হবে। এর মধ্যে ঘুম ভাঙ্গানো যাবে না। হঠাৎ এখন ঘুম ভাঙ্গালে আবার তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রোক হয়ে মারা যাবেন উনি।

বাদল সরকার বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো– তার মানে, তার মানে?

আজম শেখ বললো– আসুন স্যার, বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা ভেতরে এসে সামনের ঐ বৈঠকখানায় বসুন, বলছি সব। আসুন... আসুন!

বাদল সরকার অগত্যা কনষ্টবলদের নিয়ে বৈঠকখানায় এলো। বসতে বসতে বললো– কি যেন বলছিলে? ষ্ট্রোক হয়ে মারা যাবে মানে?

আজম শেখ বললো– সেইটেই স্বাভাবিক্ স্যার। বয়স তাঁর নব্বই ছুঁই ছুঁই। বয়সের ভারে শরীর তার এমনিতেই দুর্বল। তার উপর বিরাট বিদ্বান মানুষ

বইঘর ও রোকন
উনি। রাত জেগে পড়াশুনা করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। সেই রাত জেগে পড়াশুনা করতে গিয়ে ঘুম তাঁর একেবারেই ছুটে যায় আর রক্ত উঠে যায় মাথায়। এতে করেই এই অবস্থা।

বাদল সরকার বিস্মিতকণ্ঠে বললো– বয়স তাঁর নব্বই ছুঁই ছুঁই?

আজম শেখ বললো– জি স্যার, অনেক তাঁর বয়স।

মস্ত বড় বিদ্বান লোক তিনি?

মস্ত বড়, বস্ত বড়। আর শুধুই কি বিদ্বান? যেমনই তিনি সৎ মানুষ, তেমনই তাঁর সৎ ব্যবহার। তাঁর সৎ ব্যবহারের জন্যে এই এলাকার অনেক লোক তাঁকে যেমন ভালবাসেন, তেমনই শ্রদ্ধা করেন।

এই সময় হেকিম সাহেব আবার এলেন রুগীর খবর নিতে। ভেতরে ঢুকেই বৈঠকখানায় আজম শেখ আর পুলিশ দেখে হেকিম সাহেব সবিস্ময়ে আজম শেখকে প্রশ্ন করলেন– কি ব্যাপার শেখ সাহেব, এখানে পুলিশ কেন?

আজম শেখ বললো– আমার হুজুরের কাছে এসেছেন হেকিম সাহেব।

হেকিম সাহেব বললেন– হুজুরের কাছে মানে? তার কাছে পুলিশ কেন?

হয়তো হুজুরের কোন অপরাধ পেয়েছেন। নইলে পুলিশ আসবে কেন?

তাজ্জব! নব্বই বছর বয়স্ক একজন সদাশয় মানুষের অপরাধ পেলেন পুলিশ? জোয়ান কালের ব্যাপার হলে অন্য কথা ছিল। এখন কি অপরাধ পেলেন এঁরা? বলেই পুলিশদের লক্ষ্য করে বললেন– এই যে, বলুন তো দেখি, কি অপরাধ পেলেন আপনারা?

বাদল সরকার বললো– সে অনেক কথা। আপনি কি হেকিম সাহেব? রুগী দেখতে এসেছেন?

হ্যাঁ, রুগী দেখতে! রুগীর যা অবস্থা তাতে কখন কি হয় কিছু ঠিক নেই। তাই আপনারা দয়া করে এখন যান। রুগী সুস্থ হয়ে উঠলে পরে এসে উনার অপরাধের খোঁজ করবেন। এখন দয়া করে বাঁচতে দিন লোকটাকে।

কিছুটা অপ্রভিত হলো বাদল সরকার। বললো– তা মানে, আপনি ভেতরে গিয়ে রুগী দেখুন হেকিম সাহেব। আমরা এই লোকের সাথে কথা বলি। এর সাথে কথা বলেই আমরা চলে যাবো।

জি, দয়া করে তাই যান। তা শেখ সাহেব, রুগীর ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি তো?

আজম শেখ বললো– না হেকিম সাহেব। উনি ঘুমুচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরা

বইঘর ও রোকন
উনার পাহারায় বারান্দায় বসে আছে। ওদের কাছে খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবেন। দাওয়াই কিছু দিতে হলে ওদেরই দিয়ে যান।

ঠিক আছে– ঠিক আছে। আমার যা করার আমি করছি। আপনি এদের সাথে কথা বলুন।

অন্দরমহলে চলে গেলেন হেকিম সাহেব। বাদল সরকার এবার আজম শেখকে প্রশ্ন করলো– তা তুমি, মানে আপনি কে?

আজম শেখ বললো– আমি মূলত এ বাড়ির চাকর। আপনারা আমাকে তুমিই বলবেন।

এ বাড়ির চাকর?

হ্যাঁ, চাকর হিসাবেই এ বাড়িতে ঢুকি আমি। তবে এক্ষণে আমি এ বাড়ির অভিভাবক।

: অভিভাবক?

হ্যাঁ, আমার হুজুর তো, মানে খান সাহেব তো, এখন প্রায় অচল মানুষ। কোন সাতে-পাঁচে আর নেই তিনি। এ বাড়ির সকল দায়িত্ব এখন আমার উপর।

www.boighar.com

তোমার উপর? তা কি দায়িত্ব? www.boighar.com

যাবতীয় দায়িত্ব। এই সংসারটার সব দায়িত্বই এখন আমি বহন করি। সব কিছু দেখাশুনা, যাবতীয় লেনাদেনা, সব আমি করি। সবার সঙ্গে সব যোগাযোগ, সকল বাৎচিত আর সব সমস্যার সমাধান আমাকেই করতে হয়। এক কথায়, এ বাড়ির অভিভাবক আর মুখপাত্র সব এখন আমিই। এ সংসারে তো হুজুর ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষ নেই। আমার অচল হুজুরের আমিই প্রতিভূ। হুজুরের হয়ে সব আমিই করি।

এবার কিছুটা গম্ভীর হলো বাদল সরকার। বললো– তোমার হুজুর তাহলে এখন আর কোথাও যাতায়াত করতে পারেন না?

না। এই বাজার এলাকার বাইরে অন্য কোথাও আর যেতে পারেন না দীর্ঘদিন যাবত।

একটা সত্যি কথা বলো তো? জিহাদ আন্দোলনের ডেরা ঐ সীমান্ত এলাকায় শেষ বার কবে গিয়েছিলেন উনি?

সীমান্ত এলাকায়। সেখানে যাবেন কেন?

অস্ত্র, অর্থ মুজাহিদ– এ সব পৌঁছাতে?

সে কি! আপনারা কি খোয়াব দেখছেন? এসব পৌঁছাতে উনি সেখানে যাবেন কেন?

জিহাদ আন্দোলন চালু রাখতে। উনি কি জিহাদ আন্দোলনের সমর্থক নন? সত্যি করে বলো? উনার প্রতিভূ বলে নিজেকে দাবী করছো, সত্য গোপন না করে আসল কথাটা বলতো?

: আসল কথা!

: হ্যাঁ। উনি তো জিহাদ আন্দোলনের একজন কট্টর সমর্থক।

এবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর হলো আজম শেখ। বললো– তা যদি বলেন, তাহলে শুধু আমার হুজুর কেন, এদেশের নব্বই ভাগ আল্লাহ প্রেমিক, দেশপ্রেমিক, ঈমানদার আর সৎমানুষ সকলেই এই আন্দোলনের কট্টর সমর্থক। আজ তেমন না হলেও ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের আগে সব সময় আর পরে কিছুদিন পর্যন্ত– নব্বই ভাগ মানুষই এই আন্দোলনের কট্টর সমর্থক ছিলেন।

তোমার হুজুরও ছিলেন?

হ্যাঁ, ছিলেন।

তাহলে তো অবশ্যই অস্ত্র, অর্থ আর মুজাহিদ নিয়ে সীমান্তে যেতেন?

তা যাবেন কেন? সমর্থক হলেই কি সবাই এসব নিয়ে সীমান্তে যেতেন? সবাই আন্তরিক সমর্থক আর উৎসাহ দান করতেন। কিছু সংখ্যক লোক, যাঁরা সক্রিয়ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাই ওসব নিয়ে সীমান্তে যেতেন।

তোমার হুজুরও যেতেন। আজ না হোক, আগে ওসব নিয়ে যেতেন। যেতেন না?

: আমি কখনো দেখিনি।

দেখো নি?

জীবনেও দেখিনি।

কতদিন থেকে তুমি এ বাড়িতে আছো? তোমার আসার আগে নিশ্চয়ই যেতেন?

আমি আমার কিশোর বয়স থেকে, মানে চৌদ্দ পনের বছর বয়স থেকে এ বাড়িতে আছি। আজ আমার বয়স ষাটের উপরে। এর মধ্যে তাঁকে ঐ সীমান্তে যেতে কখনো দেখিনি।

বলো কি? তবে যে শুনলাম...

জিহাদ আন্দোলন সমর্থক হওয়া আর ঐ সীমান্তে যাতায়াত করা এক কথা নয়। আপনারা কার কাছে কি শুনেছেন, তা আপনারাই জানেন। তবে সব কথাই যে সত্যি নয়– এটা জানেন না আপনারা!

কোন সত্যিটা জানিনে আমরা?

উনি যে অস্ত্র, অর্থ আর মুজাহিদ নিয়ে সীমান্তে যাতায়াত করতেন, এটা সত্যি কথা নয়।

যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়?

হলে তার শাস্তি দেবেন। বিনা অপরাধেই তো সন্দেহের উপর কত লোককে শাস্তি দিয়েছেন আপনারা। এটা সত্য হলে আর ছেড়ে দেবেন কেন? উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

হুঁশিয়ার! এ কথা মনে থাকবে তো? আমরা কিন্তু অনুসন্ধান চালানো ছেড়ে দেবো না। চালিয়েই যাবো।

চালিয়ে যান। আমরা দেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না।

বটে!

বললামই তো, সত্যি হলে আবার আসবেন। আমরা এখানেই থাকবো।

অবশ্যই আসবো। তোমার কথা সত্যি না হলে অর্থাৎ মিথ্যা হলে, আমরা চুপ করে বসে থাকবো না।

অতঃপর বাদল সরকার তার সঙ্গীদের বললো– এই চলো সবাই, আজ আমরা ফিরে যাই। প্রয়োজনে আবার আসবো। এখন যাই, চলো...

সঙ্গীদের নিয়ে উঠে গেল বাদল সরকার ওরফে ব্লাড সাকার। ব্লাড সাকার কথার বাংলা অর্থ হলো রক্ত চোষা।

৪

আহমদুল্লাহ খান সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ার কয়েক দিন আগে বিশেষ উদ্দেশ্যে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব সীমান্তে এলেন। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেবানী যে, একদিন একরাত টানা ঘুমানোর ফলে মাথার রক্ত নেমে গেল আহমদুল্লাহ সাহেবের আর তিনি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। আল্লাহ না করুন, ঐ ধাক্কাতেই যদি তিনি ইন্তেকাল করতেন, তাহলে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের আফসোসের সীমা থাকতো না। অন্তিমকালে তাঁর পাশে না থাকতে পারার আর শেষ দেখা না হওয়ার দুঃখ আজীবন কাসিদ সাহেবকে বয়ে বেড়াতে হতো। খান সাহেবের ইন্তেকাল লায়লা বানু আজম শেখ আর মরিয়ম বিবির বুকে নিদারুণভাবে বাজতো, এটা ঠিক। কিন্তু কাসিদ সাহেবের বুকেও সেটা কম বাজতো না। বরং শেষ সময়ে কাছে থাকতে না পারার বেদনা কাসিদ সাহেবকে আজীবন পীড়া দিতো পিত্তশূলের মতো। আল্লাহ তায়ালার অপার করুণা যে, সীমান্ত থেকে ফিরে এসে কাসিদ সাহেবকে এমন করুণ পরিস্থিতিতে পড়তে হলো না।

অনেক দিন পরে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে সীমান্তে একবার আসতেই হলো বিশেষ প্রয়োজনে। আর সে প্রয়োজনটা হলো– এই সত্তর দশকে এসে জিহাদ আন্দোলন টিকিয়ে রাখার আর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। লড়াই করে আর ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব নয়– এটা এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে। আর এজন্যেই আল্লাহ প্রেমিক ও দেশপ্রেমিক বিজ্ঞ দেশবাসীরা অনেক আগেই এ পথ ত্যাগ করে রাজনীতির পথ অবলম্বন করেছেন। জিহাদের পথ অর্থহীন বোধে তাঁরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের সাথে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করছেন।

কাসিদ সাহেবও এই মতই সমর্থন করেন। বিজ্ঞজনদের মতো তিনিও বুঝেছেন, লড়াইয়ের চিন্তা-ভাবনা এখন অর্থহীন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পথ পরিবর্তন করা একান্তই প্রয়োজন। তাই জিহাদের মূল ঘাঁটিতে এখন কি

বইঘর ও রোকন
চিন্তা-ভাবনা চলছে– তা জানার জন্যে আর নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্যে একবার সীমান্তে আসতেই হলো কাসিদ সাহেবকে। সীমান্তে এসে দেখলেন, বিতর্ক চলছে সেখানেও। শতকরা প্রায় পচানব্বই জন জিহাদী চাইছেন, জিহাদ সংগঠন তুলে দিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করতে আর রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক চাইছেন– ইংরেজ সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ জেল জুলুম দ্বীপান্তর– এসবের প্রতিবাদ করার জন্যে জিহাদ সংগঠন টিকিয়ে রাখতে।

এই বিতর্কের সময় এসে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তাঁর অভিমত তুলে ধরলেন। বললেন– সেই প্রতিবাদ আর তলোয়ার দিয়ে করতে আমরা পারাবো না। শক্তি দিয়ে যে ইংরেজদের আমরা আর কাবু করতে পারবো না, তা নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সে প্রতিবাদ এখন করতে হবে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে। রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করলে তবেই কিছু কাজ হবে, অন্যথায় নয়।

শেষ পর্যন্ত সেই মতই টিকলো। রাজনৈতিক পথে অগ্রসর হতে পক্ষে-বিপক্ষে উভয় দলই সম্মত হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আগে থেকেই এই মতের পক্ষপাতি ছিল। সংখ্যালঘু দলও পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এই মতই সমর্থন করলো। অনর্থক রক্তক্ষয় করতে তারাও আর চাইলো না।

সেই সাথে কথা হলো– অতঃপর সবাইকে সংযতভাবে আর সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। দ্বীপান্তর তেমন আর না হলেও, দেশে জেল-ফাটক মৃত্যুদণ্ড আগে থেকেই ছিল, এখনও আছে। জিহাদ আন্দোলনের সাথে যাঁরাই জড়িত ছিলেন, তাঁদের নতুন অপরাধ পেলে ইংরেজ সরকার লাফিয়ে উঠবে খড়গ হাতে নিয়ে। সুতরাং নতুন অপরাধ তো আর চলবে না, পূর্ব অপরাধ প্রকাশ পেলে সবাইকে কায়দা করে সেটাও এড়িয়ে যেতে হবে। না পারলে আত্মগোপন করতে হবে। এতেও কাজ না হলে, আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকতে হবে চুপচাপ। আল্লাহ তায়ালা যার নসীবে যা রেখেছেন তাই হবে। খামাখা পেরেশান হয়ে কাজ নেই।

কয়েকদিন সীমান্ত প্রদেশেই রয়ে গেলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। এর পরে কার্যোপলক্ষে তিনি পাঞ্জাবে এলেন। পাঞ্জাবে এসে শুনতে পেলেন স্যার বাচ্চন নামের পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের এক ইংরেজ সেক্রেটারী মস্ত বড় খয়ের খাঁ সেজেছেন আর ১৮৫৭ সনের বিপ্লবীদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা আর বিদ্বেষমূলক রিপোর্ট পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কাছে

পেশ করেছেন।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আহসান উল্লাহ সাহেব ঐ বাচ্চন সাহেব কেমন মানুষ তা জানার জন্যে, পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সদর দপ্তরের কাছাকাছি এক স্থানে এলেন আর কথা বলার মতো সুবিধাজনক লোক খুঁজতে লাগলেন। এই সময় সেই স্যার বাচ্চন সাহেবের এক গবেট মার্কা আঁতেলকে পেয়ে প্রশ্ন করলেন– আচ্ছা বলতে পারেন, এই গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী স্যার বাচ্চনকে তাঁর দপ্তরের বাইরে কোথায় আর কখন পাওয়া যাবে?

শুনেই আঁতেলটা লাফিয়ে উঠে বললো– তার মানে, তার মানে? তুমি কোথা থেকে এসেছো?

কাসিদ সাহেব বললেন– সীমান্ত প্রদেশ থেকে।

সীমান্ত প্রদেশ থেকে? ভেরী গুড, ভেরী গুড। তা এখানে এসেছো কেন? হোয়াই?

এই একটু বেড়াতে এসেছি। মানে ট্যুরে।

: ট্যুরে এসেছো?

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই।

: নিশ্চয়ই তাহলে স্যার বাচ্চন হুজুরকে দেখতে এসেছো। ঠিক নয়?

: তা কথা হলো...

আরে ইয়েস কিংবা নো– একটা কিছু বলো। ভাবছো কেন?

: হ্যাঁ। কথা না হলেও এক নজর তাঁকে দেখতাম– এই আর কি!

ইয়েস– ইয়েস। ভেরী গুড। তুমি এখানে ষ্ট্যান্ড করে থাকো, আমি শুনে এসে বলছি। স্যার ভাল লোক। খুব ভাল লোক, ড্যান্ডারাস লোক নয়।

বলেই আঁতেলটি দৌড়ে চলে গেল। আহসান উল্লাহ সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলেন, কি ব্যাপার! লোকটা পাগল, না মতলববাজ! কিন্তু আমাকে তো সে চেনে না। অচেনা লোকের সাথে মতলববাজি করবে কেন? যাকগে, পাগল ছাগল যা হয় হোক। অন্য কাউকে পেলে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে চলে যাই। ফালতু কৌতূহল পোষণ করি কেন?

এইসব ভাবতে ভাবতে ওখানেই আনমনে ঘুরতে লাগলেন কাসিদ সাহেব।

এদিকে আঁতেলটি এসে একথা স্যার বাচ্চনকে বলতেই স্যার বাচ্চন

বললেন– ইউ ব্লাডি রটেন ঘাষ্ট, হোয়াট ডু ইউ ছে? এক আডমী হামার এরিয়ায় ট্যুর করিটেছে?

রটেন গোষ্ট (ঘোষ্ট) মানে আঁতেলটি বললো– ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার।

: টুমি উহাকে চেনে?

নো স্যার, নো স্যার।

কোঠা ঠেকে আসিয়াছে?

: সীমান্ত প্রদেশ থেকে স্যার।

চমকে উঠলেন সাহেব। বললেন– ও মাই গড! জিহাদী আডমির ডেরা।

কথাটা না বুঝেই রটেন ঘোষ্ট (গোষ্ট) বললো– ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার।

ওখান ঠেকে আসিয়াছে?

: ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ট্যুরে এসেছে।

: ট্যুরে আসিয়াছে? হোয়াই, হোয়াই?

: স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছে। ডেকে দেবো স্যার?

(ভীতকণ্ঠে) ও নো, নো। নট বিফোর মী। উহাকে হামার সামনে আনিবে না। হামি শুনিয়াছে, সীমান্তের বিলকুল আডমী জিহাডী আডমী। ড্যাঞ্জারাস আডমী। হামি বহুট জিহাডী আডমী এ্যারেষ্ট করিয়াছে। ফাঁসীটে ঝুলাইয়াছে। হামার সামনে আনিবে টো উও আডমী পয়চান করিয়া লইবে। পয়চান করিয়া লইবে টো কায়ডা মাফিক হামাকে শ্যূট করিয়া ডেবে। গোলি ছুড়িবে।

ড্যান্ডারাস কথা, ড্যান্ডারাস কথা। ঠিক আছে স্যার। ওকে আমি কেষ্টো নাম শুনায়ে দেবো। এমন কেষ্টোনাম শুনাবো যে, ব্যাটা বাপ বাপ করতে করতে এই শহর থেকে পালাতে দিশে পাবে না।

টো যাও, জলডি জলডি উহাকে খেষ্টো নাম শুনাও–

ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার...

সঙ্গে সঙ্গে আবার দৌড় দিলো রটেন গোষ্ট ওরফে ঘোষ্ট। পূর্ব স্থানে এসে কাসিদ সাহেবকে দেখেই সে হৃষ্টচিত্তে বলে উঠলো– এই যে তুমি এখানে আছো? ভেরী গুড, ভেরী গুড। কিন্তু সাহেব তোমাকে দেখা দেবে না।

কাসিদ সাহেব বললেন– কেন, ভয় পেয়েছেন?

ইয়েস, ইয়েস। তুমি একজন জিহাদী। শুনেই সাহেব তা বুঝতে

পেরেছেন। ভাগো ভাগো। যদি গুড চাও, তাহলে এক্ষুণি এখান থেকে পালাও। এই মুলুক ছেড়ে পালাও। নইলে, তোমাকে আমি এ্যারেষ্ট করবো।

এ্যারেষ্ট করবে! তুমি কি পুলিশ?

পুলিশ! নো নো, পুলিশ নই। আমি একজন ফুলিশ।

সেকি! তুমি ফুলিশ?

একশোবার ফুলিশ। আমার স্যার আমাকে ফুলিশ বলেন। পুলিশ বলেন না।

আচ্ছা! তোমার নাম?

রটেন গোষ্ট।

কেয়া গজব। রটেন গোষ্ট মানে?

মানে আমার নাম রতন ঘোষ। আমার স্যার আমাকে রটেন গোষ্ট বলেন। ইংরেজি নাম দিয়েছেন। খাশা ইংরেজি নাম।

আই সি!

: ভাগো ভাগো। জলদি ভাগো। নইলে এখনই তোমাকে এ্যারেষ্ট করবো।

এ্যারেষ্ট করবে? তুমি? হাসালে!

হোয়াই হোয়াই?

তুমি তো রটেন ঘোষ্ট মানে, পঁচাভূত!

পঁচাভূত?

: আলবত। রটেন মানে পঁচা গোষ্ট অর্থাৎ ঘোষ্ট মানে ভূত, পঁচাভূত।

সে কি পঁচাভূত?

গলা পঁচাভূত। পা দিয়ে ডলন দিলেই তুমি একদম কাদা। মাটির দেয়াল দেয়া কাদা। তোমার তো উঠে দাঁড়ানোর শক্তিই নেই। তুমি আমাকে এ্যারেষ্ট করবে কি?

কি মানে? আমি ফুলিশ। ফুলিশ তোমাকে এ্যারেষ্ট করবে না তো পূজা করবে?

পূজা!

ইয়েস ইয়েস!

অন্য কিছু নয়?

নো, নো! বইঘর ও রোকন

তাহলে করো পূজা।

হোয়াট? পূজা করবো মানে? তোমাকে এ্যারেষ্ট করবো।

এ্যারেষ্ট করবে?

ইয়েস ইয়েস!

বেশ, করো এ্যারেষ্ট।

ভেরী গুড, ভেরী গুড। হ্যান্ড আনো দেখি! হ্যান্ড এদিকে বাড়াও।

কেন?

এ্যারেষ্ট করবো।

কি দিয়ে? তোমার হাতে শিকল কই, সাথে সিপাই কৈ? বন্দুকও তো নেই? এ্যারেষ্ট করবে কি দিয়ে, আর কিভাবে?

হুঁশে এলো রটেন ঘোষ্ট। বললো– তাই তো, তাইতো! আমি ফুলিশ আর আমার হাতে শিকল বন্দুক কিছুই নেই। হ্যান্ড আমার খালি? ঠিক হ্যায়। তুমি এখানে ষ্ট্যাণ্ড করো, আমি এক দৌড়ে গিয়ে ওসব নিয়ে আসি। এক দৌড়ে।

আমি ততক্ষণ এখানে ষ্ট্যান্ড করবো? মানে, দাঁড়িয়ে থাকবো?

থাকবে। নইলে তোমাকে এ্যারেষ্ট করবো কি করে।

উল্লুক কাঁহাকার। তুমি আমাকে এ্যারেষ্ট করবে আর সেজন্যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো?

থাকবে না তো কি করবে?

আমি চলে যাবো।

(খুশি হয়ে) ভেরী গুড, ভেরী গুড। তাহলে তাই যাও। গেলে তোমাকে এ্যারেষ্ট করতেও হবে না, কেষ্টো কথা শুনাতেও হবে না।

কেষ্টো কথা!

নো- নো, কেষ্টো কথা নয়, খেষ্টো কথা। আমার স্যার বলেন খেষ্টো কথা।

চোপ রও! পাগল কাঁহাকার! তোমার সাথে কথা বলতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।

কি? আমি পাগল?

বদ্ধ পাগল। ঘোর পাগল।

রতন ঘোষ এবার চিৎকার করে বলে উঠলো– খুন করবো। জ্যান্ত কবর দেবো। ভাগো। ভাগো এখান থেকে...

এই সময় উকিলের পোশাক পরা এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন– আহ! রাস্তায় হোল্লা করে কে? একি! রটেন গোষ্ট, মানে রটেন ঘোষ্ট নয়? তাইতো! সেই ইল্লতটাই তো!

রতন ঘোষ ফের চিৎকার করে বলে উঠলো– হোয়াট? আমি ইল্লত আমি ফুলিশ।

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন– হ্যাঁ, ফুলিশই তো। এখানকার সবাই জানে তুমি এক নম্বরের ফুলিশ।

রতন ঘোষ এ কথায় খুশি হয়ে বললো– সেটাই শুধু জানে না। সবাই জানে আমি ইংলিশ জানা ফুলিশ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও সবাই জানে। তোমার ইংলিশ তো মোটে তিনটে। ইয়েস– নো– ভেরী গুড। তার সাথে ষ্ট্যাণ্ড, হ্যান্ড হোয়াই– হোয়াট– এই রকম কয়েকটা শব্দ।

কেন, ডেন্ডারাস। ওটাও তো আমি জানি।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেন্ডারাস। ওটাও তোমার ইংলিশ। বিরাট ইংলিশ, তাই নয়?

ইয়েস ইয়েস। আমি বিস্তর ইংলিশ জানি। শুনবে আমার ইংলিশ? শুনবে তো ষ্ট্যান্ড করো...

বলেই রতন ওরফে রটেন ঘোষ্ট আগন্তুক ভদ্রলোকের সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন– দূর হ। দূর হ পাগল কাঁহাকার। তোর সাথে পাগলামী করলে আমার চলবে? আমার কাজ নেই!

তবু পথ না ছেড়ে রটেন ঘোষ্ট ভদ্রলোকের আরো কাছে এসে দাঁড়ালো। একদম তাঁর বুকের উপর বলতে লাগলো– শুনো শুনো, আমার ইংলিশ জব্বোর ইংলিশ। শুনলে ধন্য হয়ে যাবে। ষ্ট্যান্ড করো আর শুনো–

এবার ভদ্রলোক যার পর নেই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন– আহ!

এই বলেই তিনি জোরে ধাক্কা মেরে রতন ঘোষকে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে রতন ঘোষ ছিটকে এসে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়লো এবং তাল সামলাতে না পেরে জড়িয়ে ধরলো

কাসিদ সাহেবকে। ক্ষেপে গেলেন কাসিদ সাহেবও। বললেন– আরে বালাই। ছাড় ছাড়...

বলেই তিনি আরো ঠেলা দিয়ে রতন ঘোষকে ফেলে দিলেন মাটিতে আর দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেলেন।

মাটিতে পড়ে গিয়ে রতন ঘোষ চিৎকার করে উঠে বলতে লাগলো– ওরে বাবারে! মরেছিরে! এ ব্যাটা জেহাদী। আলবত জেহাদী। ডেন্ডারাস আদমী। আমার হুজুর স্যার বাচ্চনকে বলে দিয়ে জরুর ওকে শায়েস্তা করে নেবো। আচ্ছা মতো শায়েস্তা নেবো। ইংলিশ হুজুরদের ফুলিশকে আঘাত করে ব্যাটা! এতবড় সাহস!

তা দেখে আশপাশের লোকজন মুখ চেপে হাসতে লাগলো। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন, 'আবার বোধ হয় কোন ফ্যাসাদ করে ফেললাম।'

হজরত আলী পারঘাটের উপর তার বর্গাদার মেহের আলীর বাড়িতে এসে ডাকতে লাগলো– মেহের মিয়া বাড়িতে আছো, মেহের মিয়া?

বাড়ির ভেতর থেকে মেহের আলী উচ্চকণ্ঠে বললো– কে? কে ডাকে?

হজরত আলী বললো– আমি হজরত আলী।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে মেহের আলী বললো– এ্যাঁ, এসেছো? হজরত আলী ভাই, তুমি এসেছো? এসো, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।

বলেই দৌড়ে এসে হজরত আলীকে টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল মেহের আলী। একটা টুল এগিয়ে দিয়ে বললো– বসো বসো, এখানে বসো।

বসতে বসতে হজরত আলী বললো– কি ব্যাপার মেহের মিয়া? এমন জরুরী তলব যে?

মেহের আলী বললো– খবর আছে, খবর আছে। খুশির খবর। তোমার কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে সেই থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

তাই নাকি?

তাই নাকি মানে? এখন তুমি কোথায় আছো তাতো জানিনে। জানলে আমি নিজেই ছুটে যেতাম তোমার কাছে।

আচ্ছা।

তোমার গাঁয়ের বাড়ি আমি চিনি। কিন্তু এখন যেখানে আছো, সে বাড়ি তো চিনি না। শুনলাম, এখন এক রাজবাড়িতে আছো তুমি। একদম রাজবাড়ি। আহা! কি শানদার তোমার নসীব!

কে তোমাকে এ খবর দিলো?

যে তোমাকে ডাকতে গেল, সেই লোক। তোমার গাঁয়ের লোক। তোমার সেই গাঁয়ের লোক এখানে এসেছিল আর তার মুখে সব শুনলাম। শুনেই তো তোমাকে আসার জন্যে খবর দিতে বললাম। সেই রাজবাড়িটা আমি চিনলে কি আর কাউকে খবর দিতে বলি? আমি নিজেই ছুটে যেতাম। আহা কি খুশীর ব্যাপার! কি নসীবের খেল!

: নসীবের খেল!

হ্যাঁ। জব্বোর নসীব না হলে ঐ রাজবাড়িতে তোমার স্থান হয়? আল্লাহ তোমার ভালোই করুন, আল্লাহ তোমার ভালাই করুন। কপাল একখান তুমি করেছিলে হজরত আলী ভাই। নইলে খড়ের বাড়ি ছেড়ে একদম দালান বাড়ি? খড়ের ঘর ছেড়ে দালান ঘর?

মেহের মিয়া!

ঐ বাড়িটা নাকি ঐ যে বিরাট লোক, মানে ঐ নামকরা লোক কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ি?

: হ্যাঁ, তারই বাড়ি। তুমি তাঁকে চেনো? পরিচয় আছে?

কি যে বলো? অতবড় লোকের সাথে কি পরিচয় থাকা সম্ভব? দূর থেকে দেখেছি। সে কি নূরানী চেহারা! একদম রাজপুত্র।

তা ঠিকই বলেছো। তবে সব রাজপুত্রই কিন্তু দেখতে এত সুন্দর হয় না। উনি অনেক রাজপুত্রেরও বাড়া। সংসারের অবস্থাও তাঁর রাজার মতোই। কোন কিছুর অভাব নেই।

সেই কথাই তো বলছি। সেই লোকের বাড়িতেই নাকি এখন আছো তুমি।

হ্যাঁ, সেই লোকের বাড়িতেই।

: আগে থেকেই পরিচয় ছিল বুঝি?

: আগে থেকে মানে?

মানে, নদীতে ভিজে তুমি যেদিন সবার জন্যে আমার বাড়ি থেকে শুকনো কাপড় চোপড় নিয়ে গেলে, সেদিনের আগে থেকে?

: তুমি জানতে সে কথা? মানে, উনি ভিজে এসে বসে আছেন, তা জানতে?

না না, তা জানতাম না। জানলে কি আর বসে থাকতাম ঘরে? ছুটে তাঁকে দেখতে যেতাম তখনই। সে কথা পরে শুনলাম।

পরে শুনলে?

: শুধুই তাঁর কথা? পরে আরো অনেক বড় খবর শুনেছি।

: বড় খবর? কি বড় খবর?

সে কথা এখন থাক, পরে বলবো। এখন বলো তো ঐ দিনের আগে থেকেই কি কাসিদ সাহেবের সাথে তোমার পরিচয় ছিল?

আরে না না। সেদিনের আগে তাঁকে আমি চিনতামই না। সেইদিন তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়।

সেকি! ঐ একদিনের পরিচয়েই উনি তোমাকে তাঁর বাড়িতে পার করে নিলেন? মানে, তোমাকে খুব বিশ্বাসী লোক ভাবলেন?

বলতে পারো, অনেকটা তা-ই। তবে ঐ দিনের পরে আরো একবার তাঁর সাথে কথা হয়েছিল আমার। তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম।

আচ্ছা আচ্ছা।

দেখলাম, তাঁর ঐ বিরাট বাড়িতে তিনি একা থাকেন। তাঁকে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেয়ারও কেউ নেই।

তাই নাকি?

সেইজন্যেই তো তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার বাড়িতে চলে এলাম। আমি শুধু একা নই, আমার কাজের ঝিটাকেও সাথে নিয়ে চলে এসেছি।

সাবাশ সাবাশ। তা মাস মাহিনা কত হজরত আলী ভাই! মানে, তোমাদের দুইজনকে উনি মাসে কত দেন?

আরে বাবা! সেকি! উনি মাইনে দেবেন কেন? আমাদের কি চাকরি করার জন্যে উনার বাড়িতে উনি পার করে নিয়েছেন নাকি? না, চাকরি করার কোন প্রয়োজন আছে আমার?

তবে?

ওখানে চিরদিন রাখার জন্যে পার করে নিয়েছেন। উনার সংসারের সব ভার

আমাদের উপর দেয়ার জন্যে।

: সংসারের সব ভার?

সব সব। এখন ঐ বাড়ির অনেকটা আমরাই মালিক। টাকা পয়সাসহ সব কিছু আমাদের হাওলায় ফেলে দিয়ে নিরিবিলিতে বসে বসে শুধু বই-পুস্তক পড়েন। সংসারের কোন সাতপাঁচে আসেন না বা থাকেন না।

মারহাবা মারহাবা। এ না হলে কপাল! তোমরাও এখন তাহলে রাজার হালে আছো– না কি বলো?

রাজার হালে না হলেও, বেশ সুখেই আছি মেহের মিয়া। বড় আরামেই আছি।

আলহামদুলিল্লাহ! থাকো হজরত আলী ভাই, সুখে থাকো তোমরা। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সুখে শান্তিতে রাখুক।

একটু থেমে হজরত আলী প্রশ্ন করলো– তা কি জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন? এই জন্যে?

জবাবে মেহের আলী জোর গলায় বললো– শুধু এই জন্যে হলেও কি এটা কোন ছোটখাটো ব্যাপার? তোমার এমন একটা সুখবর, মানে তোমার নসীবের এমন একটা শানদার ব্যাপার জানার কি কোন আগ্রহ হবে না আমার? তুমি আমাকে এতটাই পর ভাবো হজরত আলী ভাই?

না না, তা ভাবিনে, তা ভাবিনে। এমনি বলছি। তা ভাবী কোথায়? তার তো কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে?

আছে আছে, ঘরেই আছে। দুয়ারের ওপারে বসে শুনছে সব কথা। কথা তো শুধু এই একখানা নয়, আরো অনেক কথা আছে।

: তাই নাকি?

এবার দুয়ারের ওপার থেকে মেহের আলীর বউ বললো– হ্যাঁ ছোট মিয়া। আরো অনেক কথা আছে। সেদিন যে ডুবে যাওয়া মেয়েটার জন্যে আমার শাড়ী জামা নিয়ে গিয়েছিলে, সেই মেয়েটাকে আর একবার কিন্তু এখানে আনতে হবে ছোট মিয়া। যেভাবেই হোক, আর একবার তাকে নিয়ে এসো তুমি এখানে।

হজরত আলী সবিস্ময়ে বললো– কেন কেন?

আমি তাকে দেখবো। প্রাণভরে দেখবো। সেদিন কি আর জানি যে, সে

মেয়ে এমন একজন বিশ্বসেরা মেয়ে? এমন একজন হুরী পরী?

আবার কথা বললো মেহের আলী। সে বললো– ও মেয়েটা ছিল নাকি মানিকচক বাজারের বিখ্যাত আলেম, মানে সর্বজন শ্রদ্ধেয় লোক আহমদুল্লাহ খান সাহেবের নাতনি?

হজরত আলী বললো– হ্যাঁ, উনি তারই নাতনি।

কি বদনসীব, কি বদনসীব। একবারও তা যদি জানতে পারতাম সেদিন, তাহলে ছুটে যেতাম ঐ মেয়েটাকে এক নজর দেখতে।

দেখতে?

মেহের আলীর বউ বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে ছোট মিয়া, দেখতে। আমিও ছুটে যেতাম দেখতে। হুরী পরীর মতো ঐ রূপ দেখে দুই নয়ন সার্থক করতাম।

: বলো কি ভাবী!

শুনেছি ছোট মিয়া, তোমার ঐ গাঁয়ের লোকটাই বলে গেছে, ও মেয়েটা নাকি দেখতে একদম বেহেশতের হুরী।

মেহের আলী বললো– শুধু তাই নয়, মানিকজোড় দেখতে যেতাম মেহের আলী ভাই, আমরা মানিকজোড় দেখতে যেতাম।

হজরত আলী ফের সবিস্ময়ে বললো– মানিকজোড়! তার মানে?

: মণির সাথে কাঞ্চনের যোগ। মানিকচক বাজারের সেরা জুটি।

অর্থাৎ?

তোমার ঐ ভাইজানের মতো হুরের সাথে এই হুরীর শাদি হলে কি এ জুটি সেরা জুটি হবে না?

মেহের মিয়া!

শুনেছি হজরত আলী ভাই, তোমার গাঁয়ের ঐ লোকটাই বলে গেছে। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে তার তাড়াহুড়া থাকলেও, ওরই মধ্যে সে বলে গেছে– এই হুর হুরী দুইজনের নাকি সত্বর শাদি হবে।

এবার গম্ভীর হলো হজরত আলী। বললো– সত্বর শাদি হবে?

হ্যাঁ.হ্যাঁ, সত্বর। শিগগিরই শাদি হবে।

হুঁউঁ!

: হবে না? তুমি শুনোনি? তোমার তো আগে শোনার কথা?

কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর হজরত আলী বললো– শুনেছি।

: তবে? খান সাহেব তো শিগগিরই শাদি দেবেন এদের দুইজনের। ধরা বাঁধা কথা।

: কিন্তু সে কথা থাকছে না।

চমকে উঠে মেহের আলী বললো– থাকছে না মানে?

হজরত আলী বললো– আজরাইল যদি দয়া করে খান সাহেবকে সত্যি সত্যি ছেড়ে দেন, তবেই হতে পারে এ শাদি। তা না হলে নয়।

: কি রকম, কি রকম?

কয়দিন আগে আজরাইল নিয়েই নিয়েছিলেন খান সাহেবের জানটা। কি যেন কি ভেবে সে জানটা ফেরত দিয়ে উনি শিয়রে বসে থেকে ভাবছেন। যদি উনি দয়া করে সত্যি সত্যিই জানটা ফেলে রেখে চলে যান, তবেই সে আশা করা যায়। মানে, ঐ শাদির আশা।

হজরত আলী ভাই?

খান সাহেবের সংকট এখনো কাটেনি। অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে এলেও তিনি এখনো ভীষণ অসুস্থ।

তা হলে হেকিম ডেকে আনছেন না কেন? শহর থেকে বড় হেকিম ডেকে আনলে তো অনেকটা ভরসা থাকে।

: কিন্তু শহরে যাবে কে?

কাসিদ সাহেব করছেন কি? তাঁর তো অনেক চেনাজানা। উনি সদর থেকে একজন নামকরা হেকিম ডেকে আনবেন।

: বিপদ যখন আসে, তখন এক সাথে আসে মেহের মিয়া।

: মানে?

www.boighar.com

সে ভাইজানও নিখোঁজ। কাসিদ সাহেব ভাইজান সীমান্তে না কোথায় গেছেন, তার কোন খোঁজ নেই। কবে আসবেন, নাকি উনিও কোন বিপদে পড়লেন, কে জানে!

: হজরত আলী ভাই!

www.boighar.com

: শহরে যাওয়ার মতো কোন পুরুষ মানুষ তো খান সাহেবের পরিবারে নেই।

একজন বাজার সরকার আছে। কিন্তু সেও তো বড় হেকিম চেনে না। আমিও চিনি না।

: কি মুসিবত, কি মুসিবত!

: সব এখন আল্লাহ ভরসা। আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কারো কিছু করার নেই।

মেহের আলীর বউ ব্যস্তকণ্ঠে বললো– যাবো, আমরা যাবো। আমি আর আমার এই বাড়ির মানুষ– আমরা দুইজনই যাবো। তুমিও যাবে আমাদের সাথে। তোমাকে তো যেতেই হবে ছোট মিয়া।

হজরত আলী বললো– যাবো মানে? কোথায় যাবো?

মেহের আলীর বউ বললো– ঐ খান সাহেবের বাড়িতে। আল্লাহর দয়া ছাড়া কিছুই হবে না জানি। কিন্তু সেরেফ সেই আশাতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি আল্লাহ আপছে আপ দয়া করবেন? সেই দয়া পাওয়ার জন্যে কি কারো কিছুই করতে হবে না?

: ভাবী!

ঐ যে কথা আছে 'হরি হে পার করো, হরি বলে– তুমিও হাত-পা নাড়ো'। এ কথা কি শুনোনি ছোট মিয়া?

: তুমি কি বলতে চাইছো ভাবী?

বলছি, আমাদেরও হাত-পা নাড়তে হবে। তোমার এই ভাই আর তুমি শহরে যাবে বড় হেকিম আনতে। আমি একদিকে শুশ্রূষা করবো রুগীর আর অন্যদিকে সান্ত্বনা দেবো রুগীর মেয়েটাকে। আহা! কেঁদেই বুঝি সারা হচ্ছে মেয়েটা। উঠো– উঠো, চলো...

হজরত আলী তবুও ইতস্তত করে বললো– কিন্তু...

মেহের আলীর বউ বললো– কিন্তু কি?

কিন্তু মানে, তুমি রুগীর সেবা করলে তা হয়তো কিছুটা কাজে লাগবে ভাবী। কিন্তু আমরা করবো কি?

তোমরা শহরে যাবে হেকিম আনতে। কোন নামকরা বড় হেকিম।

: আমরা কি সেটা চিনি?

এটা কি কোন কথা হলো?

মানে?

চেনা লাগবে কেন? সবাই কি সব কিছু আগে থেকেই চিনে রাখে? জিজ্ঞাসা করতে করতে লোকে নাকি মক্কা মদীনা যেতে পারে, আর তোমরা একজন হেকিম চিনে নিতে পারবে না?

: তা মানে–

: আবার মানে কি? পয়সা কড়ি?

: না, তা নয়। পয়সা কড়ি আমার হাতেই অনেক আছে। তবে...

: তবু তবে তবে করো না তো। চলো একবার যাই সেখানে...

হজরত আলী ঢোক চিপে বললো– বলছো যখন, চলো যাই। অন্তত একনজর দেখে আসি রুগীর বর্তমান অবস্থাটা। কিন্তু...

ফের কিন্তু!

আমরা গিয়ে খামাখা ভিড় জমালে তাঁরা আবার কি মনে করেন, কে জানে। বলছো যখন, চলো...

উঠে দাঁড়ালো তারা তিনজন।

হজরত আলী যে দ্বিধা-দুশ্চিন্তা নিয়ে খান সাহেবের বাড়িতে এলো, এসে দেখলো, তার সে দ্বিধা-দুশ্চিন্তা অমূলক। তার প্রথম দুশ্চিন্তাটা হলো, খান সাহেবের জানের সংকট নিয়ে। দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা হলো– খান সাহেবের এই কঠিন অসুখের সময় সেখানে তাদের ভিড় জমানোটা খান সাহেবের বাড়ির লোকদের সহজভাবে গ্রহণ নিয়ে।

তার প্রথম দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা হলো– সে জানে, খান সাহেবের সংকট এখনো কাটেনি। আজরাইল তাঁর জানটা নিয়ে নেয়ার পর সেটা আবার ফেরত দিলেও, আজরাঈল সেখান থেকে চলে যাননি। খান সাহেবের শিয়রে বসে থেকে ভাবছেন। শেষ অবধি আজরাইল খান সাহেবের জানটা সত্যি সত্যি ফেলে রেখে চলে যাবেন কি না কিংবা ইতিমধ্যে তা গেছেন কিনা এ ব্যাপারে হজরত আলী অন্ধকারে আছে।

কিন্তু এসে দেখলো, তার সে সংশয় কেটে গেছে। আজরাইল আপাতত খান সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন আর খান সাহেব বসে আছেন বিছানায়।

দ্বিতীয় দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা হলো ঐটাই। রুগীর এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে বাইরের লোকজন এসে ভিড় জমানো কতটা সঙ্গত আর লায়লা বানু, আজম

শেখ ও মরিয়ম বিবি এতে কি মনে করবেন– এই ব্যাপারে চিন্তিত ছিল হজরত আলী। কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্রই কেটে গেলে সে দুশ্চিন্তা তার। তাকে দেখামাত্রই লায়লা বানু আর মরিয়ম খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে একসাথে বলে উঠলো– আরে এই যে হজরত আলী, তুমি এসেছো? বড়ই খোশ, বড়ই খোশ। আমরা জানতাম, এমন একটা দুঃসংবাদ পাওয়ার পর তুমি না এসে পারোই না।

লায়লা বানু প্রশ্ন করলো– দাদুর এই অসুখের কথা আজকেই প্রথম তুমি শুনলে, না আগেই শুনতে পেয়েছিলে?

হজরত আলী বললো– পেয়েছিলাম আপামণি, আগেই শুনতে পেয়েছিলাম।

লায়লা বানু বিস্মিতকণ্ঠে বললো– কি তাজ্জব! আগে শুনতে পেয়েও তুমি দাদুকে দেখতে আসোনি তৎক্ষণাৎ?

এসেছিলাম আপামণি। যখন শুনতে পেলাম তখনই এসেছিলাম।

: কিন্তু কৈ? আমরা তো তোমাকে দেখিনি?

দেখতে পাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না আপামণি। আমি তো অন্দরে যাইনি। বাইরে থেকেই সব জেনেছি আর জানার পর বাইরে থেকেই আমার চলে যেতে হয়েছে।

: তাই কি, তুমি কি জেনে গেছো?

: সব সব, আগাগোড়া সব ঘটনা।

: যথা?

শুনলাম, রাত জেগে জেগে পড়াশুনা করার ফলে তিন দিন তিন রাত ঘুম আসেনি তাঁর চোখে। এতে করে তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিকারগ্রস্ত হয়েছিলেন। হেকিম এসে দাওয়াই দেয়ার পর মাথায় পানি বাতাস দেয়ায়, তিনি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যান। হেকিম সাহেবের নির্দেশ মতো তিনি গোটা দিন আর গোটা রাত ঘুমিয়ে থাকেন। তাতে করেই তাঁর মাথা থেকে রক্ত নেমে যায় আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। শুনেছি, তাঁর সেই ঘুমের সময় তাঁকে জাগানো সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল।

: তুমি কি দাদুর সেই গোটা দিন গোটা রাত ঘুমিয়ে থাকার সময় এসেছিলে?

না আপামণি, সে সময় নয়। আমি যখন শুনতে পেলাম আর শুনতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম, তখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসার দুইদিন পার

হয়ে গেছে। আমি বসে আগের ঐ ঘটনাটা অন্যের কাছে শুনলাম।

তাহলে?

আমি এসে শুনলাম, হেকিম সাহেবের পরবর্তী দাওয়াই খেয়ে উনি আবার ঘুমিয়ে গেছেন। সে ঘুমটা ভাঙ্গানোও নিষেধ ছিল শুনে আমি আর অন্দরে যাইনি। আর তাঁর সংকট কিছুটা কেটে গেছে বুঝলাম আর সেটা বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাদের বৈঠকখানা থেকে ফিরে এলাম।

: আচ্ছা!

পরে, আসবো আসাবো করতে করতে একটু দেরী হয়ে গেল। আজ এ প্রসঙ্গ উঠতেই ছুটে এলাম আমরা।

খুব ভাল, খুব ভাল। তা তোমরা মানে, ইনারা কারা? এই মহিলা আর এই ভদ্রলোক?

এই ভদ্রলোকের নাম মেহের আলী। এ আমার খেয়াঘাটের ওপারের জমিগুলোর বর্গাদার। এই মহিলা আমার এই মেহের আলী ভাইয়ের স্ত্রী।

: তাই? বেশ বেশ।

সেবার ঐ নৌকাডুবির পরে আপনাদের যে শুকনো জামা কাপড় এনে দিয়েছিলাম, সেগুলো এই ভাবীরই আর এই মেহের আলী ভাইয়েরই জামাকাপড়। এদের থেকেই এনেছিলাম।

উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠে লায়লা বানু বললো– সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! ইনারাই সেই লোক? ইনারাই আমাদের সেই দুঃসময়ের বান্ধব? আসুন ভাই সাহেব, আসুন ভাবী সাহেবা, আসুন আসুন। এই আসনটায় বসুন!

লায়লা বানু এদের দুইজনকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশস্ত বারান্দায় এক আসনে বসালো আর হজরত আলীকে বললো– তুমি ঐখানে বসো হজরত আলী ভাই, ঐ দিকেই এ আসনে বসো।

হজরত আলী বলেলো– এদের আর একটা পরিচয় আছে আপামণি। আমার জমির বর্গাদার হিসাবে এদের আমি কখনো দেখিনি। আর এরাও আমাকে জমিওয়ালা হিসাবে কখনও দেখে না। আমি এদের নিজের ভাই ভাবীই মনে করি আর এরাও আমাকে আপন ভাই-ই মনে করে।

: মারহাবা, মারহাবা! বড়ই খুশীর কথা তো!

আজ এখানে আসার পিছনে এই ভাবীরই তাকিদ ছিল বেশি। শুধু বেশিই নয়, দুর্বার। ভাবীর জিদ ছিল– সে এসে আপনার অসুস্থ দাদুর সেবাশুশ্রূষা করবে আর আপনাকে দুঃখ বেদনায় সান্ত্বনা দেবে। আমাদের উপর হুকুম ছিল– শহরে গিয়ে বড় হেকিম আনার।

কি মেহেরবানী– কি মেহেরবানী! অজানা অচেনার জন্যে এমন দরদ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

কিন্তু এখন যা দেখেছি, তাতে বোধ হয় আর অন্য হেকিমের প্রয়োজন নেই।

রুগী আহমদুল্লাহ খান সাহেব বারান্দায় অপর পাশে খোলা হাওয়ায় বিছানার উপর বসেছিলেন। হজরত আলীকে উদ্দেশ্য করে এবার তিনি বললেন– নারে ভাই, আর দরকার নেই। আল্লাহর রহমে আমি এখন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছি। এই হেকিমেই চলবে এখন।

হজরত আলী বললো– চললেই ভাল হুজুর। আপনি তো এখনো খুবই দুর্বল। হেকিম ছাড়া করলে আপনার চলবে না।

চলবে না তা জানি। তবে কথা কি, এ বয়সে হেকিম বেটে খেলেও আমি আর বড় বেশি সবল হয়ে উঠবো না। আশি বছর বয়সই অনেক বেশি বয়স মানুষের। আমার নব্বই পার হয়ে গেছে। আর কত? আরো বেশি বেঁচে থাকা মানেই, নিজের আর অপরের অশেষ দুর্ভোগ বাড়ানো।

: হুজুর!

: আমার কাছে এসে বসো, কথা বলি...

হজরত আলী খান সাহেবের বিছানার এক প্রান্তে এসে বসলো। খান সাহেব বললেন– এখন তো লাঠি ধরে দু'এক পা চলাফেরা করতে পারি। যখন তাও পারবো না তখনকার কথাটা একবার ভাবো তো নওজোয়ান? আমাকে তখন ধরে উঠাতে হবে, ধরে বসাতে হবে, আহার-গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা সব ধরে ধরে করাতে হবে। এ জীবন কি চিন্তা করা যায়? যত শিগগির এখন এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি, ততই আমার মঙ্গল।

হজরত আলী বললো– তা কথা হলো, আপনি যেতে চাইলেই কি আপনার প্রিয়জনেরা তা চাইবেন হুজুর? তাঁদের দিলে যে সেটা বড়ই বাজবে।

বাজুক। তবু যে যত শিগগির এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে পারবে সে

ততই লাভবান হবে নওজোয়ান। এ দুনিয়ার মোহ বড়ই অনিষ্টকর জিনিস। আমি যে অনেক অনেক আগে এ মোহ ছিন্ন করতে পারিনি, এইটেই আমার দুর্ভাগ্য। চরম বদনসীব!

: হুজুর!

এই দুনিয়াটা একটা সরাইখানা, বুঝলে? যে যত বেশি দিন এই সরাইখানায় থাকবে, তাকে তত বেশি দাম, মানে ভাড়া দিতে হবে। যে যত কম সময় থাকবে, তাকে তত কম দাম দিতে হবে।

: বুঝলাম না হুজুর। দাম মানে?

দাম মানে মূল্য। গুনাহর মূল্য। যত বেশি দিন এ দুনিয়ায় থাকবে, গুনাহর বোঝা ততই বেশি ভারী হবে।

: কিন্তু নেকীও তো হবে হুজুর। নেক কাজ করলে তো...

কুলোবে না, কুলোবে না। এ দুনিয়াটা হচ্ছে একটা গুনাহর সাগর। এ সাগরে ডুবে থেকে বেশি নেক কাজ করতে পারে ক'জন? সে কিসমত ক'জনের হয়? অধিকাংশের নেকীর চেয়ে বদীর বোঝা এত বেশি ভারী হয়ে যায় যে, পরকালে সে বোঝা আর টানতে পারে না। জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে হয়।

: হুজুর!

থাক থাক, এ সব তত্ত্ব কথা আর নয়। এবার আমায় বলো তো, তোমার ভাইজানের খবর কি? কাসিদ আহসান উল্লাহর খবরটা বলো তো? বেশ কিছুদিন থেকেই যে তাঁর কোন খোঁজখবর পাচ্ছি নে?

আমরাও পাচ্ছিনে হুজুর। অনেকদিন যাবত তাঁর খবর আমরাও আর জানিনে।

জানো না কি রকম? তোমরা বাড়ির লোক। তিনি বাড়ি থেকে কোথায় গেলেন, কি কাজে গেলেন, সে সব খবর কিছুই তোমরা জানবে না?

জানি হুজুর। তিনি সীমান্তে গেছেন, এইটুকুই শুধু বলে গেছেন। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর ফেরার নামটিও নেই। কোন বিপদ মুসিবতে পড়লেন কিনা, আল্লাহ মালুম।

অসম্ভব কি? যে বিপদ মুসিবতের মধ্যে পড়ে আছি আমরা এখন, তাতে আমাদের পদে পদে বিপদ। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন, এই কামনাই

করি।

: হুজুর!

তার শিগগির শিগগির ফিরে আসাটা এখন একান্তই জরুরী। দিন আমার শেষ হয়ে আসছে। যত দাওয়ায়-ই খাই, দাওয়াই আর আমাকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে না। অথচ আমার মস্ত বড় কাজটা এখনো আমার সম্পন্ন করা বাকী।

: মস্ত বড় কাজ! কি কাজ হুজুর?

আমার লায়লা বানুর হিল্লেটা করা হয়নি এখনও। কাসিদ সাহেব আর লায়লা বানুর দুইজনের দুই হাত এক করে দিতে পারলে তবেই তো নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমি। নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজতে পারতাম। আজ না কাল করে করে এদের শাদিটা দেয়া আজও বাকী রয়ে গেল।

লায়লা বানুসহ উপস্থিত সকলেই এই দুইজনের কথাবার্তা শুনছিল। এবার লায়লা বানু শরম পেয়ে বলে উঠলো– আহ দাদু! এ আবার কোন ঢেউ তুললেন? থামুন তো! এখন থামুন। এই শরীর নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আপনি এতক্ষণ। আর নয়। এবার বিশ্রাম নিন।

খান সাহেব উদাস কণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ! বিশ্রাম?

লায়লা বানু বললো– হ্যাঁ, বিশ্রাম নিন। আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন। ঘুমিয়ে পড়ুন এখন। ঘুমিয়ে পড়ারও সময় হয়ে গেছে আপনার।

লায়লা বানু এবার হজরত আলীকে বললো– হজরত আলী, তুমি এবার উঠে এসো ওখান থেকে। আমি দাদুকে দাওয়াই খাইয়ে দিই।

হজরত আলী উঠে এলো। ওষুধপত্র সহকারে লায়লা বানু খান সাহেবের পাশে এসে বসলো।

৫

এ্যান্টেনাস এ্যান্ট– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। তা কি খবর ক্রেজী ক্যাডার হুজুর? ঐ জিহাদীটাকে মানে কাসিদটাকে কি ধরা হয়েছে?

ডগলাস সাহেবের মুন্সী ক্রেজী ক্যাডার ওরফে কাজী কাদেরের কাছে এসে ফ্যাটিগ চেন (ফটিক চান) ফটকে অতি আগ্রহে প্রশ্ন করলো। প্রশ্ন শুনে মুন্সী কাজী কাদের বললো– তুমি কার কথা বলছো? কাসিদ আহসান উল্লাহর কথা?

ফটিগ চান ফটকে বললো– আরে হ্যাঁ ক্রেজী ক্যাডার হুজুর! ঐ কাসিদ, ঐ কাসিদটার কথাই বলছি।

ও আচ্ছা। তা তাকে ধরা হবে কেন?

আকাশ থেকে পড়লো ফটিক চান ফটকে। বললো– কেন মানে? তাকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে হবে না? না ধরলে, মানে গ্রেপ্তার না করলে, তাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবেন কি করে? ও যদি লাপাত্তা হয়ে যায়?

কাজী কাদের বললো– দ্বীপান্তরে পাঠাবো মানে? কে দ্বীপান্তরে পাঠাবে?

কেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় ডগলাস স্যার। প্রাণপ্রিয় স্যার কি সে হুকুম দেন নি?

: না, দেন নি।

সে কি! এতবড় অপরাধেও দ্বীপান্তর হলো না? তাহলে কি যাবজ্জীবন জেলের না ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন? তা দিলেও তো ধরতে হবে ব্যাটাকে।

: না, ওসব কোন আদেশই দেননি।

: কি তাজ্জব, কি তাজ্জব! কোন আদেশই দিলেন না?

: বলছি তো, দেননি।

কেন, কেন? তা দিলেন না কেন?

বইঘর ও রোকন

কাসিদ আহসান উল্লাহর কোন দোষ পাওয়া যায়নি, তাই।

এ্যান্টেনাস এ্যান্ট! দোষ পাওয়া যায়নি মানে?

মানে, ও.সি. বাদল সরকার তদন্ত করে তার কোন দোষ পায়নি।

বাদল সরকার। ও, ও.সি. ব্লাড সাকার?

হ্যাঁ, ঐ ব্লাড সাকার।

সে কোন দোষ পায়নি?

: বলছিই তো, পায়নি।

: ঘুষ খেয়েছে। ঐ ব্লাড সাকার নির্ঘাত ঘুষ খেয়েছে।

: ঘুষ খেয়েছে?

হাজার বার খেয়েছে। ঘুষ না খেলে এমন একটা কাসিদের কোন দোষ নেই– এ কথা বলে কি করে? আমি শুনেছি, জিহাদ আন্দোলনের মূল ডেরা ঐ সীমান্তে সে টাকা পয়সা, মুজাহিদ আর আমাদের স্যারদের চলাফেরার গুরুত্বপূর্ণ খবর অবিরাম পাঠায়।

: হ্যাঁ, সে খবরও ঠিক। তবে এখন নয়, আগে পাঠাতো।

আগে পাঠাতো? এখন পাঠায় না?

: না, জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই।

কোনো সম্পর্ক নেই মানে?

আরে, এত মানে মানে করছো কেন? ও.সি. বাদল সরকার জানিয়েছে– ওদের ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার ফলে মরে গেছে জিহাদ আন্দোলন। আর তাই, জিহাদ আন্দোলনের সাথে কাসিদ আহসান উল্লাহর সকল সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে। তাকে নিয়ে চিন্তা করার আর ভীত হওয়ার কিছুই নেই।

মিথ্যা মিথ্যা। সেবার খেয়াপারের নায়ের উপর ঐ কাসিদ আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে আর যে সব কথা বলেছে, তাতে আমি নিশ্চিত, জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার এখনো সম্পর্ক আছে। সে তেজের সাথে বলে, আমাদের ইংলিশ স্যারেরা নাকি বিদেশী কুকুর; আর এই দেশের কালা নেটিভরা নাকি দেবতা। মহাপুরুষ।

তা আমি জানিনে। বাদল সরকার যা বলেছে, তাই বললাম। সেটা তোমার

বিশ্বাস না হলে তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। দেখতে পারো, জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার এখনো যোগাযোগ আছে কিনা!

অবশ্যই দেখবো। একশো বার দেখবো। হাজার বার দেখবো। আমি জানি, জিহাদের সাথে এখনো তার যোগাযোগ আছেই আছে।

তো যাও, তাই দেখো গে...

ওঠে গেলেন কাজী কাদের। তার দপ্তর থেকে বেরিয়ে মানিকচক বাজারে ফিরে এলো ফটকে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করতে করতে সে এসে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়ালো। বাড়ি দেখেই ফটকের দুই চোখ ছানাবড়া। ভাবতে লাগলো, কি সাংঘাতিক! এত বড় বাড়ি এই কাসিদের? এ তো একদম নবাব বাদশাহ মানুষ! এ লোক শুধুই জিহাদী নয়, জিহাদ আন্দোলনের নেতা। এ লোকের দ্বীপান্তর হবে না তো হবে কার?

ফটকের আরো কাছে এসে ফটিক চান ফটকে উচ্চকণ্ঠে বললো– এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। কে আছে? এখানে কে আছে?

ফটিক চান ফটকের চিৎকার শুনে গেটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আয়েজ উদ্দিন ও ময়েজ উদ্দিন। আয়েজ উদ্দিন এগিয়ে এসে ফটককে প্রশ্ন করলো– কে? কে তুমি?

www.boighar.com

ফটকে বললো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। আমি একজন ইংলিশম্যান, মানে ইংলিশম্যানের লোক। তোমরা কে?

www.boighar.com

: আমরা এই বাড়ির পাহারাদার।

ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। কি সাংঘাতিক পাহারাদার? তাহলে তো তোমরা জিহাদী। পাহারা দেয়া জিহাদী। বড় বড় জিহাদীদের পাহারা দাও তোমরা।

: তার মানে, কি বলছো পাগলের মতো?

পাগল! নট নট। টিকটিকি। আমি একজন তুখোড় টিকটিকি। ইংলিশ সাহেবদের তুখোড় গোয়েন্দা।

একটু ঘাবড়ে গেল আয়েজ উদ্দিন । ঢোক চিপে বললো– গোয়েন্দা? তা তুমি, মানে আপনি এখানে কেন?

ফটকে বললো– দরকার আছে, দরকার আছে। কোথায়? সেই মারকুটে জিহাদীটা কোথায়? তোমাদের নেতা?

: আমাদের নেতা, কি বলছেন আপনি?

বলছি, ডাকো। তোমাদের সর্দারকে ডাকো। জলদি।

: জলদি মানে? কে আমাদের সর্দার? কাকে ডাকবো?

ফটকে চিৎকার করে বললো– খুন করবো! কাঁকে তা বুঝতে পারছো না! খুন করবো। খোলো। ফটক খোলো–

ফটকে গেটে এসে গেটের কপাটে সজোরে আঘাত করতে লাগলো। শুনতে পেয়ে ছুটে এলো হজরত আলী। গেটের কাছে এসে ফটককে দেখেই হজরত আলী সশব্দে বলে উঠলো– আরে-আরে, একি! ফ্যাটিগ চেন নয়? ডগলাস সাহেবের, মানে ক্রেজী ক্যাডারের সেই ফ্যাটিগ চেন?

ফটকেও সপুলকে বলে উঠলো– হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেই ফটিক চেন। তুমি সেই শিষ্য নও, গুরুর শিষ্য?

হজরত আলী বললো– হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই সেই শিষ্য। তোমার ভাষায় শিষ্য। নইলে আমি কোন শিষ্য-সাগরিদ নই। আমি ভাইজানের কাজের লোক। আমি তাঁর বাড়িতে কাজ করি।

এই বাড়িতে!

: হ্যাঁ, এই বাড়িতে। তো তুমি এখানে? কি চাও?

তোমার ভাইজানকে?

কেন? তাঁকে ধরতে?

ফটকে এবার কায়দা করে বললো– না না, তা নয়। তার সাথে আমার কথা আছে। অনেকদিন দেখা নেই, একটু কথা বলবো তার সাথে। ধরতে এলে কি একা একা এইভাবে আসি!

তাহলে পরে এসো।

কেন, পরে কেন?

ভাইজান এখন এখানে নেই। এ তল্লাটেই নেই।

নেই? কোথায় গেছেন?

হজরত আলী জোশের সাথে বলে ফেললো– সীমান্তে সীমান্তে। সাতশো ক্রোশ দূরে।

সচকিত হয়ে উঠে ফটকে বললো– এ্যাঁ? সীমান্তে?

হ্যাঁ হ্যাঁ সীমান্তে। এই ভারতবর্ষের ঐ মাথায়।

: তুমি ঠিক জানো?

ঠিক জানি মানে? আমি এই বাড়িতে থাকি। আমাকে বলে এই বাড়ি থেকে রওনা দিলেন। আমি ঠিক জানবো না মানে?

ফটকে মহানন্দে বলে উঠলো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট- ট্যান্টেনাস ট্যান্ট।

–বলেই সে তৎক্ষণাৎ গেট থেকে উল্টো দিক দৌড়াতে শুরু করলো। তা দেখে হজরত আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো– আরে আরে, যাও ক্যানো? এভাবে দৌড়াচ্ছো কেন?

ফটককে আর পায় কে? তার ডাকে সাড়া না দিয়ে ফটকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের গেট থেকে একটানা ছুটে ফটিক চান ফটকে সরাসরি চলে এলো তের নম্বর পুলিশ ষ্টেশানের ও.সি. ব্লাড সাকার ওরফে বাদল সরকারের কাছে। এসেই সে বাদল সরকারকে আক্রমণ করে বললো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। আপনি মিথ্যা খবর দিলেন কেন?

বাদল সরকার টিকটিকি ফটকের নাম শুনেছে। শুনেছে সে একটা হস্তী মূর্খ। কিন্তু তাকে ঠিক মতো চেনে না। তাই বাদল সরকার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– হোয়াট? কাকে মিথ্যা খবর দিয়েছি?

ফটকে বললো– আমার প্রিয় স্যার ডগলাস সাহেবের মুন্সী ক্রেজী ক্যাডারকে। ক্রেজী ক্যাডারকে মিথ্যা খবর দিয়েছেন।

: ইউ শাট আপ। কে তুমি?

আমি ডগলাস সারের প্রিয় লোক ফ্যাটিগ চেন। স্যারের তুখোড় গোয়েন্দা ফ্যাটিগ চেন।

এবার নরম হলো বাদল সরকার। বললো– ও তুমি সেই ফ্যাটিগ চেন? বেশ বেশ বসো। ঐ আসনে বসো।

ফ্যাটিগ চেন ফটকে আসনে বসলে বাদল সরকার ফের প্রশ্ন করলো– কি মিথ্যা খবর মুন্সী সাহেবকে দিয়েছি?

ফটকে বললো– আপনি তাকে বলেছেন, কাসিদ আহসান উল্লাহর আর কোন সম্পর্ক নেই জিহাদ আন্দোলনের সাথে। সকল সম্পর্ক তার শেষ হয়ে গেছে।

: হ্যাঁ, তাইতো গেছে!

ফের গরম হলো ফটকে। গরম কণ্ঠে বললো– মিথ্যা কথা! এ খবর আপনার মিথ্যা। জিহাদ আন্দোলনের সাথে এখনো তার পুরো সম্পর্ক আছে।

: আছে?

শুধু আছেই নয়। কাসিদ আহসান উল্লাহ এখন জিহাদ আন্দোলনের মূল ঘাঁটি ঐ সীমান্তে।

: সীমান্তে?

: হ্যাঁ, সীমান্তে। এখন সেখানে গেলেই সেটা জানা যাবে।

: তুমি দেখেছো?

: না, শুনেছি।

কার মুখে শুনেছো? কাসিদ আহসান উল্লাহ যে এখন সীমান্তে এ কথা কার মুখে শুনেছো?

তার বাড়ির লোকের মুখে। তার একান্ত আপন লোকের মুখে। সে বাড়িতে গিয়ে আমি শুনে এসেছি। আপনি এ্যাকশান নিন।

এ্যাকশান!

হ্যাঁ, এই মানিকচকে ফিরে আসার সাথে সাথে আপনি তার বিরুদ্ধে এ্যাকশান নেবেন, বুঝেছেন?

না, বুঝলাম না।

মানে?

কোন শুনা কথার উপর আমি এ্যাকশান নিতে পারি না। জিহাদ আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই– একথা নিজে আমি জানি যখন...

কথা শেষ করতে না দিয়ে ফটকে বললো– আমি নিজে জানি, সে এখন জিহাদ আন্দোলনের ঘাঁটিতে গিয়ে বসে আছে।

ফের সে কথা! তুমি দেখেছো? তুমি নাকি নিজের চোখে তা দেখোনি?

: না দেখলেও, গেলেই দেখা যাবে।

তাহলে যাও, সেখানে গিয়ে দেখে এসো। দেখে এসে যদি বলো, ঘটনা ঠিক, তুমি তাকে সেখানে দেখেছো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশান নেবো আমি। সে এই মানিকচকে ফিরে এলেই তার পেছনে ছুটবো। আগে যাও, সেখানে গিয়ে দেখে এসো–

: আমি যাবো!

তো কে যাবে? তুমি বলছো সে সেখানে আছে। সেটা তুমি গিয়ে দেখে না এলে কি আমি যাবো? আমি কি বলছি, সে সেখানে আছে এখন?

কিন্তু সেখানে গেলে যদি তাকে দেখতে না পাই? সে যদি তখন সেখানে উপস্থিত না থাকে?

না থাকলে জেনে আসতে পারবে তো সে সেখানে গিয়েছিল কিনা! তুমি যদি সঠিকভাবে সেটা জেনে আসতে পারো তাহলেই আমি এ্যাকশান নেবো তার বিরুদ্ধে। তোমার রিপোর্টই আমার কাছে যথেষ্ট।

ফটিগ চান ফটকে ইতস্তত করে বললো– কিন্তু সেটা আমি কিভাবে জেনে আসবো?

কিভাবে মানে? তুমি নাকি টিকটিকি। ডগলাস স্যারের তুখোড় গোয়েন্দা। কিভাবে জেনে আসবে, তাও জানো না?

: না– মানে, সে ডেরায় গেলে যদি আমাকে পাকড়াও করে?

তুমি গোয়েন্দা, সে পরিচয় দিলে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তুমি গিয়ে গোপনে দেখে আসবে। আর ঐ কাসিদ যদি সেখানে না থাকে, তাহলে যারা থাকবে তাদের বলবে– 'আমি তার নিজের লোক, তার বাড়ি থেকে এসেছি। অনেক দিন সে বাড়ি যায়নি। কোথায় গেছে তা আমরা জানিনে। এখানে এসেছিল কিনা, সেটা আমি জানতে এসেছি।'

: হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হতে পারে।

ওখানে গিয়ে থাকলে, ঐ লোকেরাই সে কথা বলবে।

: ঠিক ঠিক।

তো যাও। জলদি রওনা হও। ওখানে গিয়ে থাকলে গিয়েই দেখতে পাবে।

: ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। তাহলে যাই, এখনই।

যাও। কিন্তু গিয়ে যেন ঐ 'ঠাণ্ঠেনাস ঠ্যান্ট' করে উঠো না। যদি তাদের মনে হয়, তুমি ইংরেজি জানা ইংরেজদের লোক, তাহলে তোমাকে আর ঐ ডেরা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে না। এককালের বিপ্লবী লোক ওরা। তোমাকে ওখানেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে ফটিক চান ফটকে একদম মরিয়া। তাই, কোন কষ্ট পরিশ্রম গায়ে না মেখে তখনই সীমান্তে চলে এলো ফটকে। ডেরায় তখন তেমন লোকজন ছিল না। দু'চারজন যারা ছিল তারা সরাসরি কোন জিহাদী লোক নয়। ঐ আস্তানা দেখভাল করা লোক। ডেরার আসবাবপত্র আগলে রাখা লোক। আত্মপরিচয় গোপন রেখে ফটিক চান কাসিদ আহসান উল্লাহর খবর জানতে চাইলে তারা জানালো– কোন কাসিদ জিহাদীর নাম তারা জানে না। ও নামের কেউ এখানে এসেছিল কি না, সেটাও তারা জানে না।

ফটিক চান ফটকে অনুরোধ করে বললো– কে জানে, তা কি বলতে পারো তোমরা ভাই?

তারা বললো– যারা জানে তারা কেউ এখন এখানে নেই। মাঝে মধ্যে তারা এখানে এসে জড়ো হয়। সবাই তারা এককালের কাসিদ আর জিহাদী লোক।

ফটিক চান ফটকে বললো– সে লোকও একজন কাসিদ। বাংলাদেশ থেকে আসা কাসিদ। তাকে কি ভাই তোমরা কেউ দেখছো?

এদের একজন উৎসাহের সাথে বলে উঠলো– এ্যাঁ! বাংলাদেশী কাসিদ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। একজন বাংলাদেশী কাসিদকে আমি দেখেছি। তবে তার নাম আহসান উল্লাহ কি না, আমি জানিনে। অন্যান্য কাসিদ– জিহাদীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করার সময় শুনেছিলাম, ঐ কাসিদদের একজন বাংলাদেশী।

ফটকে বললো– হ্যাঁ? তাই কি? তা সে লোক এখন কোথায়?

বোধ হয় পাঞ্জাবে গেছে।

পাঞ্জাবে?

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই ঐ লোককে বলতে শুনেছিলাম, কি এক প্রয়োজনে সে পাঞ্জাবে যাবে। সরাসরি বাড়ি ফিরে যাবে না।

তা সে প্রয়োজনটা কি, তা শুনেছিলে?

না, তা শুনিনি। তবে শুনেছি পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের এক ইংরেজ সেক্রেটারী জিহাদীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের অতীতকালের অপরাধ খুঁজে খুঁজে বের করে যেখানে সেখানে মিথ্যা রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। কাসিদেরাও তো

জিহাদী লোক। তাই হয়তো ঐ কাসিদটা সে খবর জানতে গেছে সেখানে। নইলে, বাংলাদেশী কাসিদের কি প্রয়োজন থাকবে পাঞ্জাবে। সেখানে তো কোন কাসিদ বা জিহাদীর নামগন্ধও নেই।

আস্তানা দেখভাল করা সঙ্গীদের তাকিদে বক্তা লোকটি অন্যদিকে অন্য কাজে চলে গেল। ফটকে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করলো কিছুক্ষণ। ঐ বাংলাদেশী কাসিদটা মানিকচকের আহসান উল্লাহ কিনা, তা নিশ্চিতভাবে জানা তার প্রয়োজন। তাই ওখান থেকেই বাংলাদেশে ফিরে না গিয়ে ফটকে পাঞ্জাবের পথ ধরলো।

পাঞ্জাব শহরে এসে সে ঘণ্টা খানেক এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করলো। তারপরে ফটকের খেয়াল হলো– আহসান উল্লাহ এখানে এলে পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সদর দপ্তরেই এসেছে। দেখা গেলে ওখানেই তাকে দেখা যাবে।

এই চিন্তা করে ফ্যাটিগ চেন ফটকে সদর দপ্তরের একদম গেটে এসে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। 'পড়বি পড় মালির ঘাড়ে।' সেই ইংরেজ সাহেবের আধপাগলা পুলিশ রতন ঘোষ, ওরফে রটেন ঘোষ্ট (গোষ্ট) এই সময় গেট দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে আসতেই তার জোর ধাক্কা লাগলো ফটিক চানের সাথে। রতন ঘোষ চমকে উঠে বললো– ডেম্ভারাস, ডেম্ভারাস! কে তুমি? এখানে কেন? হোয়াই, হোয়াই?

উল্লসিত হয়ে উঠে ফটিক চেন বললো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! তুমি ইংরেজি জানো?

রটেন ঘোষ্ট বললো– জানি মানে? আমি বিস্তর ইংরেজি জানি। তুমি?

: আমিও। আমিও প্রচুর ইংরেজি জানি।

: তাই? ভেরী গুড, ভেরী গুড। তা কোথা থেকে এসেছো?

: বাংলা মুলুক থেকে। বাংলাদেশ থেকে।

হকচকিয়ে গিয়ে রতন ঘোষ বললো– ও গড! তুমি কি জিহাদী?

ফটকে বললো– না না, জিহাদী নই। আমি গোয়েন্দা। আমার ইংলিশ স্যারের একজন তুখোড় গোয়েন্দা। আমি একজন বাংলাদেশী জিহাদীকে খুঁজছি। একজন বাংলাদেশী কাসিদকে, এমন কেউ কি এখানে এসেছিল?

: কাসিদ? নো নো, একজন জিহাদী এসেছিল।

: বাংলাদেশী জিহাদী?

: ইয়েস ইয়েস।

: তাও হতে পারে। কাসিদ তো একজন জিহাদীই। তুমি তাকে দেখেছো?

: ইয়েস ইয়েস।

: তার নাম জানো?

নো নো।

: আমি যে তাকেই খুঁজছি।

ভেরী গুড, ভেরী গুড!

সে জিহাদী এখন কোথায়?

পালিয়েছে। আমাকে আঘাত করে পালিয়েছে।

: আঘাত করেছে তোমাকে?

ইয়েস, ইয়েস! ডেন্ডারাস আঘাত। ইংরেজ স্যারের ফুলিশ আমি। সেই ফুলিশকে আঘাত করে পালিয়ে গেছে।

: কি তাজ্জব! ইংলিশ স্যারদের পুলিশকে আঘাত করে পালিয়ে গেল! কোথায় গেল?

বোধ হয় বাংলাদেশে। এখানে তো খুঁজে আর তাকে পাওয়া যায়নি।

তাহলে নালিশ করোনি কেন? বাংলাদেশের সে লোক মালদহ জেলার লোক। মালদহ জেলার পুলিশ কমিশনারকে তা জানাওনি কেন?

নাম জানি না। সে লোক মালদহের লোক কিনা, তাও জানি না। মালদহের ফুলিশ কমিশনারকে জানাবো কি করে।

তার মানে?

আমার মুনিব স্যার বাচ্চন হুজুর তো তা জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জানাবেন কার কাছে আর কোথায়? সে লোক তো তোমাদের অন্য জেলার লোকও হতে পারে।

না না, আমার ধারণা এই লোকই সেই কাসিদ আহসান উল্লাহ। মালদহের লোক।

সেটা নিশ্চিতভাবে না জানলে, স্যার বাচ্চন হুজুর তা জানাবেন না। তুমি দেশে গিয়ে খোঁজ করো। তুমি গোয়েন্দা আদমী। খোঁজ করলে আলবত সত্যটা জানতে পারবে। সেই বাংলাদেশী জিহাদী মালদহের লোক হলে,

মানে তুমি যার কথা বলেছো সেই লোক হলে, তুমি আমার সাহেবকে পত্র দেবে। আমার স্যারের ঠিকানা নিয়ে যাও।

ফটিক চান ফটকে উল্লাস ভরে বলে উঠলো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। সেইটেই উত্তম কথা। ঠিক কথা। তাহলে তোমার সাহেবের ঠিকানাটা লিখে দাও, আমি ঠিকানা নিয়ে চলে যাই।

ভেরী গুড, ভেরী গুড। তুমি এখানে ষ্ট্যান্ড করে থাকো, আমি ঠিকানা এনে দিচ্ছি।

রটেন ঘোষ্ট (গোষ্ট) দপ্তর থেকে ঠিকানা এনে দিলে, সেটা নিয়ে মহানন্দে ফিরতি পথ ধরলো ফ্যাটিগ চেন ফটকে।

ফটকে মানিকচকে ফিরে এসে দেখলো, কাসিদ আহসান উল্লাহ মানিকচকে আসেনি। চিন্তায় পড়ে গেল ফটকে। কাসিদ আহসান উল্লাহ পাঞ্জাব থেকে তখনই পালিয়ে এলো দেশে। কিন্তু দেশে সে কই? তবে কাসিদটা কি আসলেই পাঞ্জাব তথা সীমান্তে যায়নি? তাহলে গেল কোথায়? কার কথা বললো রতন ঘোষ আর সীমান্তের ওরা? সে লোক তাহলে কি কাসিদ আহসান উল্লাহ নয়? অন্য কেউ? চিন্তায় পড়লো ফটিক চান ফটকে।

এদিকে চরম দুশ্চিন্তায় পড়লেন আহমদুল্লাহ খান সাহেবসহ আহসান উল্লাহ সাহেবের প্রিয়জন সকলেই। এতদিনও কোন খবর না থাকায় কাসিদ সাহেব তাহলে বুঝি আর জিন্দা নেই– এমনই একটা কুচিন্তা দানা বাঁধতে লাগলো সকলের মনে। চোখের পানি ফেলতে লাগলো লায়লা বানু, সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন আহমদুল্লাহ খান সাহেব আর বাড়ি থেকে বাজার আর বাজার থেকে বাড়ি– অবিরাম ছুটোছুটি করতে লাগলো হজরত আলী ওরফে হজরত আলী মণ্ডল।

শেষ অবধি একেবারেই চরমে উঠে গেল পরিস্থিতি। কাসিদ সাহেব আর একেবারেই ফিরে এলেন না দেখে, তিনি আর ইহজগতে নেই– সকলের কাছে এটা একদম নিশ্চিত হয়ে গেল। এ সময় একটা খবর ছড়িয়ে পড়লো মানিকচক বাজারে। খবরটা হলো– ইংরেজ বাহিনীর একদল সৈন্য সীমান্তের কাছাকাছি এক স্থান থেকে একজন মুসল্লিকে ধরে নিয়ে কলিকাতায় আসে আর বিপ্লবী সন্দেহে তাকে প্রকাশ্য রাজপথে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুসল্লিটা

নাকি একজন বাংলাদেশী আর কম বয়সী এক অতিশয় দর্শনধারী লোক। এত সুন্দর লোকটাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে দেখে পথচারীরা সবাই হায় হায় করেছে আর দু'চোখের পানি ফেলেছে।

মানিকচক বাজারে এ খবর এনেছে মানিকচক বাজারেরই কয়েকজন লোক। বিশ বাইশ দিন আগে কার্যোপলক্ষে তারা কলিকাতায় গিয়েছিল। গিয়েই তারা এ ঘটনার কথা শুনেছে। বিশ বাইশ দিন পরে মানিকচকে ফিরে এসে তারা এ ঘটনার কথা সবাইকে বলেছে। বিশেষ করে তারা যখন শুনেছে যে, কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব অনেকদিন আগে সীমান্তের ওদিকে গিয়ে আর ফেরেননি, তখন বাংলাদেশী ঐ মুসল্লীটাই যে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব– এ সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের জীবিত থাকার ব্যাপারে যা একটুখানি আশা সবার মনে ছিল এই খবর প্রচার হওয়ার পর তা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। এতে করে তিনি যে আর সত্যি সত্যিই জীবিত নেই, এইটেই নিশ্চিত হয়ে গেল। এই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হলো কাসিদ সাহেবের প্রিয়জনদের মাঝে। আছাড় খেয়ে বিছানায় পড়ে লায়লা বানু পুনঃপুনঃ জ্ঞান হারাতে লাগলো, থপ করে বসে পড়ে প্রস্তরমূর্তির মতো একেবারেই নির্বাক হয়ে গেলেন আহমদুল্লাহ খান সাহেব। আজম শেখ আর মরিয়ম বিবি টান হয়ে শুয়ে পড়লো আঙ্গিনায় আর মর্সিয়া হওয়ার মতো কাসিদ সাহেবের বাড়ির গেটে বসে দুই হাতে বুক চাপড়াতে লাগলো হজরত আলী।

ভেল্কিবাজির মতো হঠাৎ করে একেবারেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। 'কি হয়েছে, কি হয়েছে, বাড়ির সবাই নীরব কেন?'– বলতে বলতে সন্ত্রস্তভাবে খান সাহেবের অন্দর মহলে ছুটে এলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ। তাঁর ধারণা, অঘটন একটা কিছু ঘেটে গেছে নিশ্চয়ই।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে দেখেই আঙ্গিনায় লুটিয়ে থাকা আজম শেখ আর মরিয়ম বিবি এক সাথে সশব্দে আওয়াজ দিয়ে উঠলো– সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! মরা মানুষ ফিরে এসেছে! আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!

আওয়াজ দিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আজম শেখ আর মরিয়ম বিবি চিৎকার করে ডাকতে লাগলো– এদিকে আসুন, আপনারা এদিকে আসুন! আল্লাহর কি

বইঘর ও রোকন

রহম দেখুন। কাসিদ সাহেব বেঁচে আছেন। তিনি ফিরে এসেছেন–

এদের ডাক শুনে আহমদুল্লাহ খান সাহেব সংবিতে ফিরে পেলেন। ফিরে এসেই মহানন্দে বলে উঠলেন– এ্যাঁ! কাসিদ সাহেব ফিরে এসেছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! কই, কোথায়? –বলতে বলতে লাঠিতে ভর দিয়ে ছুটে এলেন তিনি। সম্বিত ফিরে এলো লায়লা বানুরও। সে চমকে উঠে বললো– কে ফিরে এসেছে খালা, কে ফিরে এসেছে?

মরিয়ম বিবি উচ্চকণ্ঠে বললো– মরা মানুষ, মরা মানুষ! কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব আম্মাজান, কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব!

শুনেই পড়িমরি ছুটে এলো লায়লা বানুও। সবাই আঙ্গিনাতেই ঘিরে ধরলো কাসিদ সাহেবকে। আজম শেখ ফের তখনই ছুটে গেল হজরত আলীকে খবর দিতে। কাসিদ সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– কি ব্যাপার? মরা মানুষ মানে? আমি মরা মানুষ হলেম কখন?

আহমদুল্লাহ সাহেব বললেন– বলছি বলছি। আগে উঠে এসে বসুন। বহুদূর থেকে এসেছেন, আগে একটু শান্ত হোন। পরে বলছি সব।

কাসিদ সাহেবকে টেনে নিয়ে গিয়ে খোলা বারান্দায় বসালেন খান সাহেব। এরপর সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন তাদের অনুমান ও শোনা কথা।

লায়লা বানু অভিমানভরে প্রশ্ন করলো– এই এতদিন নিরুদ্দেশ থাকার কারণটা কি জানতে পারি?

কথার মাঝেই খান সাহেব বলে উঠলেন– এখন নয়, এখন নয়। কতদিন যে অনাহারে আর বিনে গোসলে আছেন, কে জানে! কাসিদ সাহেব আগে খাওয়া-গোসল করে শান্ত হোন, তারপরে আমরা আরাম করে বসে শুনবো সব কথা।

সেই কথাই হলো। গোসল আহার অন্তে কাসিদ সাহেব এসে শান্ত হয়ে বসলে, সবাই এসে আবার ঘিরে ধরলেন তাঁকে। আনন্দে নাচতে নাচতে হজরত আলীও চলে এলো এর মধ্যে। সবাই এসে ঘিরে ধরে বসার পর খান সাহেব প্রশ্ন করলেন– আসলে ঘটনাটা কি বলুন তো? এত দীর্ঘদিন আপনার খবর না থাকার কারণ?

জবাবে কাসিদ সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– আমি জেলে ছিলাম।

শুনে চমকে উঠলেন সকলে। একবাক্যে বলে উঠলেন– সে কি, সে কি! তাহলে ঐ ধরা পড়ার খবরটাই ঠিক?

কাসিদ সাহেব বললেন– ধরা পড়ার খবর মানে?

খান সাহেব বললেন– সীমান্তের কাছে কোন এক স্থানে নাকি ধরা পড়েছিলেন আপনি?

না না, ওদিকে কোন স্থানে ধরা পড়িনি আমি। আমি ধরা পড়ি অযোধ্যায়। অযোধ্যার খায়রাবাদে। অযোধ্যাতেই জেল হয় আমার আর ওখানেই জেলে ছিলাম।

জেলে ছিলাম মানে?

মানে, এই দীর্ঘদিনের প্রায় সময়টাই ওখানে জেলে ছিলাম আমি। কয়েকটা দিন মাত্র কেটেছে আমার সীমান্তের ওদিকে আর বাকী সময় কেটেছে ঐ অযোধ্যায়।

: অযোধ্যায়?

: অযোধ্যার রাজধানী লাখ্‌নৌ-এর জেলে।

কেন কেন? জেল হলো কেন?

কাসিদ সাহেব ফের স্মিতহাস্যে বললেন– বলতে পারেন সেটা আমার একটা সখের খেশারত। দীর্ঘদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল দ্বীপান্তরে গিয়ে কয়লা দিয়ে কাফনের কাপড় আর টুকরো কাগজ ও বস্ত্রখণ্ডের উপর লেখা মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর 'আস্-সাওরাতুল হিন্দিয়া' বইটি পড়া। আরবি ভাষায় লেখা এই অনবদ্য বইটির, তথা তাঁর দ্বীপান্তরিত জীবনের জুলুম যন্ত্রণার এই ইতিহাসটির খোঁজে আমি মাওলানা ফযলে হকের খায়রাবাদে যাই আর অনেক চেষ্টা করে একজনের মাধ্যমে এই দুর্লভ বইটির এক কপি যোগাড় করি।

কাসিদ সাহেব একটু থামলে খান সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– তারপর?

কাসিদ সাহেব বললেন– ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে এই বইটি আর এর কপিগুলি পুড়িয়ে ফেলে। এই পোড়ানোর পরেও এর কিছু কপি লুকানো থাকে কিছু কিছু স্থানে। অনেক অনুসন্ধানের পর একজনের সাহায্যে এরই একটি কপি যোগাড় করি আমি। এই য়োগাড় করেই পড়ে গেলাম ফাঁদে।

কেমন কেমন?

বইটির ব্যাপারে সতর্ক নজর ছিল পুলিশের। তাই, এক কপি বই যোগাড় করে নিয়ে বেরোতেই পুলিশ ধরে ফেলে আমাকে। বই সমেত আমাকে ধরে এনে কোর্টে সোপর্দ করে পুলিশ। কোর্ট আমাকে জেল হাজতে বন্দি রাখে আর চলতে থাকে আমার বিচার।

কি গজব! তাহলে ছাড়া পেলেন কিভাবে।

যে লোক বইটি আমাকে যোগাড় করে দেয়, সে লোক আমার ছাত্রজীবনের এক সহপাঠী আর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে-ই আমাকে খালাস করার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে।

: আচ্ছা!

উকিলের মাধ্যমে সে কোর্টকে জানায়, 'আসামী বইটির প্রকাশকও নয়, বিপণনকারীও নয়। সে একজন পাঠক মাত্র। অজ্ঞতা বশত নিষিদ্ধ বইটি পাঠ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বড় জোর তার পাঁচ সাত দিনের জেল হতে পারে। এই দীর্ঘ সময় তাকে জেল হাজতে পঁচিয়ে মারা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।'

তারপর?

চলতে থাকে যুক্তি তর্ক আর এইভাবেই কেটে যায় প্রায় দুই মাস। দীর্ঘ দুইমাস পরে বিচারক আমাকে খালাস করে দেন।

: আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!

সকলেই এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হজরত আলী প্রশ্ন করলো– আর ঐ বইটার কি হলো ভাইজান? বইটা দিলো না?

কাসিদ সাহেব বললেন– তাই কি দেয়? বইটা বাজেয়াপ্ত করা হলো।

হজরত আলী ফের বললো– মালদহ সদর থেকে যে বইটা এনেছিলাম, সেটার চেয়ে এই বইটা বেশি ভাল ছিল বুঝি?

: অনেক বেশি ভাল, অনেক বেশি ভাল। এক অনবদ্য বই।

: আহা! বইটা পড়া হলো না আপনার!

এখন আর হলো কই? তবে ভবিষ্যতে সে আশা আছে কিছুটা।

: আছে?

হ্যাঁ, আছে। আমার সেই সহপাঠী মানে যে আমাকে বইটি যোগাড় করে

দিয়েছিল সে বলেছে– 'এই বইটা বাজেয়াপ্ত করলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমার হাতে আরো কিছু বই আছে। আমি জেল হওয়া কয়েদীদের হাতেও দুই কপি বই জেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার হাত ছাঁদে কে? এখন যাও, পরে তুমি যখন চাইবে আর যেখান থেকেই চাইবে, সেখানেই এক কপি বই পাঠিয়ে দেবো আমি। এমনভাবে পাঠাবো যে, কারো সাধ্য নেই সন্ধান পায়।'

: তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভাল কথা ভাইজান, খুব ভাল কথা।

কথা আর বাড়াতে দিলো না লায়লা বানু। কাসিদ সাহেবকে বললো, আজকে আর নয়। মাগরিবের সময় হয়ে আসছে। হয় মাগরিবের নামায এখানেই আদায় করে আজ রাতে এখানেই থাকুন, নয় এখনই বাড়ির পথ ধরুন। আঁধার হয়ে আসছে।

এ কথায় কাসিদ সাহেব শশব্যস্তে বলে উঠলেন– না না, বাড়ি যেতে হবে, বাড়ি যেতে হবে। ওখানে নিশ্চয়ই সবাই উদগ্রীব হয়ে পথ চেয়ে আছে। উঠো হজরত আলী, আমরা এখন রওনা হই–

হজরত আলী অত্যন্ত খুশী হয়ে বললো– জি জি, চলুন ভাইজান, চলুন–

হজরত আলী সহকারে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব নিজের গৃহের দিকে রওনা হলেন।

৬

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব ফিরে আসার পর কয়েকদিন বেশ আরামেই গেল। সাধ্যমতো সকলেই ফের এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত করতে লাগলেন। হাসি খুশীতে সকলের দিন কাটতে লাগলো।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আহমদুল্লাহ খান সাহেব আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিনভাবে না হলেও তাঁর শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। এ ব্যাপারে অন্যের চেয়ে খান সাহেবই উতলা হয়ে উঠলেন অধিক। তিনি আজম শেখকে বললেন– সবাইকে ডাক দাও আজম মিয়া, এ বাড়ির ও বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে আমার কাছে জড়ো করো।

আজম শেখ শংকিত কণ্ঠে বললো– কেন হুজুর, এ কথা বলছেন কেন? আপনার অসুখটা কি হঠাৎ করেই মারাত্মক আকার ধারণ করলো?

খান সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন– না, এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি ঠিক। কিন্তু তা করতে আর কতক্ষণ?

: হুজুর!

ঐ যে, মানুষ যেমন দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, দাঁত চলে গেলে তা বুঝতে পারে, তেমনি অনেক মানুষ সময় থাকতে সময়ের মূল্য বোঝে না আর তাই সময়ের কাজ সময়ে করে না।

: সময়ের কাজ?

হ্যাঁ, সময়ের কাজ। সময়মতো এক ফোঁড় দিলে যা সাড়ে প্রায় মানুষই তা দেয় না। তাতে করে অসময়ে নয় ফোঁড় দিয়েও তা সাড়ে না। আমার হয়েছে সেই দশা।

এসব কি বলছেন হুজুর? আপনার সেই দশা হয়েছে মানে?

আরে বাবা, তোমাকে আর কি ভাবে বোঝাবো? চালে খড় নেই ঘর ছাওয়া দরকার। কিন্তু বৃষ্টি নেই বলে ছাওয়ার কথাটা তেমন মনে থাকে না। বৃষ্টি

যখন নামে, তখন মনে হয়, আহা, ঘরটা তো আগেই ছাওয়া লাগতো আমার। ব্যাপারটা এই রকম, বুঝেছো?

আজম শেখ অসহায়ের মতো চেয়ে থেকে বললো– না হুজুর, আপনার কথা আমি এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

খান সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন– তোমার বোঝার দরকার নেই। বৃষ্টি মুষল ধারে এখনো নামেনি। টিপ টিপ করে পড়ছে। এখনই ঘরটা ছেয়ে ফেলবো আমি। পরে আর হয়তো ছাওয়ার সময় পাবো না। তুমি সবাইকে ডাক দাও। ডেকে এনে আমার কাছে জড়ো করো।

হুজুর!

: আহ! এত কথা বলছো কেন? যা বললাম তাই করো। জলদি...

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন খান সাহেব। বুঝতে পেরে আজম শেখ বললো– জি হুজুর, আনছি। সবাইকে এখনই ডেকে আনছি।

আজম শেখ তখনই ছুটলো। বাড়ির সবাইকে এত্তেলা দিয়ে সে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ির দিকে দৌড় দিলো। আজম শেখের তাকিদে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ও বাড়ির সবাই। ভাবলেন, নিশ্চয়ই খান সাহেব আবার বেকার হয়ে গেছেন।

কাছে থাকায় বাড়ির লোকেরা আগে এলো খান সাহেবের কাছে। লায়লা বানু ব্যস্তকণ্ঠে বললো– কি হলো দাদু, খুবই কি কষ্ট হচ্ছে? মানে অসুখটা কি খুবই বেড়ে গেল?

খান সাহেব বললেন– না, তেমন কিছু বাড়েনি। আগের মতোই আছে।

তবে যে জরুরী তলব দিলেন আমাদের?

বলবো বলবো, সব বলবো। আগে সবাই আসুক। ও বাড়ি থেকে কাসিদ সাহেব, হজরত আলী ওরা সবাই আসুক। একটু অপেক্ষা করো।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আজম শেখের ব্যস্ততাকে বিপদের আলামত মনে করে ওবাড়ি থেকে পড়িমরি ছুটে এলেন সবাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব খান সাহেবকে শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– কি হয়েছে মুরুব্বী? আপনি কি খুবই কষ্টবোধ করছেন?

আহমদুল্লাহ খান সাহেব কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– না নওজোয়ান। এখনও খুব কষ্ট বোধ করছিনে। তবে...

: তবে? কি মুরুব্বী?

তবে বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ওপারের ডাক আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আর আমি বেশিদিন ইহদুনিয়ায় নেই।

: মুরুব্বী!

নব্বই পার হয়ে গেছে। শরীরের কলকব্জা ঢিলে হয়ে গেছে। এতদিনও যে বেঁচে আছি এইটেই যথেষ্ট। তাই আর দেরী করবো না। আমার একান্ত করণীয়টা এখনই করে ফেলবো আমি। খেয়াতরী এপার থেকে ওপারে যাওয়ার আগেই করে ফেলবো।

: মানে? আপনি কি বলছেন?

কি বলছি তা বুঝতে পারছেন না নওজোয়ান? আপনাদের শাদির কথা বলছি। আপনার সাথে লায়লা বানুর শাদির কথা। সেই কবে আপনার বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা পাকা করে এলাম আর আজও তা কার্যকর করা হলো না। যে কঠিন অসুখে পড়েছিলাম, তাতে করে তখনই যদি শেষ হয়ে যেতাম, তাহলে এই অবশ্য কর্তব্য পালন না করার দায়ে কেমন ঠেকে যেতাম আমি, বলুন তো!

খান সাহেবের ব্যস্ততার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন সকলে। বুঝতে পেরে সকলের মনে স্বস্তি ফিরে এলো। তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। লায়লা বানু আর কাসিদ সাহেব মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেও অনেকটাই নুয়ে পড়লেন শরমে। লায়লা বানু উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতেই খান সাহেব বললেন– আরে আরে! সেকি সেকি! এত শরম পাচ্ছো কেন? কচি খুকী তো নও তুমি। পুরোপুরি সাবালিকা মেয়ে। কাসিদ সাহেবের ব্যাপারটা আরো তাগড়া। শাদির বয়সটা তাঁর আরো আগে হয়েছে। এ বয়সে এ কথায় কি এমন নুয়ে পড়লে চলবে? কি হলো কাসিদ সাহেব, কথা বলুন?

www.boighar.com

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব মৃদুকণ্ঠে বললেন– কি বলবো মুরুব্বী?

www.boighar.com

কি বলবো মানে? সব বলবেন আর এ ব্যাপারে সব কিছু করবেন। বলছি না, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখনই এ কাজটা শেষ করতে চাই আমি। আমার তো নিজের নড়াচড়ার সাধ্য নেই। উদ্যোক্তা হয়ে আপনাকেই সব কিছু করতে হবে। দিন ঠিক করা, আনযাম আয়োজন করা, দাওয়াত পত্র লিখা, তার লিষ্ট তৈয়ার করা– মানে সব কিছু।

এবার আজম শেখ আর মরিয়ম বিবি সোৎসাহে বলে উঠলো– ঠিক ঠিক,

হুজুরের কথা ষোলআনাই ঠিক। কাসিদ সাহেবকেই তো সব করতে হবে। তাঁকে বরপক্ষ কনেপক্ষ, দুই পক্ষ হয়েই সব করতে হবে। কি বাবাজী, এটা কি ভুল কথা কিছু?

কাসিদ সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– আমাকেই সব করতে হবে? মানে, আমাকেই?

এ কথায় হজরত আলী সশব্দে বলে উঠলো– একশো বার। হাজার বার। আপনি ছাড়া আর কে করবে ভাইজান? আপনার মতো জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান আর করিৎকর্মা খান সাহেব ছিলেন, কিন্তু তিনি তো অচল। আপনি ছাড়া এ কাজে নেতৃত্ব আর কে দেবে? সেটা আমার কাজও নয়, শেখ চাচার কাজও নয়। আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

হজরত আলীর কথা শুনে খান সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– মারহাবা মারহাবা! এই হজরত আলীটা তো সত্যিই সমঝদার ছেলে। বড়ই তারিফ পাওয়ার যোগ্য। বয়স কম হলেও, তার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ।

অতঃপর তিনি কাসিদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন– আর দ্বিরুক্তি করার মওকা নেই কাসিদ সাহেব! এবার আসুন, আমার আরো কাছে বসুন। আর এই যে, তোমরাও সবাই আমার কাছে এসো। শাদির দিনটা এখনই ঠিক করে ফেলো। যোগাড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাই যে যা পারো, বলো। ঐ যে কথা আছে না, পিঁপড়ের বলও বল। বুদ্ধি পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে, কাজকর্ম করার ব্যাপারে– সবাইকে তোমাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। নিশ্চুপ আর নিষ্ক্রীয় থাকা কারো চলবে না।

সকলের অংশগ্রহণে এবার শুরু হলো আলোচনা। স্থির হলো, আটদিন পরে, অর্থাৎ এই শুক্রবারের পরের শুক্রবারে বাদ জুম্মা শাদি মোবারক সুসম্পন্ন করা হবে। সেই মোতাবেক তৈরি হলো আয়োজনের তালিকা, বাজারের ফর্দ আর দাওয়াত পত্রের লিস্ট। সকল কাজই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া হলো। খানাপিনার বাজার করার ভার পড়লো হজরত আলী আর আজম শেখের উপর।

মস্ত মস্ত দুই ডালি হাতে নিয়ে বাজারে কেনাকাটা করছে হজরত আলী আর আজম শেখ। শাদির খানাপিনা বলে কথা। কিনতে কিনতে ভরে উঠেছে দুই ডালি। এতেও হবে না। আরো একবার আসতে হবে দুই ডালি নিয়ে। ভরা

বইঘর.ও রোকন
দুই ডালি পাশে নামিয়ে রেখে এই কথাই ভাবছে হজরত আলী আর আজম শেখ।

এই সময় পাশে এসে দাঁড়ালো ফটিক চান ফটকে। সে তার স্বভাবগত আওয়াজ দিয়ে উঠলো– এ্যান্টেনাস এ্যান্ট, ট্যান্টেনাস ট্যান্ট!

পাশ ফিরে চেয়ে হজরত আলী বললো– আরে একি! সাহেবদের পোষাপ্রাণী ফ্যাটিগ চেন যে! হঠাৎ তুমি এখানে?

ফ্যাটিগ চেন ফটকে বললো– বাজারে এসেছিলাম। নজরে পড়লো তাই দেখতে এলাম। তোমাদের কেনাকাটা দেখতে এলাম। কি সাংঘাতিক! দুই চাঙ্গারী বোঝাই বাজার সওদা! এত বাজার সওদা, মানে খাওয়ার আয়োজন কিসের জন্যে? কেউ মরেছে নাকি?

হজরত আলী রুষ্টকণ্ঠে বললো– কি বাজে কথা বলছো? মরবে কেন?

মানে কারো তামদারী নাকি? ঐ যে কুলখানি না কি যেন বলো মানে?

মানে কারো তামদারী নাকি? ঐ যে কুলখানি না কি যেন বলো তোমরা, সেই কুলখানির খাওয়া নাকি?

: কুলখানির খাওয়া হবে কেন? কুলখানি ছাড়া কি অন্য কিছু হতে পারে না?

অন্য কিছু? তা অন্য কিছু কিরে ভাই? এমন বিরাট আয়োজন, কিসের এত আয়োজন?

সেটা তোমার জানার দরকার কি? আর তোমাকে তা বলবোই বা কেন?

যা বাবা! বললে কি জাত যাবে তোমাদের? কিসের বাজার সওদা, সে কথাটা বলাও কি নিষেধ?

: নিষেধ হবে কেন? দেখতেই তো পাচ্ছ, খানাপিনার বাজার।

সেই কথাই তো বলছি! খানাপিনার এত বাজার! কিসের খানাপিনা? তামদারীর নয়তো কিসের?

যেমন দূষিত মন তোমার, তেমনি দূষিত তোমার চিন্তা-ভাবনা। শাদির খানা, শাদির খানা। তামদারী ছাড়া বিয়ে শাদিতেও যে খানাপিনা হয় সেটা কি তোমার অজানা? তোমার ইংলিশ প্রভুরা কি বিয়ে শাদিতে খানার আনযাম করে না?

ফটিক চান ফটকে সপুলকে বললো– করে-করে, খুব করে। তবে তোমাদের মতো এই নেটিভ খানা নয়। শ্যামপেন হুইস্কি– র‍্যাম-ভোদকা– এইসব

আয়োজন করে।

হজরত আলী বললো– তবে?

তবে মানে, সেই জন্যেই জানতে চাচ্ছি। কার শাদির খানাপিনা রে ভাই? তোমার শাদির নাকি। বিয়ে করছো তুমি তাহলে?

কিঞ্চিৎ শরম পেয়ে হজরত আলী বললো– আরে ধ্যাত্। আমার শাদি হবে কেন? আমার ভাইজানের শাদি।

থতমত খেয়ে ফটিগ চান বললো– ভাইজানের শাদি? তোমার কোন ভাইজানের?

কোন ভাইজানের মানে? আমার ভাইজান আবার কয়টা? ঐ আহসান উল্লাহ সাহেবই আমার একমাত্র ভাইজান– তা জানো না?

ফটিক চান ফটকে চমকে উঠে বললো– এ্যাঁ, আহসান উল্লাহ? তোমার গুরু, মানে শিষ্যের গুরু ঐ কাসিদ আহসান উল্লাহ?

: জি, কাসিদ আহসান উল্লাহ।

সে ফিরে এসেছে? ফিরে এসেছে কাসিদ আহসান উল্লাহ?

: ফিরে আসেনি তো কি মরে গেছে? ফিরে না এলে শাদি হচ্ছে কি করে?

এ্যানটেনাস এ্যান্ট! শুনলাম, সে নাকি মরে গেছে!

তুমি মরো, তোমার গুষ্টি মরুক, তোমার প্রভু-দেবতা সবাই মরুক। ভাইজান মরবে কেন?

ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। তাহলে কোথা থেকে এলো তোমার ভাইজান? এতদিন কোথায় ছিল?

কোথায় ছিল?

ফটিক চান ফটকে বিপুল আগ্রহে বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় ছিল এতদিন? কোথায় ছিল বলো তো?

হজরত আলী সতর্ককণ্ঠে বললো– বটে! সে কথা তোমাকে বলবো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো না, বলো না?

আজ্ঞে না। আর নেড়ে বেলতলা যায় না। একবার আমার কাছে ভাইজান কোথায় গেছেন– কায়দা করে তা জেনে নিয়েছিলে। যেই বললাম সীমান্তে অমনি নাচতে নাচতে দৌড় দিলে তুমি। আমার পুনঃপুনঃ ডাকে আর কানই

দিলে না। এবার জানতে চাও– উনি কোথায় ছিলেন? খুব চালাকী পেয়েছো, না? ভাগো। ভাগো এখান থেকে। ওসব চালাকী আর চলবে না।

ধরা পড়ে গিয়ে ফটিক চান কাঁচুমাচু করে বললো– না-মানে, বলছিলাম কি...

হজরত আলী রুষ্ট কণ্ঠে বললো– থাক। আমাদের কাজ আছে। ওসব বলাবলির মধ্যে থাকলে আর চলবে না। তুমি বিদেয় হও।

ঘুরে দাঁড়াল হজরত আলী। ফটকে ফের তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– এ্যাঁ! বিদায় হতে বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অবশ্যই বিদায় হবো। তবে ওকথা না বলো, একটা কথা বলো তো শুনি? তোমার ভাইজানের কোথায় বিয়ে হচ্ছে? কি সুন্দর চেহারা তোমার ভাইজানের! এত সুন্দর মানুষ বিয়ে করছে কাকে? কোন নেটিভের কুৎসিত কদাকার মেয়েকে নয় তো?

হজরত আলী ফের নাখোশ কণ্ঠে বললো– তাতে তোমার কি?

নাছোড় পিণ্ডে ফটকে বললো– আমার জানার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে। কেমন জুটি হচ্ছে তোমার ভাইজানের– এটা জানার আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে রে ভাই!

: বটে!

আমার কেন, এ ইচ্ছে সবারই হবে। এত বেশি দর্শনধারী মানুষের জুটি বলে কথা। বলো না, কেমন হচ্ছে জুটিটা?

কেমন? চোখ ধাঁধাঁনো জুটি। তোমার ঐ ইংলিশ হুজুরদের শ্বেত বাঁদরী মেয়ের চেয়ে হাজার গুণে সুদর্শনা মেয়ে। চোখ ধাঁধাঁনো মেয়ে।

চোখ ধাঁধাঁনো মেয়ে?

: হুরী হুরী। বেহেশতের হুরী।

: মাই গড। বলো কি? এমন মেয়ে কোথায় পেলো তোমার ভাইজান?

: নদীতে নদীতে। ঐ যে সেবার নদীতে ডুবে যাওয়া যে মেয়েকে নদী থেকে তুলে আনলেন উনি, এ মেয়ে সেই মেয়ে।

এ্যাঁ! বলো কি, বলো কি! ঐ মেয়েই সেই মেয়ে? তুমিও তো ঝাঁপ দিয়েছিলে নদীতে। মেয়েটাকে আমি তো দেখিনি! ঐ মেয়েটাই এত সুন্দরী মেয়ে ছিল?

ঐ মেয়েটাই, ঐ মেয়েটাই।

কি তাজ্জব! তা সে মেয়ে কার মেয়েরে ভাই? এত সুন্দরী মেয়েটা কার মেয়ে? কোথায় বাড়ি, তা কি তোমরা জানতে পেরেছো?

কেন পারবো না। সে মেয়ে এই মানিকচকেরই মেয়ে। মানিকচক বাজারের বিখ্যাত আলেম আহমদুল্লাহ খান সাহেবের মেয়ে।

: আলেম আহমদুল্লাহ খানের মেয়ে?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, তারই মেয়ে। মস্ত বড় আলেম। এক ডাকে তাঁকে চেনে সবাই।

সঙ্গে সঙ্গে ফটকের মনের কোণে আর এক তথ্য ঝিলিক দিয়ে গেল। ও.সি. ব্লাড সাকারের কাছে সে শুনেছিল– 'মানিকচক বাজারের বিখ্যাত আলেম আহমদুল্লাহ খান জিহাদ আন্দোলনের একজন মস্তবড় সমর্থক। কত বড় সমর্থক, একবার তদন্তে গিয়ে সেটা সঠিকভাবে জানা যায়নি। আর একবার তদন্তে যেতে হবে।' তাহলে এই সেই আলেম আহমদুল্লাহ খান?

ফটিক চান ফটকে খুবই গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ তাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে হজরত আলী বললো– কি হলো ফ্যাটিগ চেন মিয়া, তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

হুঁশে এসে ফটকে বললো– না না, কিছু নয়, কিছু নয়। আমি যাই...

ফটকে দ্রুত সরে যেতে লাগলো। হজরত আলী বললো– আরে আরে, কি হলো? যাও কেন? ও ফ্যাটিগ চেন ...

আর পেছনে না চেয়ে নিমেষেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ফটকে। আজম শেখ বললো– কি ব্যাপার? ও লোক ওভাবে দৌড় দিলো কেন?

হজরত আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললো– খলের কি ছলের শেষ আছে? আমার কথার মধ্যে আবার সে কিসের গন্ধ পেলো, কে জানে!

তাহলে ওর সাথে কথা বলো কেন? এত কথা না বলে, এক কথায় বিদায় করে দেবে? ওকে পাত্তা না দিলেই তো হয়।

যারা নির্লজ্জ আর বেহায়া তাদের কি এক কথায় বিদায় করা যায়? ঘুরে ফিরে কথা বলবে তারা।

: তাজ্জব!

যতই অপমান করো না কেন আর যতই ধিক্কার দাও না কেন, সে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসবে। পীড়াপীড়ি করে কথা বলতে চাইবে। দেখলে না, কেমন নাছোড় বান্দা? এক কথায় এদের বিদায় করা যায় না।

: হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম।

থাক ওর কথা। চলো, কেনাকাটা আরো অনেক বাকী। এগুলো বাড়িতে ঢেলে রেখে আবার বাজারে আসি, চলো...

ডালি কাঁধে তুলে নিয়ে তারা বাড়ির পথ ধরলো।

০০০

ফটিক চান ফটকে বাজার থেকে বেরিয়েই পথ ধরলো তের নম্বর থানার। দ্রুতপদে এসে সে হাজির হলো থানায় আর সরাসরি ঢুকে পড়লো ও.সি. বাদল সরকার, ওরফে ব্লাড সাকারের কাছে। ফটকে জোশের উপর ছিল। তাই কোন দিকে না চেয়ে সে আওয়াজ দিলো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! কামাল কিয়া, মায়নে কামাল কিয়া! দুই ব্যাটার খবর আমি এক সাথে করেছি।

ও.সি'র কাছে যে লোক বসেছিল, সে রুষ্টকণ্ঠে বললো– দুই ব্যাটার খবর!

দুই বাস্তু ঘুঘুর খবর, দুই বাস্তু ঘুঘুর। মানিকচক বাজারের দুই মার্কা মারা মালের।

: হোয়াট! কে তুমি?

: আরে! আমাকে চিনতে পারছেন না? গাঁজা খেয়েছেন নাকি?

টেবিলে হান্টারের বাড়ি মেরে ও.সি.র কক্ষে উপবিষ্ট লোকটি বললো– ইউ শাট আপ! তুমি এখানে ঢুকেছো কেন? কার হুকুমে?

ফটকে হোঁচট খেয়ে বললো– কার হুকুমে মানে? আমি কারো হুকুমের পরোয়া করি নাকি?

চোখ তুলে ভাল করে চেয়েই আর এক দফা হোঁচট খেলো ফটকে। বললো– এ্যাঁ! একি? কে তুমি? তুমি কে?

: তোর বাপ। গেট আউট, গেট আউট।

এবার ক্ষেপে গেল ফটকেও। চিৎকার করে বললো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! আমাকে গেট আউট? এত বড় সাহস! আমি লোকটা কে তা আজও টের পাওনি?

একটু থমকে গেল লোকটাও। বললো– মানে?

ফটকে বললো– মানে ব্লাড সাকার কোথায়? ও.সি. ব্লাড সাকার?

: বাদল সরকার বাবু?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সরকার। ও.সি., ঐ সরকার। তুমি কক্ষে কেন? তুমি কে?

আমি এই থানার এ.এস.আই. গঙ্গারাম সরকার। আমি এখন এই থানার চার্জে আছি।

ফটকে এবার নরম হয়ে বললো– ও, তাই বলো, মানে বলুন। আপনিই সেই গঙ্গারাম সরকার? মানে, ব্লাড সাকারের এ্যাসিট্যান্ট গ্যাংরাম সাকার? শুনেছি শুনেছি, ইংলিশম্যানদের মুখে আপনার নাম শুনেছি।

বেশ করেছো। তা তুমি এখানে ঢুকে চিৎকার করছো কেন? কে তুমি?

: টিকটিকি টিকটিকি। আমি ডগলাস স্যারের তুখোড় গোয়েন্দা ফ্যাটিগ চেন। আমাকে চেনো না?

এবার তিড়িং করে উঠে দাঁড়িয়ে থানার এ.এস.আই. গঙ্গারাম ওরফে গ্যাংর‍্যাম বললো– সে কি, সে কি! আপনিই সেই গোয়েন্দা ফ্যাটিগ চেন? আহা! সে কথা আগে বলবেন তো? বসুন, বসুন...

সামনের আসনের প্রতি ইংগিত করলো গঙ্গারাম। বসতে বসতে ফটিগ চান বললো– আমাকে খুবই পেয়ার করেন আমার প্রিয় স্যার ডগলাস সাহেব। মুন্সী ক্রেজী ক্যাডারও আমাকে যথেষ্ট খাতির করেন।

শুনেছি শুনেছি। সে কথা ও.সি. বাদল সরকার বাবুর মুখে আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আপনাকে আমি আগে দেখিনি। আজ দেখে ধন্য হলাম।

এ্যান্টেনাস এ্যান্ট! হতেই হবে। আমার নাম শুনলে ধন্য হতেই হবে। সবাই তাই হয়। তা ও.সি. ব্লাড সাকার কোথায়?

: আপনি কি তাঁর কাছেই এসেছিলেন?

: হ্যাঁ হ্যাঁ। তার কাছেই। খুব জরুরী খবর ছিল। উনি কোথায়?

: উনি এখানে নেই। ডিউটিতে গেছেন।

: ডিউটিতে! কার ডিউটিতে?

: মহামান্য বড় লাটের ডিউটিতে।

ওরে বাবা! বড় লাটের ডিউটিতে?

: হ্যাঁ। তাঁর ডিউটিতে কলিকাতায় গেছেন।

: কবে ফিরবেন?

কবে? তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। বড় লাটের ডিউটি বলে কথা! এক মাস, দুই মাস বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে ফিরে আসতে।

ফটিক চান ফটকে হতাশ কণ্ঠে বললো– ও গড। তাহলে এত দৌড়াদৌড়ি করে আসাটা আমার একদম বিফলেই গেল দেখছি।

: তা কি জন্যে এসেছিলেন?

ফটকে বললো– ঐ যে বললাম জরুরী খবর ছিল।

গঙ্গারাম বললো– কি সে জরুরী খবর, আমাকে বলা যায় না?

: বলে লাভ নেই। ওটা আপনি বুঝবেন না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উনার আর আমার মধ্যেকার ব্যাপার। মানে, একমাত্র ও.সি. ব্লাড সাকার আর আমিই এ খবরটার সাথে জড়িত আছি। উনি ছাড়া আপনি বিষয়টা বুঝবেন না।

: ও আচ্ছা। তাহলে আপনি পরে আসিবেন।

: হ্যাঁ, তাই আসবো। উনি ফিরে এলেই আমাকে জানাবেন।

: আপনাকে? তা...

: মুন্সী ক্রেজী ক্যাডারকে জানালেই আমি জানতে পারবো।

আচ্ছা আচ্ছা।

: আমি আজ তাহলে উঠি...

: জি, আসুন...

অনেকটা হতাশচিত্তেই সেখান থেকে ফিরে এলো ফটিক চান ফটকে।

দুই ডালি বাজার সওদা বাড়িতে ঢেলে রেখে তখনই আবার বাজারে এলো হজরত আলী আর আজম শেখ। ডালি হাতে এসে অলিগলি ঘুরে ঘুরে বাজার করতে লাগলো তারা। ময়-মশলাসহ খুঁটে খুঁটে প্রয়োজনীয় সব কিছু কেনাকাটা করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বাজারেই মাগরিব নামায আদায় করে বাদ মাগরিব তারা বাড়ি ফিরে এলো।

পরের দিন সকালে হজরত আলী কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো– আজ কোন কাজে হাত দেবো ভাইজান? বাজার সওদা করা তো শেষ। কাপড় জামা কেনা-বানানো আপনার কাজ। ওটা তো আমি বা আমরা পারবো না। এখন আমি কি করবো?

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তখন খান সাহেবের খোলা বারান্দায় বসে সবার সাথে এই যোগাড়-যন্ত্রের ব্যাপারেই কথাবার্তা বলছিলেন। হজরত আলীর কথার উত্তরে তিনি বললেন– কাজ তো পড়ে আছে অনেক। কোনটাতে যে লাগতে বলি তোমাকে! আচ্ছা তুমি আপাতত এক কাজ করো। কয়েকজন মজুর ডেকে এনে খড়ি ফাঁড়াইয়ের কাজে লাগিয়ে দাও। অনেক লোকের পাকশাক। অনেক লাকড়ি-খড়ির দরকার। বাড়ির পেছনের একটা আগাছা কেটে খড়ি ফাঁড়াইয়ের কাজে মজুরদের লাগিয়ে দাও আর ঐ তদারকি করো। পরে ডেকচি-কড়াই যোগাড় করা, বাবুর্চি পাকানী ঠিক করা, কলার পাতা কাটা– এসবে লাগতে হবে। এখন আপাতত খড়ি-লাকড়ির দিকটা দেখো।

www.boighar.com

এ কথায় আহমদুল্লাহ খান সাহেব বললেন– আরে, হজরত আলী মিয়াকে এসব কাজে লাগাচ্ছেন কেন? এসব কাজ তো আমাদের আজম শেখই করতে পারবে। হজরত আলী লেখাপড়া জানা ছেলে। ওকে অন্য কাজে লাগান কাসিদ সাহেব। লিষ্ট দেখে দেখে দাওয়াত পত্র বিলি করা, শাদির দিনে ছোটখাটো একটা দোয়ার অনুষ্ঠান, মানে মিলাদ মাহফিল করতে চাই– সেই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, কম পড়লে আরো কিছু দাওয়াত পত্র লেখা, হজরত মিয়াকে এসব কাজে লাগান।

এবার মরিয়ম বিবি বললো– শুধু ঐ কাজ কেন? একটা বড় কাজ তো এখনও পড়ে আছে হুজুর। সে কাজটা আগে করতে হবে না!

খান সাহেব বললেন– বড় কাজ! কোন কাজের কথা বলছো তুমি?

মরিয়ম বিবি বললো– হজরত মিয়ার বর্গাদার ঐ মেহের আলী আর তার বউকে আনতে হবে এখানে।

আমাদের প্রতি বড়ই দরদী মানুষ তারা। হজরত মিয়ার একদম আপন লোক। শাদির আনজাম আয়োজন এগিয়ে যাচ্ছে, তবু এখনো আনা হলো না তাদের। আরো পরে ডাকলে কি মনে করবে তারা?

খেয়াল হতেই খান সাহেব বললেন– ঠিকই তো, ঠিকই তো। আত্মীয় কুটুম তো তেমন কেউ নেই। আত্মীয় কুটুম বলতে হাতের কাছে ওরাই এখন আত্মীয় কুটুম আমাদের। শুধু শাদির খানা খাওয়ার জন্যে একটা দাওয়াতপত্র ফেলে দিয়ে এলেই কি চলবে?

কখ্খনো না হুজুর, কখ্খনো না। তাহলে মনে ওরা বড়ই আঘাত পাবে।

আর তাছাড়া অন্দরের দিকটাও তো চিন্তা করতে হবে হুজুর। একটা শাদির কাজ কাম বলে কথা। অন্দরের তামাম কাজকর্ম আমি একা সামাল দেবো কি করে? মেহের আলী মিয়ার বউ মর্জিনা খাতুন একজন বড়ই কিরৎকর্মা মেয়ে। তার সাথে সেবার কয়েকদিন থেকেই সেটা বুঝেছি। ঐ মর্জিনা বহিন আমার পাশে থাকলে যথেষ্ট সাহায্য পাবো আমি।

: ঠিক ঠিক। বড়ই কায়েমী কথা। এ দিকটা চিন্তাই করিনি আমি। একা তুমি কয়দিক সামলাবে?

জি হুজুর। সেই সাথে আমি আরো বলছিলাম যে, হজরত আলীর কাজের ঝি, মানে কাসিদ সাহেবের বাড়ির কাজের মেয়ে ময়নার মাকেও ও বাড়ি থেকে এ বাড়িতে পার করে আনা হোক। মর্জিনা খাতুনের সাথে ময়নার মাও থাকলে অন্দরের ঝুট-ঝামেলা নিয়ে আমাকে আর কিছুই ভাবতে হয় না।

কথা ধরলো অভিজ্ঞ লোক আজম শেখ। সে বললো– সে কি, সে কি! মরিয়ম বিবি শুধু নিজের অন্দর মহলের কথা ভাবছেন কেন? ও বাড়ির অন্দর মহলের কথাটাও তো ভাবতে হবে। বিয়ের বাড়ি তো শুধু এই একটাই নয়, ও বাড়িও বিয়ের বাড়ি। শাদি পড়ানোর পরে কাসিদ সাহেব বউ নিয়ে ও বাড়িতে যাবেন। অনেক লোকজনও সাথে যাবে সেখানে। তাদের আহার আপ্যায়ন, শোয়া-বসার ব্যবস্থা তো ঐ ময়নার মাকেই করতে হবে ওখানে। ও মেয়েও এখানে এলে ওদিক সামলাবে কে?

খান সাহেব বললেন– ঠিক ঠিক, একথাও ঠিক। ময়নার মাকে আনা যাবে না ও বাড়ি থেকে। হজরত আলী গিয়ে ঐ মেহের আলী আর মেহের আলীর বউকেই নিয়ে আসুক। মেহের আলীর বউ-এর সাথে প্রতিবেশী দু'একজন মেয়েকে ডেকে নিয়ে এখানকার অন্দরের কাজ চালিয়ে নিক মরিয়ম বিবি।

সেই কথাই হলো। খান সাহেবের নির্দেশে হজরত আলী ছুটলো মেহের আলীর বাড়ির দিকে।

মেহের আলীর বাড়িতে গিয়ে হজরত আলী এ প্রসঙ্গ তুললে যারপরনাই তাজ্জব হলো মেহের আলী ও মেহের আলীর বউ মর্জিনা খাতুন। মেহের আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– আরে, এই কয়দিন হলো ফিরে এলেন কাসিদ সাহেব। শুনলাম জেল টেলও নাকি খেটে এলেন তিনি। ঘরে ফিরে সুস্থির হয়ে না বসতেই শাদির আনজাম শুরু হয়ে গেল তাঁর?

হজরত আলী বললো– হ্যাঁ ভাই, তাই গেল। কনের দাদু খান সাহেবের শরীর

বইঘর ডট কম

ইতিমধ্যেই আবার একটু খারাপ হয়ে যাওয়ায় খুব শংকিত হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ধারণা, আর মোটেই বেশি দিন আয়ু নেই তাঁর। তাই তিনি তাড়াহুড়ো করে এই আনজাম শুরু করে দিয়েছেন।

মেহের আলীর বউ মর্জিনা খাতুন খোশকণ্ঠে বললো– আলহামদুলিল্লাহ! লায়লা বানু আপার বহু প্রতিক্ষিত শাদিটা তাহলে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে?

হজরত আলী বললো– হ্যাঁ ভাবী, হচ্ছে। পা'লেই হোক আর পরবেই হোক, খান সাহেবের অসুখের প্রেক্ষিতে শাদিটা এই তাড়াতাড়ি হচ্ছে।

মেহের আলী বললো– হোক, হোক। যে ঘটনার প্রেক্ষিতেই হোক না কেন, যে শাদিটা তাদের দীর্ঘদিন আগে হওয়ার কথা সেটা দীর্ঘদিন পরে এখন হচ্ছে, এটাই বা কম খুশীর কথা কি?

মর্জিনা খাতুন বললো– বটেই তো, বটেই তো। লায়লা বানু আপা এতে খুবই খুশী হয়েছেন– তাই নয় ছোট মিয়া?

হজরত আলী বললো– জি ভাবী, সেটা তো হওয়ারই কথা। তিনি আর বেঁচে নেই– এই খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথে লায়লা বানু আপা যেভাবে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন, তাতে সেই মরা মানুষ ফিরে আসায় আর কয়েক দিনের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত জনের সাথে শাদির আনজাম শুরু হওয়ায় আপার আনন্দের যে আর সীমার অবধি থাকবে না, এটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। গেলেই দেখতে পাবে।

: তাই কি?

জি, তাই। প্রকাশ করে বলার মতো কোন মেয়েছেলে কাছে না পেয়ে উনি আনন্দে একা একাই উঠবোস করছেন। দেখলে তো বুঝতে পারি সেটা। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপার তাগিদটাও বড় কম ছিল না ভাবী। তাড়াতাড়ি চলো। গেলেই দেখতে পাবে– তোমাকে কেমন তিনি ভাতে মাছে পান।

মেহের আলী বললো– আচ্ছা হজরত আলী ভাই, কাসিদ সাহেব যে জেলে আটক ছিলেন, শুধু একথাটা শুনেছি। কিন্তু কোথায় আর কেন আটক ছিলেন, তা কিছু জানি না। ঘটনা কি হজরত আলী ভাই?

হজরত আলী বললো– সে অনেক কথা। বলতে সময় লাগবে। তার চেয়ে বরং তৈরী হয়ে তোমরা তাড়াতাড়ি বেরোও, যেতে যেতে বলবো সব।

মেহের আলীদের নিয়ে হজরত আলী এসে হাজির হতেই লায়লা বানু ছুটে এসে বললো– এ্যাঁ! তোমরা এসেছো? কি আনন্দ, কি আনন্দ! এসো এসো, এসে সবাই বসো।

হজরত আলী বললো– আমি আর বসে কি করবো আপা? আমার তো অনেক কাজ আছে।

লায়লা বানু জোশের সাথে বললো– আরে গুলি মারো হজরত আলী। কাজের এখন গুলি মারো। কাজ তো সারাদিনই করবে। এখন এই মেহের আলী ভাইকে নিয়ে তুমি এই বারান্দায় একটু বসো। এক জায়গা থেকে এলে, একটু জিরোও। আমি এই মর্জিনা বহিনকে নিয়ে আমার ঘরে যাই।

হজরত আলী একটু রসিকতা করে বললো– শুধু আমরাই জিরোবো আপা, আপনার মর্জিনা বহিন জিরোবে না?

লায়লা বানু ঠেশ দিয়ে বললো– জিরোবে না তো কি বহিনকে নিয়ে আমি হাডু-ডু খেলবো? ঘরে গিয়েও জিরোনো যায়। এসো বহিন–

বলেই মর্জিনা খাতুনকে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে গেল লায়লা বানু। এরা এদিকে বসলো না জিরোলো, পেছন ফিরে সেটা আর দেখতে গেল না।

ঘরে এসে মর্জিনা খাতুন সহাস্যে বললো– খুব পুলকেই আছেন, তাই না আপা?

লায়লা বানুও সহাস্যে বললো– পুলকে? কেন কেন?

কেন আবার, মরা-গাঙে বান ডাকলো বলে। যে গাঙে শুধুই ধু-ধু বালি উড়লো এতদিন সেই গাঙ হঠাৎ করেই থৈ থৈ পানিতে ভরে গেল দেখে।

ইংগিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো লায়লা বানু। তাই সে আড় চোখে চেয়ে বললো– বটে!

ঠিক কিনা বলুন? কি অবস্থা ছিল আপনার কয়দিন আগে, আর আজ কি অবস্থা হয়েছে আপনার সেখানে। মরা গাছে শুধু পাতাই নয়, উপছে পড়ছে ফুলের বাহার।

: কি করে বুঝলে?

আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। তা কাসিদ সাহেব এসে হঠাৎ করেই হাজির হলো যখন, তখন তাঁকে দেখে কি অবস্থা হয়েছিল আপনার আপা? মূর্ছা টুর্চ্ছা যান নি তো?

কেন, মূর্ছা যাবো কেন?

আনন্দে। যিনি আর ইহদুনিয়ায় নেই ভেবে দুঃখে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, সেই লোক হঠাৎ করেই এসে চোখের সামনে দাঁড়ালেন যখন, আনন্দ হয়নি আপনার? বাঁধভাঙ্গা আনন্দ? এ অবস্থায় সবারই তো আনন্দ শুধুই ছলকায়। উথলে উঠে আনন্দ।

লায়লা বানু বললো– তা যা বলেছো বহিন। উনি এসেছেন উনাকে দেখেও আমি প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে যখন পারলাম, তখন কি যে আনন্দ হয়েছিল আমার তা বলে বুঝাতে পারবো না। সত্যি সত্যিই আনন্দে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা।

তার উপর আপনার দাদু যখন সঙ্গে সঙ্গেই এই শাদির আনজাম শুরু করলেন, তখন অবস্থাটা কেমন হলো?

লায়লা বানু হাসিমুখে বললো– বলবো? শরম না করে সত্যি কথাটা বলবো?

: হ্যাঁ, সত্যি কথাই তো বলবেন।

একদম 'সখী আমায় ধরো ধরো' অবস্থা। তখন পাশে তুমি থাকলে, তোমাকেই ধরে ঝুলে পড়তাম আমি।

: আমি তো ছিলাম না, কাকে ধরলেন?

: ধরলাম না, পড়ে গেলাম।

: পড়ে গেলেন! কোথায়?

: বিছানায়। বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম।

: সাব্বাশ! কয়দিন আগে বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিলেন দুঃখে, আর কয়দিন পড়ে এখন গড়াগড়ি দিলেন আনন্দে?

: একদম ঠিক।

তা বলছিলাম কি আপা, আনন্দে আপনার যখন 'সখী আমায় ধরো ধরো' অবস্থা হলো তখন কাউকে না ধরে বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দেয়া কেন?

: কাকে ধরবো? তুমি তো পাশে ছিলে না?

: কাসিদ সাহেব তো ছিলেন। পাশেই ছিলেন। তাঁকে ধরে ঝুলে পড়বেন।

: কি করে? আরো লোকজন তো পাশে ছিল। তারা থাকতে...

তাতে কি? ভাবেতে মজিলো মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম। চোখ বুঁজে

জড়িয়ে ধরলে, কাউকেই দেখা যেতো না।

মর্ অভাগী–

তেড়ে এলো লায়লা বানু আর দুইজনই একসাথে হেসে উঠলো সশব্দে।

শুনতে পেয়ে ছুটে এলো মর্জিনা বিবি। দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো– কৈ গো মর্জিনা বহিন, তুমি নাকি এলে? এসেই ফের লুকালে কোথায়? একটু বেরিয়ে এসো, তোমায় দেখি–

মর্জিনা খাতুন বললো– কে, মরিয়ম খালা? যাচ্ছি খালা, যাচ্ছি–

মরিয়ম বিবি বললো– না-না, যেও না, দাঁড়াও। 'তিলেক দাঁড়াও তোমায় দেখি।'

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো মরিয়ম বিবি। বলা বাহুল্য, পরবর্তী ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় যথাসময়ে সমাপ্ত হলো শাদির সকল আয়োজন। চলে এলো শাদির দিন। শাদির দিন বাদ জুম্মা সুসম্পন্ন হয়ে গেল কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের সাথে লায়লা বানুর শাদি মোবারক।

এতক্ষণ সব সময় আনন্দমুখর পরিবেশই ছিল। বিদায় নেয়ার সময় যখন কাসিদ সাহেব সস্ত্রীক খান সাহেবকে কদমবুচি করতে এলেন, তখন হু-হু করে কেঁদে ফেললেন খান সাহেব। বর্ষীয়ান আলেম আহমদুল্লাহ খান সাহেব কাঁদতে কাঁদতে বললেন– আমার একমাত্র সম্পদ আর অবলম্বন আপনাকে দিয়ে আজ আমি অবলম্বনহীন হয়ে গেলাম কাসিদ সাহেব, সম্পদহীন হয়ে গেলাম।

সস্ত্রীক কদমবুচি করে উঠে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– কেন মুরুব্বী, একথা বলছেন কেন?

লায়লা বানুকে এক হাতে কাছে টেনে নিয়ে খান সাহেব বললেন– স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবাই চলে যাওয়ার পর একমাত্র এই নাতনীটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিলাম আমি। সেই নাতনীটাকে আপনাকে দিয়ে দেয়ায় আমি একদম অসহায় হয়ে গেলাম। আমাকে আর দেখার কেউ রইলো না।

এ কথায় লায়লা বানু চোখ মুছতে লাগলো। কাসিদ সাহেব বললেন– কেন রইলো না মুরুব্বী? আপনার স্নেহধন্য ঐ আজম চাচা আর মরিয়ম খালা তো রইলোই আপনাকে দেখার জন্যে। বরাবর যেমন দেখেছে, এখনো তেমন দেখবে। আর তাছাড়া আপনার নাতনীও আপনাকে দেখবে।

খান সাহেব বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন– নাতনীও দেখবে মানে? নাতনী দেখবে কি করে? ওতো এখন থেকে তোমার বাড়িতে থাকবে।

শুধু আমার বাড়িতে কেন? দুইদিন আমার বাড়িতে থাকলে, বিশদিন আপনার বাড়িতে থাকবে।

না-না, তা কি করে হবে? তা কি করে হবে? আপনি তো আমার চেয়েও বড় এক এতিম। কোন সম্পদই নেই আপনার। স্বজনহীন সঙ্গীহীন আপনি। এতদিন কেউই ছিল না। ইদানিং ঐ হজরত আলী আর ময়নার মা-ই আপনার ভরসা। লায়লা বানুকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে আনলে, আপনি আবার যে এতিম সেই এতিম। আবার সঙ্গীহীন হয়ে যাবেন।

তা যদি মনে করেন, লায়লা বানুর সাথে আমিও এসে আপনার বাড়িতে থাকবো।

কাসিদ সাহেব!

হজরত আলী আর ময়নার মা-ই আমার বাড়িটা আগলে রাখবে। রাখলোও তো তারা এই কিছু দিন আগে। আমি মাঝে মধ্যে দুই একদিন গিয়ে বাড়িতে থাকবো আর এখানে এসে থাকবো বাদ বাকী সব দিন।

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে আপনি তাই থাকবেন কাসিদ সাহেব, তাই থাকবেন– তাই থাকবেন।

: উঁহু! 'থাকবেন' নয়। বলুন, 'থাকবে'।

: মানে?

আমি কওমের একজন সেপাই হেতু এ যাবত আমাকে 'আপনি আপনি' করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু এখন তো আমি শুধু কওমের সেপাই-ই নই, আপনার নাতজামাই। নাতজামাইকে কি কেউ 'আপনি আপনি' করে?

: তা বটে, তা বটে।

আমাকে আপনি এখন থেকে 'তুমি' বলবেন, 'তুমি'। আর কাসিদ সাহেব, কাসিদ সাহেব করবেন না। আমিও আর আপনাকে 'মুরুব্বী' বলে ডাকবো না। দাদু বলবো এখন থেকে। সেরেফ দাদু!

মারহাবা, মারহাবা!

খান সাহেবের বিষণ্ন মুখ খুশীতে রোশনাই হয়ে উঠলো।

নিজ বাড়িতে আসার অনেকক্ষণ পরে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব লায়লা বানুকে নিজ কক্ষে পেলেন। লোকজনের ভিড়ে তিনি এতক্ষণ লায়লা বানুর কাছে আসতেও পারেননি, তার সাথে কথা বলতেও পারেননি। এবার নিজ কক্ষে একা পেয়ে লায়লা বানুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি এবং সোহাগভরে বললেন– মন খারাপ হয়েছে?

জবাবে লায়লা বানু সলজ্জকণ্ঠে বলেলো– কেন, খারাপ হবে কেন?

ও বাড়ি ছেড়ে আসতে হলো বলে?

: তা না হলে আপনাকে পেতাম কি করে?

: তাই কি? তাই?

লায়লা বানু শরমে চোখ বুঁজে রইলো। কাসিদ সাহেব পীড়াপীড়ি করলে লায়লা বানু শরম ঝেড়ে ফেলে বললো– জি হুজুর, তাই।

কাসিদ সাহেব বললেন– আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা কি তাহলে বরাবরই ছিল তোমার?

: জি জনাব, বরাবরই বরাবরই। দেখার পর থেকেই।

: তাহলে খুশী হয়েছো, বলো?

হবো না মানে? আপনি আর ইহদুনিয়ায় নেই, আপনাকে আর পাবো না আমি– এই চিন্তা করে দুই চোখের পানিতে বুক ভেজালাম দীর্ঘদিন, আর আজ আপনাকে পেয়ে খুশী হবো না মানে? আজ খুশী না হলে আর খুশী হবো কবে?

: সাব্বাশ!

www.boighar.com

: আপনি খুশী হয়েছেন তো?

: মানে?

আমাকে শাদি করে কি আপনি খুশী হয়েছেন?

: যারপর নেই, যারপর নেই। এত খুশী জীবনে আর আমি কখনো হইনি।

: ভাঁড়াচ্ছেন না তো? ঠিক বলছেন?

: ঠিক–ঠিক–ঠিক।

www.boighar.com

এক নিমেষ থেমে লায়লা বানু বললো– একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কাসিদ সাহেব বললেন– বলো?

এত বেশি দর্শনধারী আপনি, এমন চিত্তহারী চেহারা, আপনাকে মনে ধরেনি আর কোন মেয়ের?

: তা তো আমি জানিনে। কেউ তো বলেনি আমাকে সে কথা।

তাই, তা এই যে এত দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ালেন আপনি, এর মধ্যে কোন মেয়েকে আপনার মনে ধরেনি?

: কাউকেই ধরেনি।

কেন ধরেনি?

চোখ তুলে কোন মেয়ের দিকে তাকাইনি বলে।

: কেন কারো মুখের দিকে তাকাননি?

: অন্য কারো মুখ আমি দেখবো না বলে।

: তাই? তা এমন ইচ্ছে কেন আপনার হলো?

একখান মুখ!

যে মুখের দিকে পয়লা তাকিয়েছিলাম, শুধু সেই মুখটাই দেখবো বলে হলো।

সে মুখ কার মুখ?

যার মুখ দেখতে চাই, তার মুখ।

কে সে?

: আমার বুকে মুখ লুকিয়ে আছে যে।

: অর্থাৎ?

এই যে এখন যাকে আমি আমার বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছি, সেই মেয়ে, আবার কে? একমাত্র সেই মেয়েকেই তো পাওয়ার আশায় ছিলাম আমি এতদিন।

সে মেয়েতো নদীতে ডুবে মরেই গিয়েছিল। যদি মরেই যেতো, তাহলে কোথায় পেতেন তাকে?

মরে গেলে সে মুখতো দেখতামও না, আর তাই কোন মুখ দেখার আশায় থাকতামও না। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে আনলাম বলেই তো দেখতে পেলাম সে মুখ আর একমাত্র সেই মুখটাই দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

খুশীতে ভরে গেল লায়লা বানুর অন্তর। বললো– সত্যি?

কাসিদ সাহেব বললেন– সত্যি-সত্যি-সত্যি। তিন সত্যি।

এই সময় 'কৈ, আপনারা কোথায় গেলেন', বলে ময়নার মা ডাকাডাকি শুরু করলে, চমকে উঠে তারা দুইজন ছিটকে গেলেন দুইদিকে আর অতঃপর হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

এইভাবে শুরু হলো লায়লা বানু আর কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের আনন্দঘন জীবন। কখনো এ বাড়িতে কখনো ওবাড়িতে মহানন্দে দিন কাটতে লাগলো তাঁদের। বেশ কিছুদিন গেল এইভাবে।

কিন্তু সব দিন একভাবে যায় না। কথায় বলে– 'ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?' অর্থাৎ শীত যদি আসে বসন্ত কি আর বেশি দূরে থাকতে পারে? এ কথাটা যেমন সত্যি, তেমন একথাও তো সত্যি যে বসন্ত যদি আসেই, যত দেরীতেই হোক, একদিন না একদিন শীত কি আর না এসে থাকে? সেই অবস্থা হলো এই নব দম্পতি কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব আর লায়লা বানুর জীবনেরও। বেশি দেরীতে নয়, হঠাৎ করেই তাঁরা পেলেন সেই শীতের পরশ।

হঠাৎ করেই আলেম আহমদুল্লাহ খান সাহেব আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর তাঁকে নিয়ে আবার শুরু হলো টানাটানি। অসুখ তাঁর ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগলো হেতু কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব আর লায়লা বানু ছুটে এলেন খান সাহেবের বাড়িতে আর খান সাহেবের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন। ছেদ পড়লো তাঁদের একটানা আনন্দে।

৭

খবর এলো ফটিক চান ফটকের কাছে। খবর পাঠালো তের নম্বর থানার এ.এস.আই. গ্যাট র‍্যাম সরকার, ওরফে গঙ্গা রাম সরকার। গঙ্গারাম সরকার খবর পাঠালো মুন্সী কাজী কাদেরের (ক্রেজী ক্যাডারের) কাছে। কাজী কাদেরের পিয়ন এসে খবর দিলো ফটকেকে। খবরটা হলো– ও.সি. ব্লাড সাকার (বাদল সরকার) বড় লাটের ডিউটি শেষে থানায় ফিরে এসেছে। ফটিক চান এখন থানায় গেলেই ও.সি. বাদল সরকারকে পাবে সেখানে।

খবর পেয়েই আনন্দে নেচে উঠে দৌড় দিল ফটকে। এক দৌড়ে চলে এলো থানায়। ও.সি.র কক্ষে ঢুকে এবার সে আগে চোখ তুলে দেখলো, ও.সি'র চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি বাদল সরকার কিনা। বাদল সরকারই সে চেয়ারে বসে আছে দেখেই ফটিক চান সোল্লাসে বলে উঠলো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! খবর আছে, জব্বোর খবর।

কাগজ থেকে মুখ তুলে বাদল সরকার বললো– জব্বোর খবর! আবার কোন খবর এনেছো?

: দুই নম্বর জিহাদীর খবর। জিহাদী নম্বর দুই।

: সে আবার কে?

আলেম আহমদুল্লাহ খান। মানিকচক বাজারের সেই বিখ্যাত আলেম আহমদুল্লাহ খানের খবর।

: তার কি খবর?

আপনি সেবার বলেছিলেন, এই আলেম আহমদুল্লাহ খান জিহাদ আন্দোলনের একজন সমর্থক। কত বড় সমর্থক, একবার তার বাড়িতে গিয়ে তা বুঝে উঠতে পারেন নি। বলেছিলেন না?

: হ্যাঁ, বলেছিলাম।

আপনি ভুল বলেছিলেন। আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

মানে?

: আমি একজন তুখোড় গোয়েন্দা। আমি ঠিক ধরে ফেলেছি।

: কি ধরে ফেলেছো?

ঐ আলেমটা জিহাদ আন্দোলনের শুধু সমর্থকই নয়, সে একজন ঘোর জিহাদী।

: ঘোর জিহাদী!

: একেবারে পয়লা কাতারের জিহাদী।

: কি করে বুঝলে?

: মিল দেখে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ঐ ভাই হওয়া মিল দেখে।

: কার সাথে ভাই হলো? মানে, কার সাথে মিল হলো?

ঐ ঘোড়েল জিহাদীর সাথে। আলেমটার মিল হলো, ডাকসেটে জিহাদী ঐ কাসিদ আহসান উল্লাহর সাথে।

: অর্থাৎ?

এক জিহাদী তার নাতনীর বিয়ে দিলো আর এক জিহাদীর সাথে। ঐ আলেমও একজন জিহাদী না হলে কাসিদ আহসান উল্লাহর মতো একজন ভয়ংকর জিহাদীর সাথে নাতনীর বিয়ে দিতো না।

: আচ্ছা!

ঐ বিয়ে দেয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি। একেই বলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এক জাতের মাল বলেই এই মিল হয়ে গেছে তাদের।

: তা কাসিদ আহসান উল্লাহ তো এখন আর কাসিদ বা জিহাদী কিছুই নেই। আগে কি ছিল তা সঠিক জানিনে। তা যা-ই থাক, এখন সে ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। সে কথা তো বলেছিই তোমাকে সেবার।

আজ্ঞে না, ছেড়ে দেয়নি। আরো আঁকড়ে ধরেছে। আমি সেবার আপনাকে বলিনি, সে আবার সীমান্তে গেছে?

: হ্যাঁ, বলেছিলেন।

কেউ গাজীর গীত শোনার জন্যে সীমান্তে যায় না। ও গীতটা এখানেই অনেকে গায়। সে সীমান্তে গিয়েছিল জিহাদের মূল ডেরায় যাওয়ার জন্যে। আমি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত আর তাই আমি নিঃসন্দেহ যে জিহাদের সাথে ঐ আহসান উল্লাহর এখনও পূর্ণ যোগাযোগ আছে। ঐ যোগাযোগটা ঠিক রাখার জন্যেই সে সীমান্তে গিয়েছিল।

: তারপর?

তারপর আবার কি? ঐ ঘোর জিহাদীর সাথে কুটুম্বিতা করা দেখেও কি বুঝতে পারছেন না, ঐ আলেমটাও জিহাদী।

: হুঁউঁ!

এ্যাকশান নিন। কাসিদটার বিরুদ্ধে এ্যাকশান না নিলেও, এই বুড়ো শয়তানটার বিরুদ্ধে এ্যাকশান নিন। নেবেন না?

নেবো। তবে তার আগে আমাকে খোঁজ নিতে হবে– তুমি যা বুঝেছো, তা ঠিক বুঝেছো কিনা। ঠিক হলে অবশ্যই এ্যাকশান নেবো।

নিন নিন, তাহলে খোঁজটা তাড়াতাড়ি নিন। নইলে কখন আবার লাপাত্তা হয়ে যায় ঐ শেয়াল ঘুঘুর ছাটা।

: ঠিক আছে। তাড়াতাড়িই খোঁজ নেবো। তুমি এখন যাও।

: ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! খোঁজ নিতে দেরী হলে আমি আবার আসবো কিন্তু।

: তা আসতে চাও, এসো। কিন্তু এখন যাও। আমি ব্যস্ত আছি।

চেয়ার থেকে উঠে গেল ব্লাড সাকার। তা দেখে ফ্যাটিগ চান ফটকেও বেরিয়ে এলো ব্লাড সাকারের কক্ষ থেকে।

আলেম আহমদুল্লাহ খান সাহেব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই অসুস্থ হয়ে পড়ার কয়দিনের মধ্যেই তিনি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রইলেন নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে। সকল অনুভূতিই লোপ পেলো তাঁর। শুধু নাভীটা নড়তে লাগলো মৃদু মৃদু।

এতে ফিরে আজরাইল এবার এসে বেশিক্ষণ গড়িমসি করলেন না বা ফিরে যাওয়ার কোন রকম চিন্তা-ভাবনায় গেলেন না। খান সাহেবের জানটা খপ করে কবজ করে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়লেন তিনি। রুগীর চারপাশে উপবিষ্ট লোকজন কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলেন না খান সাহেবের প্রাণ-পাখি কোন ফাঁকে উড়ে গেছে তাঁর দেহ পিঞ্জর থেকে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁরা লক্ষ করলেন খান সাহেবের নাভীটার নড়ন চড়ন বন্ধ হয়ে গেছে। স্থির হয়ে গেছে নাভীর মৃদু উঠানামা। তখনই তাঁরা বুঝতে পারলেন খান সাহেব আর নেই। সকল লেনাদেনা মিটিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেছেন ইহধাম ছেড়ে। তখন রোল উঠলো কান্নার।

আহমদুল্লাহ খান সাহেব ভোর রাতে ইন্তেকাল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ছুটে এলেন খান সাহেবের পড়শীরা, পরিচিত পরিজনেরা ও তাঁর অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা। বাড়ি ভরে গেল লোকজনে। এসে সবাই প্রথমে আহাজারী করলেন, এরপর সকলে অনেকক্ষণ যাবত দোয়া কালাম পড়লেন এবং সবশেষে খান সাহেবকে দাফন করার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

খান সাহেব ইন্তেকাল করলেন প্রত্যুষে। তাঁর দাফন কাফন সম্পন্ন করতে আসর ওয়াক্ত গড়িয়ে গেল। বাহির আঙ্গিনার সম্মুখস্থ পারিবারিক গোরস্তানে খান সাহেবকে দাফন করা হলো। দাফন ও দোয়া কালাম অন্তে বাইরের লোকজন একে একে সকলেই চলে গেলেন নিজ নিজ গন্তব্যে। আর খান সাহেবের বাড়ির লোকজন আত্মীয় পরিজনেরা চলে এলেন অন্দর মহলে। শোকে মুহ্যমান সকলেই।

সবার পেছনে পেছনে এলো হজরত আলীর বর্গাদার মেহের আলী। গোরস্তানের বেড়াটা ঠিক ঠাক করে দিয়ে সবার পরে সে এলো গোরস্তান থেকে। অতঃপর অন্দরের দিকে আসতেই হৈ হৈ করে দহলিজের সামনে এসে দাঁড়ালো তের নম্বর থানার ও.সি. বাদল সরকার ওরফে ব্লাড সাকার। সঙ্গে তার এক পাল সেপাই। মেহের আলীকে অন্দরের দিকে যেতে দেখে বাদল সরকার তাকে ডাক দিলো– এই, শোনো শোনো...

ঘুরে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় এক পুলিশ বাহিনী দেখে মেহের আলী থতমত খেয়ে গেলো। এক পা, দু'পা করে কাছে এসে বললো– আপনারা?

বাদল সরকার বললো– আমি এই থানার বড় দারোগা। তুমি কি এই বাড়ির লোক?

: না, ঠিক এই বাড়ির নই, আপাতত এই বাড়িতে আছি।

: ও আচ্ছা। তা আলেম আহমদুল্লাহ খান কি বাড়িতে আছে?

যার পর নেই বিস্মিত হলো মেহের আলী। ঢোক টিপে বললো– মানে?

মানে টানের দরকার নেই। যা বলছি, তার উত্তর দাও। সে কি বাড়িতে আছে? থাকলে তাকে ডেকে দাও।

কেন বলুন তো?

ফের কেন! তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

বইঘর ও রোকন্ম

: গ্রেপ্তার?

হ্যাঁ, গ্রেপ্তার। কথাটা কি বুঝো না? একবার এসে পাত্তা লাগাতে পারিনি। এবার আর ছেড়ে কথা নেই।

বলেই বাদল সরকার তার সেপাইদের উদ্দেশ্য করে বললো– এই, তোমরা সবাই বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলো। কোনক্রমেই সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

মেহের আলী শোকে কাতর ছিল। দারোগার কারবার দেখে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– তার আর দরকার নেই।

বাদল সরকার বললো– কি দরকার নেই?

এই বাড়ি ঘিরে ফেলার।

: কি রকম?

: আপনি এই থানার বড় দারোগা?

: হ্যাঁ।

: খান সাহেবকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন?

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, গ্রেপ্তার করতে। শুনতে পাও না?

বেশ, এবার বাড়িতে ফিরে যান।

বাদল সরকার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– খবরদার! ফিরে যাবো মানে?

মানে, আপনার চেয়েও যিনি বড় দারোগা তিনি খান সাহেবকে অনেক আগেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন।

: হোয়াট! আমার চেয়েও বড় দারোগা মানে?

: আপনার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণে, কোটি কোটি গুণে বড় দারোগা।

: শাট আপ! কে সে?

: আজরাইল।

: আজরাইল!

মেহের আলী রুদ্ধকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, আজরাইল। আজরাইল অনেক আগেই তাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন।

বাদল সরকার থমকে গিয়ে বললো– কি বলছো পাগলের মতো!

কি বলছি তা বুঝতে পারছেন না? খান সাহেব আজ ভোর রাতে ইন্তেকাল করেছেন। ঐ দেখুন তাঁর কবর।

মেহের আলী কবরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেন। বাদল সরকার এবার থতমত করে বললো– সেকি সেকি!

মেহের আলী শ্লেষের সাথে বললো– আর সেকি! মুরোদ থাকলে, ঐ আজরাইলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করুন গে, যান। এখানে গোলমাল করবেন না। আমরা বড় দুঃখে আছি।

শাট আপ! আমাকে উপহাস? দেখাচ্ছি মজা। এই বাড়ির লোক কে আছে, ডাকো।

: বাড়ির লোক?

: হ্যাঁ, এই বাড়ির লোক। তুমি তো এই বাড়ির লোক নও। এই বাড়ির লোক কে আছে, তাকে ডাকো, জলদি! নইলে অন্দর মহলে ঢুকে পড়বো আমরা।

অন্দর মহলে ঢুকে পড়বেন?

: তবে রে! ডাকো, ডাকো শিগগির–

হান্টার হাতে তেড়ে এলো বাদল সরকার। মেহের আলী চমকে উঠে বললো– জি, জি ডাকছি...

দৌড় দিলো মেহের আলী। বাড়ির লোক বলতে আজম শেখ এখন এই বাড়ির একমাত্র পুরুষ মানুষ। মেহের আলী তাই বাড়ির ভেতর এসে আজম শেখকে পাঠিয়ে দিলো।

'কি ব্যাপার! কি ব্যাপার' বলতে বলতে আজম শেখ বাইরে ছুটে এলো। আজম শেখকে দেখেই বাদল সরকার সোল্লাসে বলে উঠলো– ইউরেকা। এই সেই আসল লোক পেয়েছি। তুমি এই বাড়ির সেই দেখভাল করা লোক নও?

মানে আহমদুল্লাহ খানের মুখপাত্র?

পুলিশ দেখে আজম শেখ বিস্মিত কণ্ঠে বললো– জি জি, কিন্তু কেন, বলুন তো?

খান কৈ? আলেম আহমদুল্লাহ খান?

সেকি! আজ ভোর রাতে উনি ইন্তেকাল করেছেন। সে কথা এখনো শুনেননি?

: হ্যাঁ, এইমাত্র শুনলাম। সে ইন্তেকাল করেছে, বেঁচে গেছে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কথা নেই। তোমাকেই এবার গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবো।

: আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন? কেন?

: তুমি আমকে ধোকা দিয়েছো। সেবার ডাঁহা মিথ্যা কথা বলেছো তুমি।

: মিথ্যা কথা! কি মিথ্যা কথা বলেছিলাম?

: তুমি বলোনি, মুজাহিদ আর অর্থ নিয়ে আহমদুল্লাহ খান জিহাদ আন্দোলনের মূল ঘাঁটি ঐ সীমান্তে কখনো যায়নি? তুমি তা দেখোনি? তুমি বলোনি একথা?

: জি বলেছিলাম। এসব নিয়ে ওখানে উনি কখনো যাননি।

খবরদার! মিথ্যা কথা বলবে না! সে কি ওখানে রেগুলার অর্থকড়ি পাঠাতো না?

পাঠাতে পারেন। এর ওর হাত দিয়ে পাঠাতে পারেন। কিন্তু অর্থ নিয়ে তাঁকে সীমান্তে যেতে আমি কখনো দেখিনি।

: তবে? অর্থ পাঠাতো, সে কথা তখন স্বীকার করোনি কেন?

আপনি তো সে প্রশ্ন আমাকে করেননি। উনি সীমান্তে যেতেন কিনা– শুধু এই প্রশ্ন করেছিলেন। আমি উনাকে সীমান্তে যেতে কখনো দেখিনি– এই জবাব দিয়েছিলাম। আজও আমি সেই কথাই বলবো।

তবু তুমি ধোকা দিয়েছো আমাকে। আমি গভীরভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই আহমদুল্লাহ খান বরাবরই একজন জিহাদ আন্দোলনের লোক। শুধু সমর্থকই নয়, সে অর্থকড়ি পাঠানো সমর্থক। কিন্তু তুমি একথা চেপে গেছো।

: আপনি যদি সরাসরি এই প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমার চেপে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতো না। তা যাক সে কথা। আপনি এখন কি করতে চান?

: তোমাকে গ্রেপ্তার করবো আমি।

: আমার অপরাধ? আমাকেও কি জিহাদী মনে করেন আপনারা?

: সরাসরি জিহাদী না হলেও জিহাদীদের বাড়িতে নকরী করো তুমি।

নকরী করার প্রয়োজনে নকরী করি। সেটাও যদি অপরাধ হয়, তাহলে গ্রেপ্তার করতে পারেন আমাকে। আমার কিছু বলার নেই। তবে...

: তবে?

এই নিদারুণ শোকের সময় এই বাড়িটা বিরান হয়ে যাবে। বাড়িটায় আর

বইঘর ও রোকন
কাজের লোক কেউ থাকবে না। লঘু পাপে এঁদের গুরুদণ্ড দিতে চান, দিন।

বটে। তাহলে ডাকো, আহমদুল্লাহ খানের পরে এই বাড়ির মালিক আর কে আছে ডাকো। তাদের মতিগতি কি, সেটা আমার জানা দরকার।

: তা, এই বাড়ির মালিক, মানে...

আজম শেখ এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসে অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। বাদল সরকারের এই কথার প্রেক্ষিতে তিনি এগিয়ে এসে বললেন– আপনি এই বাড়ির মালিককে চান?

বাদল সরকার বললো– হ্যাঁ চাই। কিন্তু আপনি? অপূর্ব কান্তির এক সৌম্য মূর্তি দেখে বাদল সরকার একটু থমকে গেল। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– আমি খান সাহেবের নাত জামাই।

শুনেই বাদল সরকার সরবে বলে উঠলো– আই সি, আই সি। আপনিই সেই লোক? মানে আপনিই সেই কাসিদ আহসান উল্লাহ?

হ্যাঁ, আমিই আহসান উল্লাহ।

শুধু আহসান উল্লাহ নন, কাসিদ আহসান উল্লাহ, জিহাদী আহসান উল্লাহ।

: আগে ছিলাম। এখন আর নই।

নই মানে? আমি আগে তাই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম আপনি আর তা নন। কিন্তু এখন যা শুনছি, তাতে আপনি এখনও একজন কাসিদ আর জিহাদী। জিহাদ আন্দোলনের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে আপনার।

ক্লিষ্ট হাসি হেসে আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– জিহাদী আন্দোলন আর সেখানে নেই। অস্তিত্বই যার অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে কিসেরই বা কাসিদ আর কিসেরই বা জিহাদী।

সে কি! জিহাদ আন্দোলন বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

সেটা তো আপনাদেরই ভাল জানার কথা। আজাদী যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার পর সে আন্দোলন আর সংগঠন যে এখন নেই– এটা কি আপনাদের অজানা?

: তা নয়। কিন্তু ইংরেজ বিরোধী লোক তো এখনও অনেক আছে এদেশে।

আছে আর থাকবেও। অনেক আঘাত পাওয়ার কারণেই এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ কেউ না ঘটালে, শুধু অন্তরের এই অনুভূতির কারণেই কি সাজা দেয়া যায় তাকে?

তা না গেলেও, কে কখন আর কোনভাবে এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, তার ঠিক কি? কাজেই আপনার সাথে এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। খান সাহেবের পুত্র কারা আছে, তাদের ডাকুন।

: তাঁর কোন পুত্র নেই।

পৌত্র? পৌত্রকে ডাকুন!

: না, তাঁর কোন পৌত্রও নেই। শুধু পৌত্রী, অর্থাৎ এক নাতনী আছে।

বাদল সরকার উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললো– মাই গড। পৌত্রী কোন ওয়ারিশই নয়। এটা তো দেখছি একদম 'ডকট্রিন অফ ল্যাপস'-এর ব্যাপার। স্বত্ববিলোপের কেস।

স্বত্ব বিলোপের কেস!

হান্ড্রেড পারসেন্ট স্বত্ব বিলোপের কেস। স্বত্ব বিলোপনীতির ব্যাপার। মৃত আহমদুল্লাহ খানের এই বাড়িঘর আর বিষয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আর কেউ নেই। তার সব কিছুর মালিক এখন এই ইংরেজ সরকার। ভেরী গুড ভেরী গুড।

খুশীতে দুলতে লাগলো বাদল সরকার। আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– তা যদি হয়েই থাকে, সেটা পরে দেখা যাবে। আইন কি বলে, খোঁজ নিয়ে দেখবো আমরা। মরহুমের আপন নাতনী, অর্থাৎ তার আপন ছেলের আপন কন্যা জীবিত থাকতে তাঁর সব কিছু কি করে 'ডকট্রিন অফ ল্যাপস'-এর আওতায় পড়ে, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখবো। আপনারা এখন যান।

তেড়িয়া হয়ে উঠে বাদল সরকার বললো– কি বললেন? এখন যাবো? আইন খুঁজে দেখবেন? সরকারের পুলিশ যা বলবে, সেইটেই আইন। আমি বলছি তো, এই বাড়িঘর আর বিষয় সম্পত্তির মালিক এখন সরকার। সরকারের সম্পত্তি অন্যের অধিকারে ফেলে রেখে যাবো আমরা? হরগিজ নেহি। বাজেয়াপ্ত করে তবে যাবো।

কাসিদ সাহেব বললেন– বাজেয়াপ্ত করবেন মানে?

মানে, এই বাড়িঘরে এখনই তালা ঝুলাবো।

আদালতের নির্দেশ ছাড়াই? আদালতের নির্দেশ নিয়ে আসুন, তারপর তালা ঝুলান। দেশে তো আইন-কানুন আছে কিছু। আদালতের বিনা নির্দেশে তালা ঝুলালে, আদালতে যেতে বাধ্য হবো আমরা। তখন কিন্তু জবরদস্তির দায়ে ফেঁসে যাবেন আপনি।

বটে!

জি-হা। ইংরেজ সরকারের আইন তো আমিও কিছু জানি। কোন পুলিশ ইংরেজ সরকারের আইনের উর্ধ্বে নয়।

অলরাইট। তিন দিনের মধ্যেই, উইদিন থ্রি ডেজ, আমাদের আদালতের সেই নির্দেশ নিয়ে আসবো আমি। আমি যা বলবো, আদালত কখনো তার বাইরে যাবে না। তখন যাকেই আপনাদের এ বাড়িতে দেখি, তাকেই আমি গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে 'লক আপ' এ তুলবো।

লক আপে তুলবেন?

শুধু 'লক আপ'-এ তুলবোই না। হান্টারের পর হান্টার মেরে তার হাড়গোড় ভেংগে ফেলবো আমি।

কি তাজ্জব! এতটাই নির্মম হবেন আপনি? মানবতা বোধ বলে কি আপনার কিছুই থাকবে না?

ড্যাম ইওর মানবতা। আমার ইংরেজ স্যারেরা আমাকে বাদল সরকার বলেন না। বলেন– ব্লাড সাকার। ব্লাড সাকার মানে বোঝেন? মানেটা হলো, রক্তচোষা। আমি অবাধ্যদের রক্ত চুষে চুষে খাই। তিনদিন পরে এসে এখানে পেলে আপনাদের প্রত্যেকের ব্লাড আমি সাক করবো। প্রত্যেকের রক্ত চুষে চুষে খাবো। আমাকে আইন দেখাচ্ছেন?

–বলেই বাদল সরকার তার সেপাইদের বললো– এই, চলো সবাই। এখন আমরা ফিরে যাই, চলো। তিন দিন পরে আবার আসবো আমরা। আইন কাকে বলে, তা দেখিয়ে দেবো। এখন চলো–

সেপাইদেরে নিয়ে দুমদাম পাদক্ষেপে চলে গেল ও.সি. বাদল সরকার, ওরফে ব্লাড সাকার জীবটা।

www.boighar.com

বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনে বাড়ির মেয়ে ছেলেরা সকলেই অন্দর মহলের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছিলো। পুলিশেরা চলে যাওয়ার পর কাসিদ সাহেব অন্দরে ফিরে আসতেই তাঁকে ঘিরে ধরলো সবাই। লায়লা বানু শশব্যস্তে প্রশ্ন করলো– কি বললো? কি বললো পুলিশ? বাড়িতে তালা ঝুলাবে নাকি?

www.boighar.com

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ। এখনই ঝুলাতে চেয়েছিল। আদালতের নির্দেশ আনতে বলায়, এখন ফিরে গেল। তিন দিন পর আবার আসবে।

: আবার আসবে তালা ঝুলাতে?

: হ্যাঁ, তালা ঝুলাতে।

কেন, তালা ঝুলাবে কেন?

সে অনেক কথা। তাদের ভাষায় দাদু সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর এই বাড়ি ঘরের আর বিষয় সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ নেই। ওয়ারিশহীন হয়ে গেছে। এসবের মালিক এখন ইংরেজ সরকার। ইংরেজ সরকারের সম্পত্তি। তাই দাদুর সব কিছু বাজেয়াপ্ত করবে পুলিশ আর তালা ঝুলাবে এই বাড়ি-ঘরে।

তার মানে– তার মানে! ওয়ারিশ নেই কি রকম? আপনি বলেন নি, আমি বিদ্যমান আছি? আমি দাদুর আপন নাতনী?

বলেছি। কিন্তু তাদের কথা– নাতনী কোন ওয়ারিশ নয়। তাই, ওয়ারিশ না থাকায় দাদুর সব কিছু স্বত্ব বিলোপ নীতিতে পড়েছে; আর সে নীতি অনুযায়ী দাদুর সব কিছুর মালিক এখন ইংরেজ সরকার।

বললেই হলো? তাঁর আপন নাতনী জীবিত থাকতে তার সব কিছু কি ওয়ারিশহীন হয় কখনো?

হয়। ওয়ারিশহীন বললেই ওয়ারিশহীন হয়।

: বললেই হয়? বলার কোন যুক্তি অজুহাত নেই?

থাকবে না কেন? 'তুই ঘোলাসনি তোর বাপ ঘোলিয়েছে'– এ রকম অজুহাত তাদের সব সময়ই আছে।

: মানে, কথাটা বুঝলাম না তো?

কথাটা হলো, জোর যার মুল্লুক তার। গায়ে শক্তি থাকলে সব অজুহাতই মোক্ষম অজুহাত। তার উপর আর কোন অজুহাত লাগে না।

: তাও বুঝলাম না। কি বোঝাতে চান, খুলে বলুন।

ব্যাপারটা হলো– ঐ বাঘ আর ছাগলের পানি পান করার গল্পের মতো। একটা ছাগল নদীর স্রোতে ভাটিতে নেমে পানি পান করছে আর একটা বাঘ পানি পান করছে স্রোতের উজানে। ছাগলটাকে খেতে চায় বাঘ। তাই সে একটা অজুহাত খাড়া করলো। বললো– এই ব্যাটা ছাগল, আমি পানি পান করছি দেখেও তুই পানি ঘোলালি কেন? আমি তোকে খাবো। ছাগলটা সবিনয়ে বললো– আমি কি করে আপনার পানি ঘোলালাম হুজুর? আমি পানি

বইঘর ও রোকন
খাচ্ছি স্রোতের ভাটিতে আর আপনি পানি খাচ্ছেন স্রোতের উজানে। আমি আপনার পানি ঘোলালাম কি করে? বাঘটা গর্জে উঠে বললো– তুই ঘোলাসনি, তোর বাপ ঘোলিয়েছে। আমি তোকে খাবো।

গল্প শেষ করে কাসিদ সাহেব বললেন– এই হলো বাঘটার অজুহাত।

শুনে লায়লা বানু বিস্মিত কণ্ঠে বললো– তার মানে, তার মানে? এটা কোন অজুহাত হলো?

কাসিদ সাহেব বললেন– কেন হবে না? এটা যে শক্তিমানের অজুহাত। এদেশে সর্বশক্তির মালিক এখন ইংরেজ। তাই ইংরেজের পুলিশ চায়– দাদুর বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে। অজুহাত একটা দেখানো দরকার, তাই বলে দিলো তার বিষয়-সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ না থাকায় এসব স্বত্ববিলোপ নীতিতে পড়েছে। এগুলো বাজেয়াপ্ত করবো।

তারপর?

আমি যতই বলি, ওয়ারিশ আছে, তাঁর আপন নাতনী আছে, কিন্তু সে কথা শুনলে তো?

দারোগা বললো– নাতনী কোন ওয়ারিশ নয়। আমি সব কিছু বাজেয়াপ্ত করবো আর এখন ঘরদোরে তালা ঝুলাবো।

: কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য!

আমি আদালতের নির্দেশের কথা বলায়, দারোগাটা সক্রোধে চলে গেল। বলে গেল, তিন দিনের মধ্যেই সে আদালতের নির্দেশ হাতে আবার আসবে।

লায়লা বানু এবার স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তা বলুক। আর আসবে না। আপদ গেছে।

কাসিদ সাহেব বললেন– কি করে বুঝলে?

লায়লা বানু বললো– আদালতের নির্দেশ সে পাবে না। আদালত তো পুলিশের অধীন নয়। বেআইনী আদেশ আদালত দেবে না।

দেবে। চাহিবামাত্র দেবে। পুলিশ যেটা বলবে, সেটাই আইন।

সেটাই আইন।

পুলিশের ৰক্তব্যের উপরই বিচার হয় এদেশে। পুলিশের কথাতেই এদেশের আদালত চলে। আদালত অনেকটা পুলিশেরই অধীন। কাজেই বলামাত্র সে নির্দেশপত্র পুলিশকে দিয়ে দেবে আদালত।

সে কি! আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিত?

একশোভাগ নিশ্চিত। তিন দিনের মধ্যেই নির্দেশ নিয়ে চলে আসবে পুলিশ। তার আগেও আসতে পারে।

: আগেও আসতে পারে?

জরুর আসতে পারে। ইংরেজদের কিছুটা তর সইলেও, তাদের এদেশী গোলামদের তর সইবে না।

সবাই এবার অসহায় কণ্ঠে বললো– এখন তাহলে?

কাসিদ সাহেব বললেন– পালাতে হবে আমাদের। তিনদিনের মধ্যেই অর্থাৎ পুলিশ আসার আগেই পালাতে হবে আমাদের– এবার এসে পুলিশ যদি আমাদের এ বাড়িতে পায়, তাহলে আমাদের জান ফানাহ হয়ে যাবে। তাদের ফিরিয়ে দেয়ার রাগে তারা আমাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাবে। মেয়েদের মান–সম্মান ইজ্জত কিছুই থাকবে না। মেয়েদের মান ইজ্জত নিয়ে তারা পশুর মতো আচরণ করবে।

মরিয়ম বিবি আর লায়লা বানু শংকিত কণ্ঠে বললো– তাহলে কি করবো আমরা এখন?

ঐ যে বললাম, পালাতে হবে। এ বাড়ি ত্যাগ করে আমার বাড়িতে পার হতে হবে সবাইকে। মোটামুটি জিনিস পত্রাদি নিয়ে আগামী কাল সকালেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে আমাদের।

লায়লা বানু বললো– আগামীকাল সকালেই?

কাসিদ সাহেব বললেন– আগামীকাল সকালেই। আজকের রাতটাও যে একেবারেই নিরাপদ তা নয়। ইংরেজদের সেবাদাস এ দেশের এইসব লোকেরা ইংরেজদের চেয়েও ভয়ংকর। বিষধর সাপের চেয়েও এরা হিংস্র আর ক্রূর। হঠাৎ করেই কখন যে এসে হাজির হবে, তার ঠিক নেই। আল্লাহ আল্লাহ করে এই রাতটা কাটানোর পর আর এক দণ্ডও নয়। সকালেই এ বাড়ি ত্যাগ করতে হবে আমাদের। ইতরদের হাতে মান ইজ্জত তুলে দেয়া যাবে না। এখন থেকেই সব কিছু গুছিয়ে নেয়া শুরু করো।

হু হু করে কেঁদে উঠলো অনেকেই। কাসিদ সাহেব বললেন– দুঃখ আহাজারী যা কিছু করার আছে আর দোয়া-কালাম যা কিছু পড়ার আছে, সব ঐ বাড়িতে গিয়ে এখানে বন্ধ করো এসব।

সকালে উঠে সব কিছু গুছিয়ে নিতে গড়িমসি করতে লাগলো সবাই। তা দেখে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তাড়া দিয়ে বললেন– কি হলো? গড়িমসি করছো কেন তোমরা? হাত চালাও, হাত চালাও...

মরিয়ম বিবি বললো– তাতো চালাবো, কিন্তু এইসব খাটচৌকি-চেয়ার বেঞ্চি– এসব গোছাবো কি করে?

কাসিদ সাহেব বললেন– ওসব গুছাতে হবে না। ওসব এখানেই থাকবে।

এখানেই থাকবে?

হ্যাঁ খালা। খুন্তি বটি, তলায় কালি পড়া কড়াই-পাতিল থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছু এখানেই থাকবে। নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলিই গুছিয়ে নাও জলদি।

আজম শেখ বললো– কিন্তু বাপজান, অতসব মূল্যবান আসবাবপত্র, এগুলি সবই রেখে যাবো এখানে?

কাসিদ সাহেব বললেন– তাই যাবে চাচা। এর চেয়েও মূল্যবান অনেক আসবাবপত্র আমার বাড়িতে প্রায় ঠাশাঠাশি করেই আছে। এগুলোর দরকার নেই। এগুলোতে ঝামেলাই বাড়বে শুধু।

: তা মানে–

চাচা, বাঘে ছু'লে তিন ঘা আর পুলিশে ছুলে তিন ছয় আঠারো ঘা। যা আমাদের নয়, তা নিয়ে গেলে চুরির দায়ে পুলিশ ওবাড়িতে গিয়েও হানা দেবে...

: আমাদের নয়? এ বাড়ির সব কিছু–

না নয়। গতকাল শুনলে কি? মরহুম দাদুর কোন ওয়ারিশ নেই, তাই এগুলোর আর কোন মালিক নেই। এগুলো সব সরকারের সম্পত্তি। সরকারের সম্পত্তি আমরা নিয়ে গেলে সেটা চুরি করা হবে না?

: তাজ্জব। মালিক নেই মানে। হুজুরের নিজের নাতনী থাকতে...

আহ চাচা! খামাখা এক প্রশ্ন বারবার টানবে নাতো! পুলিশ বলেছে কোন ওয়ারিশ নেই, ব্যস নেই। ওরা গায়ের জোরে যা বলবে সেইটেই মানতে হবে। নইলে চরম বিপদ আছে।

: বাপজান!

ফের বাপজান! কথা না বাড়িয়ে হাত চালাও। আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এখান থেকে সরে পড়তে চাই। বুঝেছো?

সেই কথাই হলো। আধা ঘণ্টার মধ্যেই পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সবাই এ বাড়ি ত্যাগ করে ওবাড়িতে চলে গেল।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়িতে এসে বাড়ি দেখে তাজ্জব হয়ে গেল মেহের আলীর বউ মর্জিনা খাতুন। সে গালে হাত দিয়ে বললো– মাগো মা, কি আজব কথা গো! এটা তো সত্যি সত্যিই একটা রাজবাড়ি। আমরা শুনেছিলাম রাজবাড়ির মতো একটা বাড়িতে এসে থাকছে আমার এই ছোট মিয়া হজরত আলী ভাই। কিন্তু রাজবাড়ির মতো তো নয়, একেবারেই রাজবাড়ি। কি খোশনসীব ছোট মিয়ার! এমন একটা বাড়িতে থাকতে পাওয়াটা কি কম ভাগ্যের কথা?

শুনে হজরত আলী হাসি মুখে বললো– তোমরাও আসো না কেন ভাবী, তোমরাও এসে থাকো এখানে। বিশাল বাড়ি, অনেক ঘরদুয়ার। তোমরাও এসে থাকলে ভাইজান খুবই খুশী হবেন।

: তাই?

হ্যাঁ, ভাবী। লোকজনের অভাবে এ বাড়িটা দীর্ঘদিন ঢন ঢন করেছে। এখনও প্রায় ঢনঢন করবে। আপামণিরা তিনজন আর ময়নার মা আর আমি– এই দুইজন। এতে বাড়িটা ভরবে না। তোমরা দুইজন এলে তবু কিছুটা ভরবে।

কাসিদ সাহেব বললেন– ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে! হজরত আলী ঠিক বলেছে। তোমরাও চলে এসো ভাবী।

মর্জিনা খাতুন বললো– আমরাও আসবো? কেন ভাইজান? আমাদের তো বাড়ি আছে। আমাদের বাড়ি তো হাতছাড়া হয়ে যায়নি। আমরা আসবো কেন?

জবাব দিল হজরত আলী। বললো– ওবাড়ি তো কাঁচা বাড়ি ভাবী। এটা পাকা বাড়ি। পাকা বাড়িতে এসে থাকবে।

এবার কথা ধরলো মেহের আলী। বললো– না হজরত আলী ভাই, কাঁচা বাড়ি হলেও ওটা আমার নিজের বাড়ি। পাকা বাড়ি হলেও এটা অন্যের বাড়ি। অন্যের পাকা বাড়ির চেয়ে নিজের কাঁচাবাড়ি অনেক বেশি আরামদায়ক আর স্বস্তিপূর্ণ। ঐ যে কথায় আছে– 'হোক পাকা তবু ওটা অপরের বাসা, নিজ

হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।'

হাসতে লাগলো মেহের আলী। কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হলেন কাসিদ সাহেব। বললেন– আমাকে এতটাই পর মনে করলে মেহের মিয়া?

মেহের আলী বললো– মানে?

: আমার বাড়িতে আসতে তাই মন চাইলো না তোমার!

মেহের আলী চমকে উঠে বললো– তওবা-তওবা! একি বলছেন ভাইজান! ছিঃ ছিঃ, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে আমরা একান্তই আপনজন মনে করি। আর কতটা আপন মনে করি তা আপনিও বোঝেন। আপনার বাড়িতে আসতে মন চাইলো না, অর্থাৎ আপনার বাড়িতে আসবো না মানে? একশো বার আসবো। মাঝে মাঝেই আসবো। পরবে অনুষ্ঠানে তো আসবোই, এছাড়াও সময় পেলে যখন তখন আসবো। আসবো আর কয়েকদিন থেকে থেকে যাবো।

কাসিদ সাহেব খুশী হলেন। বললেন– বেশ বেশ, তাহলেই আমি খুশী মেহের মিয়া। তাহলেই আমি যথেষ্ট তৃপ্তিবোধ করবো।

মেহের আলী বললো– আচ্ছা ভাইজান, আচ্ছা। এবার যাই, জিনিসপত্রগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে দেই। এসো মর্জিনা বিবি, ময়নার মায়ের সাথে আমরাও হাত লাগাই গিয়ে, চলো...

এই সময় খবর এলো একটু আগে পুলিশ এসে ওবাড়িতে আদালতের নোটিশসহ তালা ঝুলিয়ে গেছে।

শুনেই কাসিদ সাহেব সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন– দেখেছো, দেখেছো, আমার কথা ফললো কি না, দেখেছো? আজকের সারাদিন নয়, শুধু গোটা এই বেলাটা ওখানে থাকলে কি বিপদে পড়তে হতো দেখেছো? সুখ শান্তি, সাধ আহলাদ সব ধুলোয় মিশে যেত।

সবাই সমস্বরে বললো– সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! আপনার কথা শুনে বড়ই বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা। আজকের দিনটা ওখানেই বসে আমরা দোয়া-কালাম পড়তে চেয়েছিলাম। ভাগ্যে আপনি তাড়া দিয়েছিলেন। নইলে কি দুরবস্থায় যে পড়তে হতো আমাদের!

কাসিদ সাহেব বললেন– দোয়া কালাম যা পড়ার এখানে বসে এবার তা নিরাপদে পড়ো। মরহুমের তামদারী কুলখানি যা করার এখানে থেকেই করবো আমরা।

এরপর মেহের মিয়াদের উদ্দেশ্য করে বললেন– মেহের ভাই, মর্জিনা ভাবী, কুলখানিতক তোমাদের কিন্তু এখানেই থাকতে হবে। কুলখানি শেষ করে তবে তোমরা বাড়িতে ফিরে যাবে।

মেহের আলী বর-বউ দুইজন খোশকণ্ঠে বললো– রাজী, রাজী।

যথা সময়ে হয়ে গেল কুলখানি। বাড়িতে ফিরে গেল মেহের আলীরা। মাস দেড়েক পরেই হজরত আলীর ডাকে আবার তারা এ বাড়িতে এলো।

লায়লা বানুর শাদির প্রায় চারমাস গত হয়ে গেছে। এই চার মাসের শেষের দিকে লায়লা বানু অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে মাঝে মাঝেই বমন করা শুরু করলো আর অরুচিতে ভুগতে লাগলো। একদিন এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার কালে মাথা ঘুরে পড়ে গেল লায়লা বানু। হজরত আলী গিয়ে খবর দিতেই ছুটে এলো মর্জিনারা। এসে দেখেই তারা বিষয়টা বুঝতে পারলো। হাসিমুখে জানালো, লায়লা বানু মা হতে চলেছে। হেকিম এসে দেখেও ঐ একই কথা বললেন। বললেন, এখন সাবধানে চলাফেরা করতে হবে লায়লা বানুকে। নিয়মিত বিশ্রাম নিতে হবে আর পুষ্টিকর খানা খেতে হবে।

শুনে বাড়ির সকলের মধ্যেই আনন্দ প্রবাহ বইতে লাগলো।

হজরত আলী বাজারে গিয়েছিল বাজার সওদা করতে। এক মুদিখানার দোকানে দাঁড়িয়ে সে ঘিয়ের দর জিজ্ঞাসা করতেই তার পেছনে আওয়াজ– 'এ্যান্টেনাস এ্যান্ট।'

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাতেই ফ্যাটিগ চেন ফটকে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার! শ্রাদ্ধটা থুড়ি থুড়ি, তামদারীটা করা বাকী আছে এখনো?

হজরত আলী নাখোশ কণ্ঠে বললো– মানে?

ফটকে বললো– মানে, ঘিয়ের দর জানতে চাইছো, খানার আনজাম নিশ্চয়ই? শাদির খানাপিনা তো শেষ হয়ে গেছে। এই নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধের, সরি সরি, এটা নিশ্চয়ই তামদারীর খানাপিনার আনজাম?

: তামদাবী! কার তামদারী?

যা-ব্বাবা! এই মাস দুইয়েকের মাথায়ই ভুলে গেলে সব? আহমদুল্লাহ খানের। তোমাদের পেয়ারের যে.খান দু'মাস আগে পরলোকগমন করলো, তার কথা বলছি। তার তামদারীর বাজার করছো নিশ্চয়ই?

বইঘর ওয়েরোকন

কেন, তামদারীর বাজার ছাড়া কি আর বাজার করার প্রয়োজন হয় না? বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া লাগে না?

মাই গড! বাড়িতে খাওয়ার জন্যে ঘি? আজকাল তোমরা খুব ঘি খাচ্ছো বুঝি?

: তাতে তোমার কি?

: খাও খাও! ঘি-টি খেয়ে মোটা হয়ে নাও। এর পরে তো শাক পাতাও জুটবে না।

ভীষণ ক্ষেপে গেল হজরত আলী। সেক্রোধে বললো– খবরদার! খবরদার, ফালতু কথা বলবে না। তোমাকে কে ডেকেছে এখানে? কেন এসে গায়ে পড়ে বাঁদরামী করছো?

জিহ্বা তালুতে 'চচ্চ' আওয়াজ তুলে ফটকে বললো– কেন রাগ করছো ইয়ার? হাজার হোক দীর্ঘদিনের পরিচয় তোমার সাথে। ভবিষ্যতের খবরটা কি তোমাকে না দিয়ে পারি?

: ভবিষ্যতের খবর!

তোমাদের ভবিষ্যৎ দুর্দশার খবর। আমাদের দেবতুল্য ইংলিশ স্যারদের সাথে টক্কর লাগার ফলে আহমদুল্লাহর বিষয় সম্পত্তি বাড়িঘর সব হারিয়েছো তোমরা। ওবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছো। তোমার বাহাদুর ভাইজানের বিষয়-সম্পদ আর বাড়িঘরও আমার প্রিয় ইংলিশ স্যারেরা নেবে যখন, তখন কি অবস্থা হবে তোমাদের, তা কি ভেবে দেখেছো?

; সে কি? ভাইজানের বিষয়-সম্পত্তি বাড়িঘর নিয়ে নেবে কেন?

ওয়ারিশ কেউ না থাকলে নিয়ে নেবে না? ওয়ারিশহীন বিষয় সম্পত্তি তো ইংরেজ সরকারেই হয়।

ওয়ারিশহীন মানে? খোয়াব দেখছো? আমার ভাইজান তো তাঁর বাপমায়ের বৈধ ওয়ারিশ। সে বিষয়-সম্পত্তি ওয়ারিশহীন হবে কেন?

: আরে সেটা তো ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার সেই ভাইজানই যদি না থাকে?

: না থাকে কি রকম? থাকবেন না, তো কোথায় যাবেন?

: আন্দামানে।

: আন্দামানে মানে?

আন্দামানে দ্বীপান্তরে যাবে। দ্বীপান্তরে না গেলেও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে। মোট কথা, তোমার ভাইজানই আর থাকছে না।

: থামো! কি বাজে বকছো। জেগে জেগে স্বপন দেখছো?

: স্বপন নয়, স্বপন নয়। বাস্তব কথা বলছি।

: কি বাস্তব কথা? কে দ্বীপান্তরে পাঠাবে? কে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবে?

: ইংরেজ সরকার। আমাদের প্রাণপ্রিয় ইংলিশ হুজুরেরা?

আন্দাজেই? কোন দোষ নেই, ত্রুটি নেই– ইংরেজ সরকার এসব করতে আসবে কেন?

কেন আসবে না? ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অহরহ লেগে থাকলে আর ইংরেজদের সাথে সব সময় দুশমনি করলে, ইংরেজ সরকার ছেড়ে দেবে তাকে? উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে কি কোলে নিয়ে সোহাগ করবে?

তাজ্জব! উনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুশমনী করলেন কখন? অতীতে যা কিছু করেছেন, সে সব তো অতীতেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তো আর কিছু করছেন না।

: করছে। পুরাদমে করছে। এখনও সব সময় দুশমনীতে লেগেই আছে।

কে বললে তোমায়?

: তুমিই বলেছো।

: আমি!

: কিছুদিন আগে তুমিই বলোনি– তোমার ভাইজান সীমান্তে গেছে? বলোনি?

: হ্যাঁ, বলেছি। তাতে কি হয়েছে?

কেন সীমান্তে গিয়েছিল? পুতুল নাচ দেখতে? আমি ছাড়াও আমার স্যারদের আরো অনেক গোয়েন্দা আছে। সেসব গোয়েন্দার কাছে খবর আছে, তোমার ঐ ভাইজান সীমান্তে জিহাদের মূল ঘাঁটিতে গেছে আর প্রচুর জিহাদী নিয়ে সেখানে মিটিং করেছে।

: তার মানে...

কিসের মিটিং করলো? আমার ইংলিশ স্যারদের সম্বর্ধনা দেয়ার মিটিং নয় নিশ্চয়ই?

: তাহলে?

: আমার স্যারদের বাঁশ দেয়ার মিটিং।

: এ কি বলছো তুমি?

কি বলছি? কিছুদিন অপেক্ষা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে কি বলছি। আমাদের গোয়েন্দারা থলের বিড়াল বের করে ফেলেছে।

: ফটিগ চান!

তা ছাড়াও সেই যে সেখানে গেল, তোমার ভাইজানের আর খবর নেই। দীর্ঘ দুই তিন মাস কোথায় থাকলো সে? কি করলো বাইরে বাইরে থেকে? ফুল তুলে কি মালা গাঁথলো বসে বসে? আমাদের গোয়েন্দারা সেটাও বের করে ফেলবে অচিরেই।

সে কি! গোয়েন্দারা সেটাও বের করে ফেলবে?

আলবত! তোমাদের আলেম আহমদুল্লাহর গোপন খবর কি বের করেনি গোয়েন্দারা? ও.সি. ব্লাড সাকার কি তার বাড়িতে অমনি অমনি এসেছিল দ্বিতীয়বার?

www.boighar.com

সেটা তো তোমার কারসাজি। তুমিই, তুমিই গিয়ে ডেকে এনেছিলে, ও.সি.কে। আনোনি?

www.boighar.com

: ট্যান্টেনাস ট্যান্ট। হ্যাঁ এনেছি। জরুর এনেছি।

: এমন দুশমনী কেন তুমি করলে?

কেন করলাম? তোমরা আমাদের যা নয় তাই বলবে আর আমরা তোমাদের ছেড়ে দেবো?

www.boighar.com

: কি বললাম আমরা?

তোমরা আমার দেবতুল্য স্যারদের বলো কুকুর, আর আমাকে বলো– বিদেশী কুকুরের পা-চাটা গোলাম। তোমাদের কাছে আমার স্যারেরা হলো কুকুর আর তোমাদের কালা-কুৎসিৎ নেটিভরা হলো ঠাকুর। এবার দেখি, তোমাদের কোন ঠাকুর কোন নেটিভের বাপ তোমাদের রক্ষা করে। তোমার ভাইজানের তামাম অপরাধ বের হয়ে গেলেই তার হয় দ্বীপান্তর, নয় ফাঁসি।

: বটে!

বটে নয়, বটে নয়। দ্বীপান্তর বা ফাঁসি হয়ে গেলেই তার সব কিছু ওয়ারিশহীন আর তোমাদের স্থান তখন ভাগাড়ে। ঐ রাজপ্রাসাদ থেকে তোমাদের লাথি মেরে বের করে দেয়া হবে তখন। ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি?

বাঘের মতো গর্জে উঠলো হজরত আলী। বললো– ভাগ, ভাগ শিগগির, বেহুদা কুকুর! ভাগ শিগগির আমার সামনে থেকে। নইলে তোর নাক বরাবর মারবো এক বোম ফাটানো ঘুঁষি!

ক্ষিপ্রহস্তে সে আস্তিন গুটাতে লাগলো। তা দেখে আঁতকে উঠে পিছু হটলো ফটকে আর সুড়সুড় করে সরে পড়তে লাগলো। হজরত আলী হাঁক দিয়ে বললো– যাওয়ার আগে শুনে যা বিদেশী কুকুরের পা-চাটা কুকুর! আল্লাহ না করুন, ভাইজানের যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে আমিই তোকে খুন করবো শয়তান, নির্ঘাত খুন করবো...

আর একদফা আঁতকে উঠে পেছন ফিরে তাকালো ফটিক চান। তাকিয়েই দৌড় দিয়ে পালাতে শুরু করলো।

বাজার থেকে ফিরে এসেই হজরত আলী সবাইকে ব্যাপারটা শুনালো। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো– ভাইজান, ঐ হারামজাদা ফটকের জ্বালায় তো আর বাঁচিনে। যেখানেই যাই ঐ বেহুদাটা সেখানেই এসে হাজির হয় আর খুব খারাপ খারাপ কথা শুনায়।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো– তাই নাকি? ঐ ফ্যাটিগ চেন ফটকে?

জি ভাইজান। আজ বাজারে গিয়ে বাজার করতেই কোত্থেকে আবার ঐ শয়তানটা এসে হাজির। আমি চেষ্টা করলাম ওকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু কি সাধ্য আমার, ওকে এড়াতে পারিছিনে। জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরে সে অনেক খারাপ কথা শুনালো।

: বটে! কি বলে?

: বলে, তোমার ভাইজানের দাদা শ্বশুরের সব কিছু যেমন সরকার দখল করে নিয়েছে, তেমনি তোমার ভাইজানের সব কিছুও ইংরেজরা দখল করে নেবে।

: আমার সব কিছুও দখল করে নেবে?

জি ভাইজান! শুধু কি দখল করে নেয়া? বলে, ইংরেজদের পুলিশ এসে আমাদের যেমন ওখান থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি এখান থেকেও আমাদের বের করে দেবে। আপনার এই বাড়ি থেকে আমাদের লাথি মেরে বের করে দেবে।

এবার টনক নড়লো কাসিদ সাহেবের। বললেন– কেন গায়ে মাখছো ঐ পাগলের প্রলাপগুলো? ইংরেজদের চামচে ঐ ফটকেটা তো একটা পাগল।

বদ্ধ পাগল। যখন যা খুশী তাই বলে বেড়ায়। পাগলের প্রলাপের কি কোন যুক্তি থাকে?

না ভাইজান, পাগল নয়। রীতিমতো যুক্তি তুলে ধরে ধরে সে শুনালো সব কথা।

যুক্তি তুলে ধরে ধরে?

: হ্যাঁ ভাইজান, যুক্তি দেখয়ে দেখিয়ে।

: যথা?

আপনার দাদা শ্বশুরের কোন ওয়ারিশ না থাকায় তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সব কিছু ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিয়েছে আর বাড়িঘরে তালা ঝুলিয়ে সেখান থেকে আমাদের বের করে দিয়েছে।

তো? সেটা তো পুরানো ঘটনা। সবাই দেখেছে। ইংরেজরা শক্তিবান; তাই গায়ের জোরে এসব করেছে। ফটকের নতুন কি যুক্তি আছে এর মধ্যে?

আপনার মরহুম দাদা শ্বশুরের মতো আপনার সব কিছুই ইংরেজরা দখল করে নেবে আর আমাদের এই বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

কেন? আমার সব কিছু ইংরেজরা দখল করে নেবে কেন?

ওয়ারিশ নেই বলে। যুক্তি ছাড়া ফটকে কিছু বলেনি। আপনার দাদা শ্বশুরের মতোই আপনার সব কিছু দখল করে নিয়ে ইংরেজরা আপনার বাড়ি ঘরে তালা ঝুলাবে।

: কি কারণে? ওয়ারিশি না থাকায়?

: জি জি।

: আমি তাহলে কি? একটা অশরীরী কিছু?

: মানে?

: আমি কি মরে গেছি যে আমার সব কিছু ওয়ারিশহীন হয়ে গেছে?

এখন নয় ভাইজান, এখন নয়। আপনার অভাবে আপনার সব কিছু ওয়ারিশহীন হয়ে যাবে।

মানে? আমি কবে মরবো, ঐ ফটকে সেটা জানে? আমার অভাবে মানে?

মানে, আপনার দ্বীপান্তর বা ফাঁসি হয়ে গেলেই আপনার অভাব হয়ে যাবে।

কেন, আমার দ্বীপান্তর বা ফাঁসি হবে কেন? বিনা দোষেই?

জি-না, দোষেই। আপনার অনেক দোষ; মানে অপরাধ বের করছে

বইঘর ও রোকন
ইংরেজরা। আপনার অপরাধ বের করতে ইংরেজরা ফটকে ছাড়াও চারদিকে আরো অনেক গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছে।

: যথা?

আপনি সেই যে সীমান্তে গেলন, গিয়ে কি করলেন, ইংরেজদের গোয়েন্দারা সে সব অনুসন্ধান করে বের করেছে।

: বটে!

আপনি সীমান্তে গিয়ে জিহাদীদের সাথে মিটিং করে জিহাদ আন্দোলন ফের চাঙ্গা করে তুলেছেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদীদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন– এই রকম অপরাধ নাকি খুঁজে পাচ্ছে তারা।

কে বলেছে? ঐ ফটকে?

জি-জি, ঐ ফটকে। এছাড়াও আপনি সীমান্তে গিয়ে এই দীর্ঘদিন কোথায় রইলেন, কোথায় কোথায় গেলেন, কোথায় কি করলেন– এসবের খোঁজেও নাকি নেমে গেছে গোয়েন্দারা। ফটকের ধারণা এই অনুসন্ধানেও গোয়েন্দারা নাকি আপনার মারাত্মক মারাত্মক অপরাধ খুঁজে বের করবে।

মিথ্যা কথা বললে আর গায়ের জোরে বের করলে, অবশ্যই অপরাধ বের করতে পারবে তারা।

এ হাতযশ কি ওদের কম আছে ভাইজান? ইংরেজ পুলিশ আর গোয়েন্দাদের? আপনিই তো বলেছিলেন গল্পটা– 'তুই ঘোলাসনি, তোর বাপ ঘোলিয়েছে।'

তা ঠিক, তা ঠিক। মিথ্যা বলতে, গায়ের জোরে বলতে আর তিলকে তাল বানাতে তারা উস্তাদ।

তবে? আপনার উপর ইংরেজ সরকারের একটা বদ্ধমূল বিদ্বেষ আছে বরাবর। এর সাথে তাদের পুলিশ আর গোয়েন্দারা যদি তিলকে তাল বানিয়ে দেয়, তাহলে কি আর রেহাই আছে আপনার?

; তা বটে, তা বটে! তা দিতেই পারে তারা।

: তা দিলে তো আপনার ফাঁসি বা দ্বীপান্তরও দিতে পারে ইংরেজ সরকার।

পারে, অবশ্যই পারে। কোন অপরাধ না থাকলেও গায়ের জোরে সব দণ্ডই দিতে পারে তারা।

: ভাইজান!

আমার মন বলছে আমাকে নিয়ে এমন একটা কিছু হয়তো করবেই এদেশে অবস্থিত ইংরেজরা। ও.সি. বাদল সরকারের যুক্তি আর আচরণ দেখার পর থেকে সেটা অনুমান করছি।

এ কথায় বাড়ির সকলের চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আজম শেখ বললো– এমন একটা কিছু মানে? আপনাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবে তারা?

যদিও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট আর তা চায় না, তবু এরা গায়ের জোর খাটালে, মানে বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট তা অনুমোদন করতেও পারে।

অত্যন্ত শংকিত হয়ে সবাই এবার এক সাথে বলে উঠলো– সে কি ! সে কি!!

কাসিদ সাহেব বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সেটা অনুমোদন না করলেও এদেশে অবস্থিত এই হিংসুটে ইংরেজদের আর তাদের এ দেশীয় তাঁবেদারদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আশা অতি ক্ষীণ।

: অর্থাৎ?

খুন, জখম, অগ্নিসংযোগ– এমন কিছু গুরুতর অপরাধ বের করে এ দেশের আদালত অনায়াসে আমাকে ফাঁসি দিতে পারে। এখানে পার্লামেন্টের কোন অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না।

: হায় হায়, আল্লাহ না করুন, তেমন কিছু হলে তো আপনার বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সত্যিই ওয়ারিশহীন হয়ে যাবে। ইংরেজরা নিয়ে নেবে সব কিছু আর আমাদের ছাড়তে হবে এ বাড়িও।

মরিয়ম বিবি ডুকরে উঠে বললো– ও মাগো, মরেছি গো! ফের আমরা আবার কোথায় যাবো গো!

কাসিদ সাহেব সাহস দিয়ে বললেন– আমার কিছু হলেও আল্লাহ চাইলে তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। লায়লা বানুর গর্ভে আমার যে সন্তান আছে, সহি-সালামতে সে এলে আমার কোন কিছুই ওয়ারিশহীন হবে না আর স্বত্ববিলোপ আইনে ইংরেজরা কোন কিছুই বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আল্লাহ তায়ালার কাছে সবাই মোনাজাত করো– আমার সন্তান যেন সহি-সালামতে এ দুনিয়ায় আসে আর বেঁচে থাকে।

মরিয়ম বিবি ভরসা পেয়ে বললো– ঠিক ঠিক। তাই তো! তাহলে তো কাসিদ সাহেবের বাড়িঘর বিষয় সম্পদ ওয়ারিশহীন হবে না আর আমাদেরও যেতে হবে না এখান থেকে।

কাসিদ সাহেব বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথাই বলছি। আমার কিছু হোক, চাই না হোক, সবাই এখন থেকে প্রসূতির যথাযথ যত্ন তদবির করতে থাকো। সুস্থ সবল একটা বাচ্চা এ বাড়িতে আসুক আর এই বাড়িঘর আলোকিত করে তুলুক।

হজরত আলী এবার সরবে বলে উঠলো– বড়ই কায়েমী কথা। একেবারে মোক্ষম কথা। আমাদের করার মতো এই একটি কাজই এখন হাতে আছে। এখানে কোন ঘাটতি গলতি চলবে না।

আঁজম শেখ বললো– তা যা বলেছো হজরত মিয়া। এই বাচ্চার শুভাশুভের সাথে আমাদের সকলের শুভাশুভ একেবারে এক হয়ে মিশে আছে।

মরিয়ম বিবি বললো– আল্লাহ্ না করুন, কাসিদ বাবাজীর উপর যদি সত্যি সত্যিই কোন গজব নেমে আসে, সেটা আমরা ঠেকাতে পারবো না। ঠেকানোর জন্যে কোন কিছু করার সাধ্যও আমাদের নেই। আমরা শুধু পারি তাঁর সন্তানের শুভাগমন আর শুভ জিন্দেগীর আশায় প্রসূতির সর্বপ্রকার খেদমত করতে। সেটা আমরা করবো আর প্রাণপণে করবো।

অতঃপর সকলে এই কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলো। লায়লা বানুর আপত্তি সত্ত্বেও তার সেবা শুশ্রূষায় তারা দিন রাত খাটতে লাগলো। গড়িয়ে চললো দিন। আল্লাহর রহমতে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর একটি সুস্থ, সবল ও সুদর্শন পুত্র সন্তান প্রসব করলো লায়লা বানু।

এতে করে আনন্দের ফোয়ারা ছুটলো কাসিদ সাহেবের বাড়িতে। সেই সাথে ভরসা করার অবলম্বন পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলো হতাশাবিদ্ধ পরিবারবর্গ। কাসিদ সাহেবের বিষয় বিত্তের প্রত্যক্ষ ও বৈধ ওয়ারিশ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো লায়লা বানুসহ বাড়িতে অবস্থানকারী নারীপুরুষ সকলেই।

যথা সময়ে সুসম্পন্ন হলো সন্তানের আকিকা। লায়লা বানুর দাদু আহমদুল্লাহ আর স্বামী আহসান উল্লাহর নাম অনুসারে সন্তানের নামকরণ করা হলো মাহমুদ উল্লাহ মাহমুদ। সংক্ষেপে মাহমুদ নামেই হেসে খেলে বেড়ে উঠতে লাগলো সকলের চিরকাঙ্ক্ষিত ও চিরবাঞ্ছিত এই সুদর্শন সন্তান। সকলের এই মন ভোলানো সন্তান।

৮

ফটিক চান ফটকের হুঁশিয়ারী মোটেই অমূলক কিছু ছিল না। অনেক দেরীতে হলেও তার হুঁশিয়ারির সিংহভাগই বাস্তব হয়ে দেখা দিল। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব ইতিমধ্যেই সন্তানের পিতা হয়ে যাওয়ায় তাঁর বাড়িঘর আর বিষয় সম্পত্তির উপর স্বত্ববিলোপ আইনের খড়গ নেমে না এলেও তাঁর নিজের উপর গজবটা নেমে এলো পুরোপুরিই। তাঁর সন্তান মাহমুদউল্লাহ মাহমুদের বয়স যখন দেড় বছর, সেই সময় মালদহের পুলিশ সুপার আর পুলিশ কমিশনার বিশাল এক সেপাইদল নিয়ে অতর্কিত এসে হাজির হলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়িতে। তাঁদের নির্দেশে সিপাইরা আহসান উল্লাহ সাহেবের বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেললো। দুইজন সেপাইসহ পুলিশ সুপার সাহেব ও পুলিশ কমিশনার সাহেব সরাসরি ঢুকে পড়লেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের অন্দরমহলে এবং কাসিদ সাহেবের উদ্দেশ্যে ডাক হাঁক শুরু করলেন।

কাসিদ সাহেব ঘরেই ছিলেন। ডাক হাঁক শুনে তিনি দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে এবং দুই ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– একি! আপনারা?

পুলিশ সুপার বললেন– আমি মালদহ জেলার পুলিশ সুপার। পাশের জনের প্রতি ইংগিত করে বললেন– ইনাকে নিশ্চয়ই চেনেন? ইনি পুলিশ কমিশনার মিঃ ডগলাস।

কাসিদ সাহেব বললেন– ও আচ্ছা। তা আপনারা হঠাৎ...

: আপনিই মিঃ আহসান উল্লাহ?

: জি জি, আমিই আহসান উল্লাহ।

এ্যান্ড আপনিই জিহাদ বাহিনীর সেই কাসিদ?

আগে ছিলাম। অনেক আগে ঐ বিপ্লবের সময়। এখন আর কাসিদগিরি করিনে।

কাসিদগিরি করেন না। বিকজ আপনি এখন একজন পুরোপুরি জিহাদী। ইজ ইট নট?

: মানে?

স্ট্রেঞ্জ! শুনেছি আপনি একজন মস্তবড় বিদ্বান লোক। এ হাইলি এডুকেটেড ম্যান। অথচ কথাটা বোঝেন না?

: না, মানে–

: মানেটা পরে বোঝানো হবে। এখন আপনি আসুন আমাদের সাথে।

: আপনাদের সাথে! কেন?

: আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে এসেছি।

: অ্যারেষ্ট করতে?

ইয়েস। আপনার বাড়ির চারদিকে ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। কাজেই পলায়নের চেষ্টা না করে, আসুন আমাদের সাথে। চাইলে, এখানেই হাতকড়া পড়ানো হবে আপনাকে।

পুলিশ সুপার সাহেব সেপাই দুইজনের প্রতি তাকালেন। সেপাই দুইজন নড়ে চড়ে উঠতেই কাসিদ সাহেব প্রশ্ন করলেন– হাতকড়া পরাবেন?

ইয়েস হ্যান্ডকাপ। আপনাকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে গিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

: আমার অপরাধ?

: অনেক অপরাধ। এ্যানোর্মাস অফেন্স। অসংখ্য অপরাধ।

: যথা?

আপনি সীমান্তে গিয়ে জিহাদ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছেন। সেখানে গিয়ে জিহাদীদের নিয়ে মিটিং করেছেন জিহাদ আন্দোলন পুনর্জীবিত করার জন্যে। আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে জিহাদীদের নিয়োজিত করেছেন। বৃটিশ গভর্নমেন্টের চলমান আইনে এটা গুরুতর অপরাধ।

মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি বরং সবাইকে জিহাদের পথ পরিহার করার পরাপর্শ দিয়েছি।

কিন্তু আমাদের গোয়েন্দারা বলছে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনি পুরাদমে দুশমনী শুরু করেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিয়েছেন।

: গোয়েন্দারা মিথ্যা কথা বলছে।

বইঘর ও রোকন

সেটা আদালতেই প্রমাণ করবেন। অফেন্স নাম্বার টু, অর্থাৎ দুই নম্বর অপরাধ– প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত জিহাদী আলেম আহমদুল্লাহ খানের সাথে দীর্ঘদিন থেকে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তার নাতনীকে বিয়ে করে আপনি সেই যোগাযোগ সুদৃঢ় করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে।

কি সে উদ্দেশ্যে?

জিহাদ আন্দোলন বেগবান করা আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ জোরদার করা।

যথাযথ আব্রু করে লায়লা বানু ইতিমধ্যেই কাসিদ সাহেবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বললো– মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ বানোয়াট গল্প এটা।

পুলিশ সুপার বললেন– কোর্ট শ্যাল ডিসাইড দ্যাট। সেটা আদালত বিবেচনা করবে।

লায়লা বানু বললো– কোন আদালত বলুন? আমরা সেখানে যাবো।

কেন?

এটা যে একটা মনগড়া কাহিনী, আমাদের শাদিটা যে কোন উদ্দেশ্য ভিত্তিক নয়, এটা আদালতকে বুঝাবো। আমাদের কথা শুনেই আদালত বুঝতে পারবেন– এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

: আপনি কে? আপনি কি...

জি। আমি ইনার সেই স্ত্রী। হিজ ওয়াইফ।

আই সি। তা কথা হলো– আসামীকে আপাতত মালদহ জেলা আদালতে হাজির করা হবে। কোন গুরুতর অপরাধের বিচার করার এক্তিয়ার এ আদালতের নেই। সেটা উচ্চ আদালতের ব্যাপার।

: বিচার না করতে পারেন, জামিন দিতে তো পারবেন? সেখানে গিয়ে আমরা জামিন চাইবো।

এসব কেসের জামিন দেয়ার এক্তিয়ারও এ কোর্টের নেই।

তাহলে কোন কোর্টের আছে? মানে, জামিন দিতে আর বিচার করতে পারে– এমন কোন কোর্টে হাজির করবেন আসামীকে, কাইন্ডলি বলুন?

দ্যাট ইজ নট ইওর লুক আউট। কোন কোর্টে হাজির করবো, সেটা আমাদের ব্যাপার। উনি অপরাধ জানতে চাইলেন, মোটামুটি অপরাধগুলি শুনিয়ে দেই। বিনা অপরাধে যে উনাকে গ্রেপ্তার করতে আসিনি, সেটা উনি বুঝুন।

বইঘর ও রোকনু
এবার কাসিদ সাহেব সাগ্রহে বললেন– জি জি, তাই দিন। কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে তাই শুনি।

পুলিশ সুপার বললেন– তিন নম্বর অভিযোগ, আপনি এক ইংরেজ অফিসারের ব্যক্তিগত গার্ডকে আক্রমণ করে আহত করেছেন।

কাসিদ সাহেব বললেন– ব্যক্তিগত গার্ড?

ইয়েস। বডিগার্ড। তাঁর বডিগার্ড এক পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে আপনি তাকে জখম করেছেন।

: কি তাজ্জব কথা! এমন ঘটনা আমি কবে ঘটালাম? কে সে পুলিশ?

: রটেন গোষ্ট (ঘোষ্ট) নামের কোন পুলিশকে; আপনার মনে পড়ে?

: রটেন গোষ্ট! মানে, রতন ঘোষ?

একজ্যাকটলি। পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের এক সেক্রেটারী স্যার বাচ্চনের ব্যক্তিগত পুলিশ রতন ঘোষ, ওরফে রটন গোষ্ট।

সে কথা কে বললে আপনাদের?

ঐ সেক্রেটারী স্যার বাচ্চন সাহেব। তিনি আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন– বাংলাদেশের এক জিহাদী এসে আমার এক ব্যক্তিগত পুলিশকে জখম করে গেছে।

: আমিই সেই জিহাদী, সেটা বুঝলেন কি করে?

অনুসন্ধান করে। স্যার বাচ্চন বলেছেন, সীমান্তের এক জিহাদী এসে এই দুষ্কর্ম করে গেছে। আমরা অনুসন্ধান করে দেখলাম ইদানিং অন্য কোন বাঙালী সীমান্তে যায়নি। একমাত্র আপনিই গিয়েছিলেন।

আচ্ছা।

স্যার বাচ্চনের বিবরণ অনুযায়ী, স্যার বাচ্চনকে আঘাত করাই উদ্দেশ্য ছিল আপনার। তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি না পেয়ে সেই রাগে তাঁর ব্যক্তিগত পুলিশকে জখম করে এসেছেন।

: তাজ্জব! এটা তো একেবারেই তিলকে তাল বানানো হয়েছে।

তিলকে তাল হবে কেন? আপনিই তো পক্ষান্তরে পাঞ্জাবে যাওয়ার কথা স্বীকার করলেন আর সেই পুলিশ রটেন গোষ্ট আই মিন রতন ঘোষকে চিনতে পারলেন।

হ্যাঁ, তাকে আমি চিনলাম আর পাঞ্জাবেও গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন রাগের বশবর্তী হয়ে তো রতন ঘোষকে আঘাত করিনি আমি?

: তাহলে কি জন্যে আঘাত করলেন তাকে, ঠাণ্ডা মাথায়?

আমি তাকে আঘাতই করিনি। অন্য একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে এসে আমার ঘাড়ের উপর পড়েছিল। আমার ঘাড় থেকে তাকে নামিয়ে দেয়ার কালে সে মাটিতে পড়ে গেল। ব্যস! এইটুকু ঘটনা মাত্র।

ব্যস ব্যস। দ্যাটস এনাফ। তাকে আহত করে আপনি দৌড়ে পালিয়ে এলেন পাঞ্জাব থেকে।

মানে?

আর দরকার নেই। পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আপনি সোজা চলে গেলেন অযোধ্যায়। সেখানে গিয়ে গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত আসামী ফজলে হক খায়রাবাদীর নিষিদ্ধ কিতাব পুনঃমুদ্রণের আর বিপণনের কাজে রত হলেন। উদ্দেশ্য, এই বই পড়ে যাতে করে সারা দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

কোথায় পেলেন এই আজগুবী কথা? এই মনগড়া কথা কে আপনাকে শুনালো?

: মনগড়া হবে কেন? ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। বাস্তব ঘটনা।

কোনটা বাস্তব ঘটনা? আমি সে বই পুনঃমুদ্রণ আর বিপণনের কাজে রত হয়েছিলাম?

অফকোর্স! আমাদের দক্ষ গোয়েন্দারা মাটি খুঁড়ে বের করে এনেছে এই লুকিয়ে থাকা ঘটনা। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যটা উদঘাটনে সফলকাম হয়েছে তারা।

কি তাজ্জব! যেটা আসল ঘটনা, সেটা বাদ দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ে এই গাজীর গীত বের করে এনেছে?

: কি বলতে চান আপনি?

গোয়েন্দাদের এ রিপোর্ট সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। বানোয়াট। আমি কোন মুদ্রণ বা বিপণনের কাজে রত হইনি।

: হয়েছেন। একশো বার হয়েছেন।

: না, হইনি।

এবার পুলিশ কমিশনার মিঃ ডগলাস বললেন– ওয়েট ওয়েট। আরো আছে। আরো অপরাধ আছে আপনার। সত্য কথা বলার কারণে আপনি আপনার চাকর নকরদের লেলিয়ে দিয়েছেন আমার গোয়েন্দা ফ্যাটিগ চেনের (ফটিক

চানের) পেছনে। তারা ফ্যাটিগ চেনকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে ভরা বাজারের লোকের সামনে। ইংরেজ পুলিশের গোয়েন্দা আই মিন সোর্সকে খুন করার দুঃসাহস দেখানোটা যে কত বড় অপরাধ, তা এবার বুঝিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। আপনি এবার আসুন। –বলেই সেপাইদ্বয়কে বললেন– হ্যান্ডকাপ লাগাও।

সেপাইরা এসে বন্দুক বাগিয়ে ধরে হাতকড়া পরালো কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে। পুলিশ সুপার বললেন– আসামীকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলো।

আকস্মিক এই ঘটনায় বাড়ির সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কাসিদ সাহেব নিজে হতভম্ভ হয়ে গেলেন। কোন কথাই তাঁর মুখ থেকে সরলো না। সেপাইরা কাসিদ সাহেবকে নিয়ে আঙ্গিনায় নেমে এলো। তারা তাঁকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো, লায়লা বানু ছেলে মাহমুদকে কোলে নিয়ে নেমে এলো আঙ্গিনায়। পুলিশ সুপারের কাছে এসে সে কান্নাজড়িতকণ্ঠে বললো– আপনারা কোথায় নিয়ে যাবেন আমার স্বামীকে?

পুলিশ সুপার বললেন– আপাতত মালদহ জেল হাজতে।

লায়লা বানু বললো– তাঁর সাথে দেখা করতে হলে, কখন আর কোথায় যাবো আমরা?

আগামী পরশু বেলা দুটোয় মালদহ জেলখানায় আসুন। আমি দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো।

থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনি সরাসরি জেলারের অফিসে আসবেন। ঐ সময় আমি সেখানে থাকবো আর দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো।

ওহ! কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।

ধন্যবাদের দরকার নেই।

আমার এই ছেলেটা বড়ই ভালবাসে তার আব্বাকে। এই অবুঝ বাচ্চাটার মুখের দিকে চেয়ে দয়া করে এই উপকারটা করবেন স্যার।

অল রাইট, অল রাইট। আমি তা করবো।

এবার ছেলেকে কাসিদ সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে লায়লা বানু ছেলেকে বললো– ঐ দেখো বাপজান, তোমার আব্বুকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

ছেলেকে দেখে কাসিদ সাহেব অস্ফুটকণ্ঠে বললেন– আব্বু...

বইঘর ও রোকন
প্রত্যুত্তরে 'আব্বু আব্বু' আওয়াজ দিয়ে ছেলেটি তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো। কাসিদ সাহেব করুণকণ্ঠে বললেন– আমার হাত বাঁধা আব্বু। আমি তোমাকে নিতে পারবো না। তুমি তোমার আম্মুর কাছেই থাকো।

পুলিশ কমিশনার মিঃ ডগলাস লায়লা বানুকে লক্ষ্য করে বললেন– আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর আমরা দাঁড়াতে পারবো না। আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে এখন সরে যান। এরপর মিঃ ডগলাস সেপাইদের বললেন– চলে এসো, আসামীকে নিয়ে চলে এসো, কুইক!

সেপাইদ্বয় কাসিদ সাহেবকে নিয়ে অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে হাত বাড়িয়ে কাঁদতে লাগলো ছেলেটি।

পরের দিন লায়লা বানু সংবাদ পাঠিয়ে মেহের আলী আর তার স্ত্রী মর্জিনা খাতুনকে আনিয়ে নিলো বাড়িটা দেখভাল করার জন্যে। তার পরের দিন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন ছেলে মাহমুদউল্লাহ মাহমুদকে কোলে নিয়ে লায়লা বানু মালদহ জেলার জেলখানার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। তার সাথে রইলো হজরত আলী, আজম শেখ ও মরিয়ম বিবি– অর্থাৎ তারা তিনজনই। নির্ধারিত সময়ে, অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় বেলা দুইটার সময় এরা সরাসরি জেলার সাহেবের অফিস কক্ষের দরজায় এসে হাজির হলো।

পুলিশ সুপার সাহেব একটু আগেই সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। লায়লা বানুকে দেখেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং লায়লা বানুকে বললেন– এই যে, আপনারা এসেছেন! ভেরী গুড। যান, কারারক্ষীকে বলা আছে। জেলখানার গেটে গেলেই সে আপনাদের আসামীর কাছে, মানে আপনার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে। বাচ্চা সমেত সবাই আপনারা তার কাছে যেতে পারবেন। আধা ঘণ্টা টাইম পাবেন আপনারা। এরই মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা শেষ করে আপনাদের ফিরে আসতে হবে।

লায়লা বানু খুশী হয়ে বললো– ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দেখা করার পরে আপনি একা জেলার সাহেবের অফিসে আমার কাছে আসবেন। কিছু বলার থাকলে সেখানে এসে আমাকে বলবেন।

: জি আচ্ছা স্যার, জি আচ্ছা।

কিছুটা কষ্টদায়ক হলেও বলছি, এই দেখাই কিন্তু আসামীকে আপনাদের

শেষ দেখা।

লায়লা বানু চমকে উঠে বললো– শেষ দেখা মানে?

সুপার সাহেব অবিচল কণ্ঠে বললেন– মানে প্রায় নব্বুই ভাগই ধরে নেয়া যায়, আসামীর সাথে আর আপনাদের দেখা হবে না।

: আর দেখা হবে না? এই দেখাই শেষ দেখা?

: হ্যাঁ, করুণ হলেও এইটেই সত্য।

: কারণটা জানতে পারি কি? মানে, দয়া করে সেটা কি একটু বলবেন?

: বলার কিছু নেই। সবগুলোই গুরুতর অভিযোগ। এসব অভিযোগের বিচারে আসামীরা স্বভাবতই আর গৃহে ফিরে যায় না।

লায়লা বানু আকুল কণ্ঠে বললো– সেকি সেকি! ঘটনা কি স্যার? দয়া করে সেটা খুলে বলুন একটু?

পুলিশ সুপার বললেন– সেটা পরে এসে শুনবেন। এখন যান, আগে দেখা করে আসুন। পাঁচ দশ মিনিট সময় বেশি লাগলে সে সময় নেবেন। আমার বলা আছে, কারারক্ষী সে সময় আপনাদের দেবে। আসামীর সাথে এই দেখাই আপনাদের প্রায় শেষ দেখা কিন্তু।

–এই বলেই পুলিশ সুপার জেলারের কক্ষে ঢুকে গেলেন। থ মেরে কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর সবাইকে নিয়ে লায়লা বানু কাঁপতে কাঁপতে জেলখানার গেটে এসে দাঁড়ালো। পরিচয় পেয়ে কারারক্ষী তাদের আসামী কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের কাছে পৌঁছে দিল। তাদের দেখেই কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব কক্ষের সাক্ষাৎ দেয়া রেলিংয়ের, অর্থাৎ গরাদের কাছে ছুটে এলেন। বললেন– এসেছো, তোমরা এসেছো? ভাল আছো সবাই?

লায়লা বানুসহ হজরত আলী, আজম শেখ, মরিয়ম বিবি– কেউই সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলো না। সকলেই নীরবে কাঁদতে লাগলো আর চোখের পানি মুছতে লাগলো।

কাসিদ সাহেব তাকিদ দিয়ে বললেন– কি ব্যাপার? তোমরা কাঁদছো কেন? ভাল আছো তো, তোমরা সবাই?

চোখের পানি মুছে লায়লা বানু ধরা গলায় বললো– আমরা ভালই আছি। কিন্তু আপনি ভাল আছেন তো? এরা ঠিক মতো খাবার দাবার দিচ্ছে আপনাকে?

কাসিদ সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন– জেলের খাবার-দাবার আর কি হবে? ঐ

দিচ্ছে আর কি?

বাপকে দেখে ছেলে মাহমুদ গরাদের ফাঁক দিয়ে বাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো আর তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কাসিদ সাহেবও গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছেলের গা-মাথা নাড়তে লাগলেন আর 'আব্বু-আব্বু' করতে লাগলেন। এতে করে ছেলেটা আরো অস্থির হয়ে উঠে বাপের কাছে যাওয়ার জন্যে লাফালাফি আর কান্নাকাটি করতে লাগলো। বাপও তাকে থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। এরপর লায়লা বানু মরিয়ম বিবিকে বললো– খালা, ছেলেটাকে একটু ওদিকে নিয়ে যাও তো। আমি জরুরী কথাগুলো বলি।

মরিয়ম বিবি ছেলেটাকে কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে অন্য দিকে সরে গেল। লায়লা বানু রুদ্ধকণ্ঠে কাসিদ সাহেবকে প্রশ্ন করলো– এ কি শুনছি? একি বলছেন পুলিশ সুপার? আমাদের এই সাক্ষাৎই নাকি শেষ সাক্ষাৎ?

কাসিদ সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– তাই বলেছেন তিনি?

লায়লা বানু বললো– জি। পুলিশ সুপার বলছেন, শেষ দেখাটা করে নিন। আর দেখা নাও হতে পারে। মানে, সে সম্ভাবনা কম। এসব কি বলছেন তিনি?

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে কাসিদ সাহেব বললেন– ঠিকই বলছেন। এখানকার ইংরেজ প্রশাসনের যা উদ্দেশ্য, তাতে শেষ দেখাই বটে।

তার অর্থ?

অর্থ, এখানকার ইংরেজরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর। সে উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থও হয় তাহলে তারা ফাঁসিতে ঝুলাবে আমাকে। সেটা তারা অনায়াসেই করতে পারবে। কাজেই, পুনরায় আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। www.boighar.com

হুঁ-হুঁ করে কেঁদে উঠলো লায়লা বানু। বললো– তাহলে আমি কি করে থাকবো? কি নিয়ে বাঁচবো? কেমন করে দিন কাটবে আমার?

ছেলেকে নিয়ে থেকো। তাকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে রেখো। তাহলেই একভাবে না একভাবে দিন কেটে যাবে। আস্তে আস্তে আমার অভাবটাও ভুলে যেতে পারবে।

না-না, আমি পারবো না, ওভাবে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না। এতটা আমি সহ্য করতে পারবো না। www.boighar.com

লায়লা বানু অস্থির হয়ে উঠলে কাসিদ সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– নিরাশ হয়ো না। ঐ যে কথায় বলে 'রাখে আল্লাহ মারে কে?' আমি আমার জ্ঞাতসারে এমন কোন গুনাহ করিনি যে আল্লাহ তায়ালা আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন না। সৎ লোককে আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই সাহায্য করেন।

ভুল ভুল। কৈ করলেন? ইংরেজরা কত সৎ মহৎ আলেম-উলেমাদের দ্বীপান্তরে পাঠালো, ফাঁসিতে ঝুলালো– আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সাহায্য করলেন কৈ? জুলুম করে তো জয়ী হলো জালেমরাই?

তা অবশ্য ঠিক। তবু নাউম্মিদ হয়ো না। আল্লাহ তায়ালার দরবারে অতঃপর খাস দিলে আরজ পেশ করতে থাকো, যাতে করে তিনি আমাদের উপর সদয় হন।

www.boighar.com

এই সময় কারারক্ষী এসে লায়লা বানুকে তাকিদ দিয়ে বললো– নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পনের বিশ মিনিট সময় বেশি নিয়েছেন আপনারা। আর নয়। আপনারা এবার আসুন। আর একদণ্ডও সময় দেয়া যাবে না।

লায়লা বানু থতমত করে বললো– তা মানে...

কারারক্ষী অধীরকণ্ঠে বললো– আপনারা কি চাকরিটা খাবেন আমার? আসুন-আসুন...

কারারক্ষীর পুনঃ পুনঃ তাকিদের মুখে কাসিদ সাহেবের সাথে আরো কয়েক মিনিট কথা বললো লায়লা বানু এবং অবশেষে বিদায় নিয়ে সকলের সাথে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো কারাগার থেকে।

জেলার সাহেবের অফিসের সামনে এসে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী অন্যদের বাইরে রেখে অফিসে প্রবেশ করলো লায়লা বানু। অফিসে উপবিষ্ট পুলিশ সুপারকে লক্ষ্য করে সে রুদ্ধকণ্ঠে বললো– আপনি এবার বলুন স্যার, আসামীর সাথে এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা– এ কথা কেন বললেন তখন?

পুলিশ সুপার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আই টোলড দি ট্রুথ। যা সত্য তাই বলেছি।

: স্যার!

আসামীর যা অপরাধ তাতে তার দ্বীপান্তর হবে। একান্তই তা না হলে বিচারে তার ফাঁসি হবে। এই সম্ভাবনাই নাইনটি পারসেন্ট। তাই ওকথা বলছি।

সেকি স্যার? এইটেই আপনার ধারণা?

আমার নব্বই ভাগ ধারণা। নিরানব্বই ভাগই বলা যায়। এই জেলা আদালত চার্জশিটসহ ফরোয়াডিং দিয়ে বিচারের জন্যে আসামীকে যে উচ্চ আদালতে ট্যান্‌সফার করবেন, সে আদালত এই রকম একটা কিছু রায়ই দিবেন। এ বিশ্বাস আমাদের সকলের। না কি বলেন জেলার সাহেব?

জেলার সাহেব উষ্ণ সমর্থন দিয়ে বললেন– ইয়েস ইয়েস।

লায়লা বানু বললো– তাহলে সে উচ্চ আদালত কোথায় স্যার? কোন আদালতে বিচার হবে, দয়া করে বলুন?

পুলিশ সুপার শক্ত কণ্ঠে বললেন– বলা যাবে না।

: স্যার?

: বলা যাবে না মানে, সেটা বলা হবে না।

তা না বললে আমরা উকিল নিয়োগ করবো কিভাবে স্যার? সুষ্ঠু বিচারের জন্যে উকিল তো অত্যাবশ্যক।

ওখানে কোন উকিল এলাও করা হয় না।

সে কি! তাহলে আসামীর পক্ষে কথা বলবে কে?

আসামী নিজে বলবে। চার্জশীট দেখে দেখে আদালত আসামীকে প্রশ্ন করবেন আর আসামী তার জবাব দেবে।

: তারপর?

: আসামীর জবাবগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখে আদালত রায় দেবেন।

: কি তাজ্জব! তাহলে কি রায় হলো, আমরা তা জানবো কি করে?

: আসামী যদি কোন দিন বাড়ি ফিরে যায়, তাহলে তো বুঝতেই পারবেন, সে মুক্তি পেয়েছে। আর তা যদি কোনদিনই না যায়, (এই ফিরে না যাওয়ার সম্ভাবনাটাই নিরানব্বই পারসেন্ট) তাহলে বুঝবেন, সে আর এদেশে নেই। হয় দ্বীপান্তরে গেছে, নয় ফাঁসির মাধ্যমে পরলোকগমন করেছে।

আর্তনাদ করে উঠে লায়লা বানু বললো– হায় সর্বনাশ! কি গজব! তাহলে আমি কি নিয়ে থাকবো? বাঁচবো কি নিয়ে?

পুলিশ সুপার নাখোশ কণ্ঠে বললেন– সেটা কি আপনার কোন সমস্যা? বাচ্চা নিয়ে থাকবেন। বাচ্চাকে লালন পালন করবেন। বিশাল বাড়ি আছে, অঢেল ধন্‌-সম্পত্তি আছে, আপনার চিন্তা কি? আরামেই থাকবেন আপনি।

: স্যার!

: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, একটা পুত্র সন্তান রেখে যাচ্ছে আসামী। সে যদি তার কোন বংশধর রেখে না যেতো, তাহলে তো আসামীর অভাবে পথে গিয়ে নামতে হতো আপনাদের। ওয়ারিশ না থাকলে আসামীর অভাবে আসামীর সব কিছু ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিতো। না কি বলেন জেলার সাহেব?

জেলার সাহেব বললেন– ঠিক, ঠিক।

সুপার সাহেব বললেন– সে দিক দিয়ে এই মহিলা যথেষ্ট ভাগ্যবতী, না কি বলেন?

জেলার সাহেব বললেন– রাইট-রাইট। ভেরী ফরচুনেট– ভেরী ফরচুনেট। তা বলছিলাম কি, পাশের কক্ষে আমি একটু রেষ্ট নেবো। আমি এখন উঠি।

পুলিশ সুপার বললেন– ও সিওর, সিওর। আমিও উঠি।

দুইজনই অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। লায়লা বানু একা অফিসে দাঁড়িয়ে রইলো। অফিসের পিওন এসে লায়লা বানুকে বললো– আপনি এবার আসুন। অফিস কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে আর আমি অফিস বন্ধ করবো। আপনি এখন বেরিয়ে যান।

অফিস পিওন দরজায় হাত দিলো। হতবাক হতভম্ভ লায়লা বানু টলতে টলতে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

আসামী কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবকে মালদহ জেল থেকে কালিকাতায় আলীপুর জেলে পার করা হলো। কয়েক দিন পরে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারের নামে প্রহসন শুরু হলো। চার্জশীটে দেখে দেখে বিচারক আসামীকে যে সব প্রশ্ন করলেন, আসামী কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব সে সব প্রশ্নের সত্য ও সঠিক জবাব দিলেন। প্রশ্ন-উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করার পর ইংরেজ বিচারক প্রশাসনের কয়েকজন প্রভাবশালী ইংরেজ কর্মকর্তাকে নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্যে আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় সকলে একবাক্যে আসামীকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

দ্বীপান্তরে পাঠাতে হলে বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন দরকার হয়। একারণে বিচারের প্রসিডিংস-এ মারাত্মক মারাত্মক অপরাধ দেখিয়ে প্রসিডিংস ইংল্যান্ডে পাঠানো হলো। ফরোয়াডিং-এর শেষের দিকে লেখা হলো, 'আসামী একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোক হলেও সে হাড়ে হাড়ে শয়তান এবং ইংরেজদের একজন চরম দুশমন।'

বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ অনুমোদন দানের আলোচনায় বসে দেখলেন, প্রসিডিংসে আসামীকে মারাত্মক মারাত্মক অপরাধে অপরাধী দেখানো হলেও অপরাধগুলির ভিত্তি একেবারেই দুর্বল ও বালখিল্য গোছের। এসব অপরাধে আসামী আদৌ অপরাধী প্রমাণিত হয় না। এই সাথে পার্লামেন্টের সদস্যদের নজর পড়লো ফরোয়াডিংয়ের শেষ কথাটির উপর। অর্থাৎ আসামী 'একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোক'– এই কথাটির উপর। এ কথায় নজর পড়ার সাথে সাথে সদস্যগণ বিচলিত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্মরণে এলো ফজলে হক খায়রাবাদীর কথা। খায়রাবাদী তৎকালীন ভারতের একজন অন্যতম সেরা পণ্ডিত ছিলেন। আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বাইরে তাঁর চরিত্রে অন্য কোন দোষই ছিল না। তিনি অত্যন্ত সৎ, ঈমানদার ও একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। তৎকালীন ভারতের অসংখ্য লোক তাঁর পাণ্ডিত্যের ছোঁয়ায় নিজেদের ধন্য মনে করতেন আর তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবনত ছিলেন। অথচ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই অসাধারণ পণ্ডিত লোক আন্দামানে দ্বীপান্তরে গিয়ে ডালি কোদাল হাতে সাধারণ লেবারের কাজ করতে বাধ্য হন আর দ্বীপান্তরের দুই বছরের মাথায়ই ইন্তেকাল করেন। এমন একজন পণ্ডিত লোককে দ্বীপান্তরে পাঠানোর অনুমতি দেয়ার কারণে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ অনেকেই অতিশয় অনুতপ্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই পণ্ডিত লোককে মুক্তি দেয়ার জন্যে আন্দামানের অধিকাংশ ইংরেজ কর্মকর্তা বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে সুপারিশ করে পাঠান আর মুক্তি পেয়েও তিনি দেশে ফিরে আসতে পারেননি। বয়সের ভারে আন্দামানেই ইন্তেকাল করেন। এ ঘটনা বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের মনে গভীর দাগ কেটে ছিল।

আসামী কাসিদ আহসান উল্লাহ একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোক বলে ফরোয়াডিংয়ে উল্লেখ থাকায়, বৃটিশ পার্লামেন্টে তৎক্ষণাৎ আসামীর শিক্ষা জীবনের সঠিক বৃত্তান্ত পাঠানোর জন্যে কলিকাতায় হাইকোর্টকে শক্ত তাকিদ দেয়। পার্লামেন্টের তাকিদে হাইকোর্ট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং অতিদ্রুত যে বৃত্তান্ত পাঠায় তাতে 'আসামী লেখাপড়া করার জন্য লন্ডনেও গিয়েছিল' এ কথা উল্লেখ করে।

একথা দেখেই পার্লামেন্টের সদস্যগণ খোঁজ নিয়ে দেখেন, সেরেফ ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে আসা কোন্ কথা, আসামী আহসান উল্লাহ অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে বিরল কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন এবং ইউনিভারসিটির অনুরোধে সেখানে ছয়মাস কাল অধ্যাপনাও করেছেন। গৃহের

টানে যদি দেশে ফিরে না যেতেন, তাহলে এই আসামী আজও অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির একজন অধ্যাপক হয়েই থাকতেন।

এই তথ্য পাওয়ার পর বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ কলিকাতার হাইকোর্টের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং হাইকোর্টকে জানিয়ে দেন যে, আসামী আহসান উল্লাহ কোন অপরাধেই অপরাধী নন। দ্বীপান্তর দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডও দেয়া যাবে না তাঁকে। তবে যেহেতু অতীতে তাঁর জিহাদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল, শুধু সেই জন্যেই তাঁর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অনুমোদন করা হলো। সেই সাথে তাঁকে ডিভিশান, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দানের হুকুম দেয়া হলো। এই হুকুমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম বৃটিশ পার্লামেন্ট বরদাস্ত করবে না।

বৃটিশ পার্লামেন্টের হুকুমে কেঁপে উঠলো কলিকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্ট সে হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। আসামীর উপর পার্লামেন্টের সদয়ভাব উপলব্ধি করে আলীপুর জেলের জেলার ও ডিপুটি জেলারসহ জেলখানার সকল কর্মকর্তা কর্মচারী আসামী আহসান উল্লাহ সাহেবের প্রতি অতিশয় যত্নবান হলেন। থাকা খাওয়ার অত্যন্ত সুব্যবস্থাসহ আসামীর লেখাপড়া করার সকল সুবিধা ও সরঞ্জামাদি প্রদান করলেন। জেলখানার কয়েকজন পুরাতন কয়েদীর কাছে কিছু নিষিদ্ধ কেতাবপত্র লুক্কায়িত ছিল। কারারক্ষীদের সানুকুল্যে গোপনে সেগুলোও যোগাড় করে নেয়ার সুযোগ পেলেন কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। ফলে কারাদণ্ডের এই ছয়মাস কাল সময় ঐসব দুর্লভ কেতাবপত্র পড়ে পড়ে কাটিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

এদিকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে বৃটিশ পার্লামেন্ট আর হাইকোর্টের মধ্যে পত্র চালাচালিতে এবং প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর অন্তে হাইকোর্টের প্রতি পার্লামেন্টের হুকুম জারি করতে ছয় মাসের অধিককাল কেটে গেল। সেই সাথে আরো ছয় মাস কেটে গেল আসামীর জেলের মেয়াদ পুরণ হতে। কোন আদালতে বিচার বা কোথায় কি হচ্ছে এসব কিছুই জানা না থাকায়, লায়লা বানু ও বাড়ির অন্যান্য লোকেরা কাসিদ সাহেবের ফিরে আসার পথপানে অধীর আগ্রহে চেয়ে রইলো। কিন্তু এই এক বছরের অধিককালের মধ্যে কাসিদ সাহেব ফিরে না আসায় সকলেই হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। সকলেই নিশ্চিতভাবে ধরে নিলো যে, মুক্তি পাননি কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব। হয় তাঁর দ্বীপান্তর হয়েছে, নয় তাঁকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আর

কোনদিনই গৃহে ফিরে আসবেন না। এসব চিন্তা করে আফসোস আর আহাজারীর মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলো তারা।

এই সময় জেলের মেয়াদ পূরণ করে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব যখন হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির হলেন, তখন অমাবশ্যার আকাশে পূর্ণ চন্দ্র দেখে বাড়ির সকলে হতভম্ভ হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেললো তারা। এরপর হুঁশ ফিরে আসতেই খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল সকলে। আল্লাহ তায়ালার শোকর গোজারী করতে করতে তারা একে ওকে এই খুশীর সংবাদ বিলিয়ে বেড়াতে লাগলো। কাসিদ সাহেবের কাছে ছুটে এসে লায়লা বানু বাঁধভাঙ্গা আনন্দে বলে উঠলো– আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! আপনি মুক্তি পেয়েছেন? ওহ! আমার কি খোশনসীব, কি খোশনসীব!

কাসিদ সাহেবও আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ পেয়েছি। সবই আল্লাহর মেহেরবানী। সব প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার।

লায়লা বানু বললো– সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! কি খোশখবর, কি খোশখবর! দ্বীপান্তরের আদেশ তাহলে হয়নি?

না, হয়নি। বৃটিশ পার্লামেন্ট সেটা অনুমোদন করেনি। এদেশের মুসলমানেরা জিহাদের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সমঝোতা শুরু করায় বৃটিশ পার্লামেন্ট দ্বীপান্তর দেয়া বেশ আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। এর উপর কলিকাতা হাইকোর্ট আমার কোন অপরাধই সঠিকভাবে প্রমাণ করতে না পারায়, বৃটিশ পার্লামেন্ট আমাকে ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সশ্রম কারাদণ্ড প্রভৃতি কোন রকম কারাদণ্ড না দেয়ার জন্যে হাইকোর্টের প্রতি আদেশ প্রদান করেছে। শুধুমাত্র ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার অনুমতি পাঠিয়ে দিয়েছে।

: আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!

শুধু তাই নয়, কারাগারে আমাকে ডিভিশান অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর সকল সুযোগ সুবিধা দেয়ার আদেশ পাঠিয়ে দেয় পার্লামেন্ট।

ও-মা তাই নাকি? আল্লাহ তায়ালা পার্লামেন্টের সদস্যদের অশেষ ভালাই করুন। তা এই ছয় মাস সময়টা, কিছুই করার না থাকায় একা একা বসে বসে কিভাবে কাটালেন?

সেরেফ বসে বসে নয়। দ্বীপান্তর প্রাপ্ত আসামীদের দ্বীপান্তরিত জীবনের কাহিনী পড়ে পড়ে কাটিয়েছি। সে কাহিনীগুলো এতই করুণ আর এতই

বইঘর ও রোকন

মর্মন্তুদ যে, একবার পড়া শুরু করলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেই থাকে না। চোখের পানি মুছে মুছে সে সব কাহিনী বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। লাইনের পর লাইন, রাতের পর রাত সে সব কাহিনী আগাগোড়া পড়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

: বলেন কি!

এসব পড়তে শুরু করে কোন দিক দিয়ে যে আমার কারাদণ্ডের এই ছয় মাস কাল পার হয়ে গেছে, আমি তা টেরই পাইনি।

তাই নাকি! বড়ই তাজ্জব ব্যাপার তো। আমাকে কি তাহলে শুনাবেন সেসব কাহিনী।

: তুমি শুনবে?

শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে। যে কাহিনী পড়তে পড়তে ছয় মাস সময় আপনার বেমালুম কেটে গেল, সে কাহিনী শোনার কার না ইচ্ছে হবে?

ঠিক আছে। আমি আগে দুই একদিন সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে নিই, এরপর বসে বসে সে কাহিনী শোনাবো। কিন্তু আমার মাহমুদ কৈ, মাহমুদ?

ঘুমিয়ে আছে। একটু আগে ঘুমালো। তা, ঠিক বলছেন তো! আমাকে শুনাবেন তো সে কাহিনী। আপনার যদি দ্বীপান্তর হয়েই যেতো, তাহলে কি অবস্থা হতো আপনার...

শুনাবো, শুনাবো। মুখে শুনতে চাও, মুখে শুনাবো। বই থেকে শুনতে চাও, বই পড়ে শুনাবো। সে বিষয়ের উপর বিখ্যাত দুইজনের লেখা দুইখানা বইও আমি যোগাড় করে এনেছি।

মারহাবা মারহাবা! মুখ থেকেও শুনবো, বই থেকেও শুনবো। আপনি দয়া করে সে তকলিফটা করলে আমি ধন্য হবো।

: সাব্বাশ সাব্বাশ!

সে তকলিফ কি সত্যিই কবুল করবেন আপনি?

জরুর জরুর। তকলিফ কি? দ্বীপান্তর হলে যে অবস্থা হতো আমার, তা তোমাকে শুনাবো না? হাজার বার শুনাবো।

: শুকরিয়া, শুকরিয়া!

৯

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তার বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ছয় মাস কালের মেয়াদ পূরণ করে বাড়িতে ফিরে এলে, তাঁর স্ত্রী লায়লা বানু প্রশ্ন করেছিল– কোন কাজ না থাকায়, এই ছয় মাস সেরেফ বসে বসে কিভাবে কাটালেন।

জবাবে কাসিদ সাহেব বলছিলেন– বসে বসে তো নয়, দ্বীপান্তর প্রাপ্ত আসামীদের দ্বীপান্তরিত জীবনের কাহিনী পড়ে পড়ে কাটিয়েছি। সে কাহিনীগুলো এতই করুণ আর মর্মন্তুদ যে, একবার পড়তে শুরু করলে আর তা ছাড়া যায় না। আমি পড়তে শুরু করে আর তা ছাড়তে পারিনি। পড়তে পড়তে আমার কারাদণ্ডের এই ছয় মাস কাল সময় কোন দিক দিয়ে পার হয়ে গেছে– আমি তা টেরই পাইনি।

সে কাহিনী শুনার জন্যে লায়লা বানু যার পর নেই জিদ ধরলে, কাসিদ সাহেব বলেছিলেন– ঠিক আছে। আমি আগে দুই একদিন সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে নিই, এরপর বসে বসে সে কাহিনী শোনাবো। সে বিষয়ের উপর বিখ্যাত দুইজন মনীষীর লেখা দুইখানা বই যোগাড় করে এনেছি। মুখেও শোনাবো, বই পড়ে পড়েও শোনাবো।

কিন্তু কাসিদ সাহেব দুই একদিনের মধ্যে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা শেষ করতে পারলেন না। দেখা-সাক্ষাৎ শেষ করতে তার তিন চারদিন কেটে গেল। তাই, লায়লা বানুর পুনঃপুনঃ তাকিদের মুখে শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিনের দিন তিনি বাধ্য হয়ে ঘোষণা দিলেন– আজ তিনি সে কাহিনী শোনাবেন। রাতের খানাপিনা ও এশার নামায অন্তে আজ তিনি সে কাহিনী শোনাতে বসবেন।

ঘোষণা শুনে আগ্রহী হজরত আলী, মেহের আলী ও আরো দুই তিনজন লোক যথাসময়ে এসে কাসিদ সাহেবের সামনে বসে গেল। ছেলে মাহমুদউল্লাহ মাহমুদকে ঘুমিয়ে রেখে আসতে লায়লা বানুর বিলম্ব হলো। মরিয়ম বিবির কাছে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে লায়লা বানু ক্ষোভের সাথে বললো–

'সারাদিন যায় আলে ঝালে, জ্যোস্নার রাতে কালাই ডলে।'

শুনে কাসিদ সাহেব হেসে বললেন– তোমার এ কথার অর্থ?

লায়লা বানু বললো– গোটা দিনটা পড়ে রইলো, তখন আপনি কাহিনী শোনাতে বসলেন না, বসলেন এই রাতে!

কাসিদ সাহেব বললেন– রাতে বসলাম মানে, এইটেই এ কাজের উপযুক্ত সময়। নিরিবিলিতে বসে না বললে, এ কাহিনী সঠিকভাবে শোনানো যায় না। দিনে কত ঝামেলা! এ আসে ও আসে, এ ডাকে- ওডাকে, মানে কথায় কথায় ছন্দপতন। রাতে ওসব ঝামেলা থাকে না।

হজরত আলী সমর্থন দিয়ে বললো– ঠিক, ঠিক।

কাসিদ সাহেব বললেন– এছাড়াও এটা তো দশ-পনের মিনিট বা আধা-ঘণ্টার ব্যাপার নয় যে, বসলাম আর গড় গড় করে বলে শেষ করলাম। দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। পুরোটা না শুনিয়ে বাদছাদ দিয়ে শোনালেও কয়েক ঘণ্টার দরকার।

লায়লা বানু প্রতিবাদ করে বললো– বাদছাদ মানে? পুরো কাহিনীই শুনতে চাই। পুরো কাহিনীই। একটা কথা বাদ দিয়ে চলবে না।

কাসিদ সাহেব বললেন– তবে? আমি শুধু দুইজন মহান ব্যক্তির জীবন কাহিনীই জানি। তাদের দুইজনের লেখা মাত্র দুইটি বইই আমার কাছে আছে। এই দুইজনের জীবন কাহিনী শুনাতেই কয় রাত কেটে যায়, দেখো।

কাটুক, কাটুক। দশ রাত যদি কাটে, কাটুক। রাতে আমাদের এমন কি কাজ থাকে? তা যে দুই মহান ব্যক্তির জীবন কাহিনী শোনাবেন, সে দুই ব্যক্তির নাম কি?

এদের একজনের নাম মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী আর অন্যজনের নাম মওলানা জাফর থানেশ্বরী। মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী তাঁর জীবনস্মৃতি বা বিলাপলিপি আরবিতে লিখেছেন। তাঁর বইয়ের নাম 'আস সাওরাতুল হিন্দিয়া'। মওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর জীবন স্মৃতি বা বিলাপলিপি উর্দুতে লিখেছেন। তাঁর বইয়ের নাম 'তাওয়ারীখ-ই-আজিব'। আমি যে কাহিনী শোনাবো, তা এই দুটিতে যে কাহিনী লেখা আছে, সেই কাহিনীই। এর বাইরে কোন কাহিনীই বা কোন কথাই আমার জানা নেই।

: তা হলে শুনান। যাঁর কাহিনী আগে শোনাবেন, তাঁর কাহিনী শুনান।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা ফযলে হক খায়রাদীর বই 'আস

বইঘর ও রোকন
সাওরাতুল হিন্দিয়া' আমি আগে পড়েছি। তাঁর কাহিনীই আগে শোনাবো আমি।

বেশ-বেশ। তাহলে তাঁর কাহিনীই শুরু করুন।

মাওলানা খায়রাবাদী দর্শনশাস্ত্রে, বিজ্ঞান, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জটিল দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনাসহ বহুগ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তাঁর এই জীবনস্মৃতি বা বিলাপলিপি 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া' অনবদ্য আরবি ভাষায় লেখা। তাঁর এই আরবি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি আমি। তার কাহিনী যদি তাঁর সেই আরবিতে বলি, তাহলে কিছুই বুঝবে না তোমরা। তাই, বইটি বাংলায় অনুবাদ করলে যে বাংলা দাঁড়ায়, সেই বাংলাতেই বলি, শোনো।*

কাসিদ আহসান উল্লাহ খান বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন– মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার অন্তর্গত খায়রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ফযলে ইমাম ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধকদের একজন। পিতার যত্নে ফযলে হক খায়রাবাদী অল্প বয়সেই আল কোরআনের হাফেজ ও এলমে মা'কুলাতে, অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাচীন পদার্থবিদ্যা– ইত্যাদিতে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া' ও 'কাসিদায়ে ফেতনাতুল হিন্দ' মাওলানার নির্বাসিত জীবনের দুইটি বিলাপলিপি। আরবি ভাষায় কয়েকটি ক্লাসিক ব্যতীত এই ধরনের গদ্য পদ্যের নমুনা বড় একটা দেখা যায় না। আন্দামানের কঠোর বন্দী জীবনে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কাব্যে ও গানে প্রকাশিত হইত। কখনো কখনো সেগুলি অন্যেরা লিখিয়া রাখিতেন। লেখার মতো কোন সরঞ্জামও পাওয়া যেত না। কাপড়ের টুকরা কাগজে, কয়লা বা সামান্য পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখা হত।

'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া' সম্পর্কে 'সিয়ারুল-উলামা' গ্রন্থে বলা হইয়াছে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আযাদী সংগ্রামে মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ওয়াজিব বলিয়া

---

* মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব বইটি 'আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর বাংলা অনুবাদটাই এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত করেছি। এজন্যে মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। –লেখক

ফতওয়াও প্রচার করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনোয়ন করা হয় এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নির্বাসন জীবন যাপন করিবার নিমিত্তে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অভিশপ্ত দ্বীপেই ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা খায়রাবাদীর বহুপূর্বেই মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরী আন্দামানে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। নির্বাসিত জীবনে তিনি 'তাকবীমুল বুলদান' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া জনৈক ইংরেজ রাজকর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁহাকে মুক্তি দেয়া হয়। আন্দামান হইতে বিদায়ের সময় মাওলানা খায়রাবাদী কাফনের কাপড় বলিয়া কথিত এক টুকরা বস্ত্র ও কতিপয় বিচ্ছিন্ন টুকরা কাগজে কয়লা দ্বারা লিখিত একটা পত্র দিয়াছিলেন এবং বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন এইগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর হাতে পৌঁছাইয়া দেয়া হয়। এই কাফনের কাপড় ও টুকরা কাগজের সমষ্টিই 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া' ও 'কাসিদাতু ফিতনাতিল হিন্দ' নামক দুইটি পুস্তিকা। বৃদ্ধ মাওলানাকে আন্দামানের কঠোর বন্দীজীবনে যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া পুস্তকের ছত্রে ছত্রে তাহার বেদনা অনুরণিত হইয়াছে।

প্রথম বৎসর মাওলানা খায়রাবাদীকে সাধারণ কয়েদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হয়। আন্দামানের তদানীন্তন ডিপুটি জেলার প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিশেষতঃ উপমহাদেশের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জেলার সাহেবের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত একটা পুরাতন ফারসী পাণ্ডুলিপি ছিল। এই পুস্তকটির প্রাঠোদ্ধারের জন্য তিনি উহা জনৈক শিক্ষিত কয়েদীর হাতে সমর্পণ করেন। উক্ত কয়েদী মাওলানা খায়রাবাদীর জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তিনি পুস্তকটি মাওলানাকে দেন। নিঃসঙ্গ কারাজীবনে জ্ঞান চর্চার একটু সুযোগ ছিল তাঁহার জন্যে সান্ত্বনার উৎস। তিনি অতিযত্নের সঙ্গে পুস্তকটি নকল করিলেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় টীকা ব্যাখা লিখিয়া দিলেন।

জেলার সাহেব নোট ও ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ মাওলানার দর্শন লাভের জন্যে ব্যারাকে ছুটিয়া আসিলেন। মাওলানা তখন ব্যারাকে ছিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা গেল কাঁধে কোদাল ও বগলের নীচে টুকরি লইয়া সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মাওলানা ব্যারাকের দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞান-পিপাসু জেলারের চক্ষু

অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া মাওলানার হাত হইতে কোদাল ও টুকরি ফেলিয়া দিলেন। অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন– "হায় যে হাতের স্পর্শ পাইয়া সোনার কলম ধন্য হইত, সেই হাতেই কিনা আজ টুকরি-কোদাল উঠিয়াছে।"

সেই দিন হইতেই মাওলানাকে কায়িক শ্রম হইতে অব্যাহতি দান করিয়া লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়। গুণগ্রাহী ইংরেজ জেলার মাওলানার মুক্তির জন্যেও বিশেষভাবে সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। এইদিকে মাওলানা আবদুল হক ও মাওলানা শামসুল হক পিতা খায়রাবাদীর মুক্তির জন্য বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের তরফ হইতেও সরকারের নিকট বার বার মাওলানার মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন পেশ করা হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মাওলানার মুক্তির আদেশ হইল। মাওলানা শামসুল হক আদেশটি হাতে লইয়া আন্দামান রওনা হইলেন। অভিশপ্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, একটি জানাযা লইয়া যাওয়া হইতেছে। তার পশ্চাতে যেন সমস্ত আন্দামানের জনসাধারণ একত্র হইয়া শোক মিছিল করিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহা মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর জানাযা। শেষ পর্যন্ত মাওলানা শামসুল হকও শোক সন্তপ্ত জনতার মিছিলে শরীক হইলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অমূল্য নিধি আন্দামানের অভিশপ্ত দ্বীপে সমাহিত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এই পর্যন্ত বলিয়া কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বার বার অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। তাঁর সামনে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীও নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা সরল না। অতঃপর চোখের পানি মুছে কাসিদ সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন–

মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী বলিয়াছেন, আমার এই পুস্তক এমন এক ভগ্নহৃদয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও আক্ষেপ সর্বস্ব ব্যক্তির বিলাপলিপি, যাহার এখন সামান্যতম কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তিও অবশিষ্ট নাই। এমত অবস্থায় সেই বিপদগ্রস্ত বান্দা তাহার মহান প্রতিপালকের নিকট মুক্তির আশা পোষণ করে, যে ব্যক্তি জীবনের প্রথম হইতে সর্বসুখে প্রতিপালিত হইয়া এমন জীবনের শেষ পর্যায়ে জুলুমের শিকারে পরিণত হইয়াছে। সে আজ চিরবন্দী, সর্বস্বান্ত। এই বিপদগ্রস্ত বান্দা এখন আল্লাহর মকবুল নেক দোয়ার ওসীলায়

বইঘর.ও রোকন
এই অস্বাভাবিক দুর্দশার কবল হইতে মুক্তি পাইতে চায়। মাওলানা সাহেব লিখিয়াছেন–

– সত্যই আমি আজ কল্পনাতীত দুর্দশায় পতিত এবং কুৎসিত দর্শন যালিমদের হাতে বন্দী। এই যালিমরা আজ আমাকে সাধারণ ভদ্র-জনোচিত পোষাক হইতেও বঞ্চিত করিয়া সর্বপ্রকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের এক বিরামহীন মহড়ার শিকারে পরিণত করিয়াছে। হ্যাঁ, আজ আমি যালিমদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ও সর্প-সরীসৃপ সংকুল যিন্দানখানায় বন্দী!

এইসব হৃদয়হীন অসভ্য জালিমদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মুক্তির আলো আর কোনদিন দেখিতে পাইব সে আশা চিরতরে ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে আল্লাহর অনন্ত অনুগ্রহ সাগরের এক বিন্দু বারিধারা হইতে আমি নিরাশ নই। রুগ্ন, দুর্বল, শান্তিপ্রিয় এবং একজন সরল সহজ মানুষ সত্ত্বেও আজ আমি দুরাত্মা জালিমের নিত্য-নতুন অত্যাচার উৎপীড়নে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। আমি এমন বিপদের মধ্যে পতিত হইয়াছি যাহা কোন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। লাল মুখ কটাচক্ষু সাদা চামরা ও পিংগলবর্ণ কেশ বিশিষ্ট এই সব জালিমের হাতে পতিত হওয়ার পরই আমার রুচিসম্মত পোষাক-পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া আমাকে খাটো, মোটা ও জঘন্য ধরনের পোষাক পরিধান করিতে দেওয়া হইয়াছে। আজ আমি কর্তব্য বুদ্ধিহীন। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আশার দুইবাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছি। আজ আমি আমার আত্মীয়-বন্ধু ও প্রিয়জনদের নিকট হইতে বহুদূরে।

মোকদ্দমা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন প্রকার সুযোগ না দিয়াই আমার সম্পর্কে এহেন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অত্যাচার করিয়া আমার দুইটি হাতই প্রায় বেকার ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিষ্ঠুর কারার অন্তরালে এমন কোন অত্যাচার নাই, যাহা আমার উপর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। কেন আমার প্রতি এই উৎপীড়ন? কিইবা আমার অপরাধ? আমার একমাত্র অপরাধ– আমি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তদুপরি লোকে আমাকে আলেম বলিয়া মনে করে। আর এলমে-দ্বীনের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। ১৮৫৮ সালের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার উত্তরফল হিসাবে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর নামিয়া আসিয়াছে অনন্ত অভিশাপ। তাহারই দরুন দেশের যাঁহারা শাসক ছিলেন, তাঁহারা আজ পথের ফকির, আমীর আজ কাঙ্গাল, বাদশাহ গোলাম ও জনসাধারণ পরমুখাপেক্ষীতে পরিণত হইয়া

গিয়াছে।

এই দেশের ভাগ্যে দুঃখের এই কাহিনী শুরু হইয়াছে হিংসুক বিধর্মী নাসারাদের এক গভীর কুমতলবের পরিণতি হিসাবে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এই দেশের সকল ধর্মালম্বীকে খৃষ্ট ধর্মের মাধ্যমে একটা মাত্র অনুগত জাতিতে পরিণত করাই ছিল উহাদের শেষ লক্ষ্য। তাহারা খুব ভালভাবেই এই কথা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, এই দেশবাসীর ধর্মীয় বোধ এবং এই নতুন শাসক শ্রেণীর ধর্মীয়বোধের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলিবে এবং অবশেষে সে সংঘর্ষ বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে পরিণত হইবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া শাসক শ্রেণী সর্বপ্রকার ধর্মীয় চেতনার বিলুপ্তি সাধন করার জন্যে নানাপ্রকার জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টান শাসকশ্রেণী সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ শুরু করে। তাদের ধারণা ছিল যে, দেশের সাহসী বীর সেনাবাহিনীকে যদি তাহারা নানাপ্রকার কলাকৌশলের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দেশের সাধারণ মানুষকে বল প্রয়োগের দ্বারাই ধর্মান্তরিত করা সহজ হইয়া যাইবে। তাহারা হিন্দু সৈন্য বাহিনীতে গরুর চর্বি এবং মুসলিম সৈন্যের জন্যে শুকুরের চর্বি প্রচলন করার তোড়জোড় শুরু করে। (অর্থাৎ গরু-শুকরের চর্বি মেশানো গ্রীজড কার্টিজ প্রচলন করে যাহা দাঁতে কাটিতে হইতো)। আর এখান থেকেই শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ তথা আযাদী আন্দোলন।

কাসিদ আহসান উল্লাহ তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ তুলে বললেন– মাওলানা খায়রাবাদী তাঁর পুস্তক 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়া'য় অতঃপর এই সিপাহী বিদ্রোহ বা আযাদী আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই আন্দোলনে দিল্লী সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্ব দান ও পরাজয় পর্যন্ত ঘটনায় এসে মাওলানা বলেছেন– হতভাগ্য বাদশাহ সপরিবারে তখন হুমায়ুনের মাকবারাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজিরেরা তখন পর্যন্ত তাঁহার কানে আশার বাণী শুনাইতেছিল। তিনি তাহাদের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বাদশাহী চালে তখন পর্যন্ত চাকর বাঁদীর সেবাযত্ন উপভোগ করিয়াই দিন গোজরান করিতেছিলেন।

কিন্তু হায়, বিশ্বাসঘাতকের কথায় কর্ণপাত করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা সেই বাদশাহকেই শেষ পর্যন্ত সীমাহীন লাঞ্ছনা, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনার সহিত সপরিবারে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় শহরের দিকে আসিতে হইল। পথিমধ্যে

বইঘর ও রোকন
'হাডসন' নামক এক সেনানায়ক বাদশাহ তনয় ও পৌত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। এইভাবে মির্জা মুগল এবং খেজের সুলতানের জীবন অবসান হইল। যালেমেরা শাহজাদাদ্বয়ের মৃতদেহ পথিপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া মস্তক কর্তন করিয়া আনিল এবং একটি সুসজ্জিত পাত্রে স্থাপন করতঃ বাদশাহের সম্মুখে 'উপহার' স্বরূপ পেশ করিল। তৎপর মস্তক দুইটিও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

www.boighar.com
ভাগ্যের কি পরিহাস! যে বেগম বাদশাহের প্রধান-মন্ত্রণাদাত্রী থাকার সময় ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছিল এবং স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিয়া লওয়ার জন্য সর্বাবস্থায় দেশ ও জাতির শত্রু ইংরেজদিগকে গোপনে সাহায্য দান করিত, তাহার মিথ্যা আশার সৌধও মুহূর্তের মধ্যেই ধসিয়া পড়িল। সর্বপ্রথম গোরা সেনানায়কগণ তাহার সঞ্চিত সকল ধন সম্পদ কাড়িয়া লইলো। তৎপর তাহাকেও বাদশাহর সহিত নির্বাসনে প্রেরণ করা হইল। তিনি ছিলেন "যিনাত মহল" বা মহলের সৌন্দর্য। ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ তাহাকে কুৎসিততম একটি ঘৃন্য নারীতে পরিণত হইতে হইল।

হিন্দুদের মধ্যে মাত্র তাহারাই নিহত হয়, যাহাদের সম্পর্কে জানা ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করিয়াছে বা মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল, যাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, অথবা দীন-ঈমান পরিত্যাগ করতঃ নাসারা দস্যুদের সহায়তা করিয়াছিল, আর যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা পশ্চাতে ফেলিয়া নাসারা শত্রুদের গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এই দুরাত্মাদের মধ্যে বাদশাহের এক বিশিষ্ট অমাত্যও শামিল ছিল (হাকীম আহসান উল্লাহ খাঁ)। খৃষ্টান আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে এই লোকটার প্রচেষ্টার কোন সীমা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার সকল আশা মরীচিকায় পরিণত হয়। আশাভঙ্গের গ্লানি এবং স্বজাতিদ্রোহিতার আক্ষেপ শেষ জীবন পর্যন্ত তাহাকে মর্মে মর্মে দাহন করে। তাঁহার অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং জনসমাজে ঘৃণ্য ও ধিক্কৃত একটি লোক হিসাবে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে, ইহার চাইতে বড় সর্বনাশ আর কি হইতে পারে?

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব আবার একটু থামলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন–

এরপর মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী তাঁর নিজের শহর অযোধ্যার পতনের, তথা অযোধ্যার নবাবের অদূরদর্শিতা এবং বেগম হজরত মহলের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রাণপণ সংগ্রাম ও পরাজয়ের একটা নীতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। সবশেষে তিনি সরাসরি তাঁর নিজের কাহিনীতে এসেছেন।

কথার মাঝেই লায়লা বানু প্রশ্ন করলেন– তাঁর নিজের কাহিনী মানে?

কাসিদ সাহেব বললেন– নিজের কাহিনী মানে তাঁর বন্দী হওয়ার কাহিনী, দ্বীপান্তর হওয়ার কাহিনী আর তাঁর দুঃখ-আফসোসের কাহিনী। আমি এবার তাঁর বই 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়ার' শেষ অংশটুকু সরাসরি পড়ছি। কোন প্রশ্ন না করে তোমরা শুধু শুনে যাও–

কাসিদ সাহেব পড়তে শুরু করলেন–

"অতঃপর আমার কাহিনী। সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পর হইতে এই পর্যন্ত বার বার আশাভঙ্গ ও নৈরাশ্যের বিভীষিকায় আমার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। প্রবাসের জীবন, বিপদ-আপদের সীমাহীন অস্বস্তির বাত্যাপ্রবাহে আমার নৈতিক বলও যেন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুদের নিকট হইতে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি, পরিচিত প্রতিবেশীর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার সর্বোপরি জন্মভূমির স্নিগ্ধ-শীতল হাতছানি আমার মনপ্রাণ উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় ইংল্যান্ডের রাণীর সেই ফরমান এবং অঙ্গীকারপত্র আমার হস্তগত হইল। ফরমানে যেভাবে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, সর্বোপরি শপথের পর শপথ করিয়া যেভাবে উহাকে সাজানো হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার সরল অন্তর আশ্বস্ত হইল। আমি বিনা দ্বিধায় বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পরিবার পরিজনের স্নেহ মমতার টান এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সাধারণ বিচার বুদ্ধিটুকুও আমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অন্যথায় আমি কেন যে এই চিন্তাও করি নাই– বেঈমান বে-দীনের অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই। ধর্মহীন কাফেরের শপথের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কিছুতেই উচিত নহে। আখেরাতের ভয় এবং শেষ বিচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে যাহাদের কোন জ্ঞান বা আক্বীদা নাই তাহারা অঙ্গীকার করিয়া তাহার খেলাপ করিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নহে।

অল্প কিছুদিন পরেই জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী আমাকে বাড়ি হইতে ডাকাইয়া নিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। এই কঠোর বন্দী জীবন শুরু হওয়ার পরই আমাকে রাজধানীতে (লাখনৌ) পাঠাইয়া দেয়া হইল। রাজধানী

প্রকৃতপক্ষে তখন ছিল ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের প্রধান কেন্দ্রভূমি। এখানে আমার বিচার প্রহসনের দায়িত্ব দেয়া হইল এমন যালিমের উপর যাহার সুবিচার বা অনুকম্পা প্রদর্শনের মতো সাধারণ যোগ্যতাটুকুও ছিল না। সে ছিল যেমন একগুঁয়ে তেমনি নিষ্ঠুর। তদুপরি দুইটি ইতর প্রকৃতির লোক আমার বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের মনের আক্রোশ প্রাণ ভরিয়া বাহির করিল। এই দুই হতভাগ্যের সহিত দীর্ঘকাল যাবত এই ব্যাপারে আমার তর্কযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল যে, কোরআনের সরাসরি নির্দেশ মোতাবেক যে সমস্ত জাতিদ্রোহী মুসলিম নামধারী ব্যক্তি মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত করিয়া খৃষ্টান নাসারাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, তাহাদিগকে খৃষ্টান নাসারা বলিয়া গণ্য করা হইবে কিনা। আমি এই ধরনের লোকদিগকে নাসারাদের চাইতেও অধম বলিয়া মনে করিতাম। তাহারা এই ব্যাপারে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইত না। ফলে, আমার সঙ্গে তাহাদের তর্কযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাহাদের মত ছিল, খৃষ্টানদের সহিত যে কোন শর্তে এবং যে কোন অবস্থায় আপোষ রফা করিয়া বসবাস করাতে কোন দোষ নাই। তাহারা ছিল অর্থের বিনিময়ে দীন ও ঈমান বিক্রয়কারী। এ হেন দুই ব্যক্তি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিরুদ্ধে অনেক মনগড়া অভিযোগ করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের কান ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে, বিচার প্রহসনে যা হওয়ার তাহাই হইল। যালিম বিচারক আমাকে আজীবন কারাদণ্ড ও নির্বাসনের নির্দেশ দেয়। এতদসঙ্গে আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত পুস্তকসমূহের বিপুল ভাণ্ডার এমন কি আমার অসহায় পরিবার পরিজনের বসবাসের বাড়িঘর পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই এই ন্যক্কারজনক ব্যবহার করা হয় নাই। এই দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তা ও ক্ষমার ওয়াদা করার পর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হয় অথবা আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বলিতে গেলে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে আমার চাইতেও বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। পূর্ব অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অসংখ্য মুসলামানের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। কত সুন্দর বাড়ি ঘর, সুসজ্জিত বাগান এবং মূল্যবান আসবাবপত্র যে বর্বর গোরা সৈন্যরা ধ্বংস করিয়া ফেলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইভাবে যে সমস্ত লোককে নির্যাতন অথবা হত্যা·করা হয়, সাধারণভাবে গণণা করিয়া তাহার সংখ্যা নিরূপন করা কিছুতেই সম্ভব পর হইবে না। বিশেষতঃ দিল্লী ও লাখনৌর মধ্যবর্তী

এলাকাগুলিতে যে সমস্ত বিশিষ্ট পরিবার বসবাস করিত তাহাদের মধ্যে কোন লোককেই অমানুষিক নির্যাতনের কবল হইতে নিস্তার দেয়া হয় নাই।

এই শরীফ লোকদের মধ্যে মুসলিম নামধারী এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেয় যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাঁরা যদি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের কোনই ভয় নাই। কিন্তু দিল্লীতে যখন সকলেই সমবেত হইলেন, তখন নাসারাদের সন্তুষ্টির জন্যে সে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লয়। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিন্দনীয় কাজ। কিন্তু খৃষ্টানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে সেই সাধারণ শিষ্টাচার বোধও সে বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। নাসারা প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্যে সে এমনই আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির চিন্তাও তাহার মস্তকে আসিল না। ইংরেজ যালিমেরা এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও হাতকড়া লাগাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইল। তাঁহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হইল। কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হইলেন অথবা নির্বাসিত হইলেন। আর সেই নাসারার গোলাম, বেঈমান, রইস মুসলমানদের পবিত্র খুনের বদলায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রভুত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

এমনি অগণিত রক্তপাত ও হৃদয়বিদারক কাহিনীর মধ্য দিয়া ইংরেজ বর্বরতার অবসান হয়। অতঃপর আমার অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন লাভ করিতে থাকে। আমাকে বন্দী অবস্থায় এক কয়েদখানা হইতে অন্য কয়েদখানায়, এক প্রান্তর হইতে অন্য প্রান্তরে এবং নির্যাতনের এক অধ্যায় হইতে অন্য অধ্যায়ে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা আমার পায়ের জুতা ও পরনের রুচিসম্মত পোষাক খুলিয়া ফেলে। অতঃপর নগ্নপদে এবং জঘন্য ধরনের মোটা বস্ত্রে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। আমার পরিছন্ন কোমল শয্যা ছিনাইয়া লইয়া শক্ত, কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধযুক্ত শয্যা দেয়া হয়। সেই শয্যার কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। সমগ্র শয্যায় যেন কণ্টক পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল। সামান্য একটি লোটা, পেয়ালা, সাধারণ ব্যবহারোপযোগী একটি বরতন (বাসন) পর্যন্ত আমকে দেওয়া হয় নাই। সিদ্ধ মাছ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইত, আর পান করিতে দেওয়া হইত গরম পানি। হায়রে স্বদেশপ্রেম! জনতার ভালবাসা আমরা পাইলাম না। এই বার্ধক্যের দিনগুলিতে সেবাযত্নের জন্য উন্মুখ আমার এই দেহমন পাইল

বইঘর ও রোকন
যিন্দানখানার তপ্ত পানীয়। স্নেহ মমতার শীতলতা হইতে আমরা রহিলাম দূরে বহু দূরে। তার পরিবর্তে অনবরত আমাদিগকে নির্যাতন, অপমান ও মানবতা বিরোধী আচরণ সহ্য করিতে হইতেছে।

অতঃপর কুদর্শন দুশমনের যুলুমের শিকার হইয়া আমি নীত হইলাম কালাপানির পার্বত্য এলাকায়। এই স্থানের আবহাওয়া মারাত্মক। সর্বদা যেন মাথার উপর তপ্ত সূর্য অগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে। এই মরণ-দ্বীপের কোথাও পথঘাটের নাম গন্ধ নাই। দুর্গম বন্ধুর পথঘাট সর্বদা হিংস্রপ্রাণীর খেলা চলে। এই বিচরণ স্থানও আবার মাঝে মাঝে লোনা পানির ঢেউ আসিয়া প্লাবিত করিয়া দেয়। আর রাখিয়া যায় শুধু লবণাক্ত কর্দম ও বিষাক্ত পলিমাটি। এ স্থানের প্রাতঃকালীন বায়ুও "লু" র ন্যায় গরম এবং ভয়াবহ। এখানকার অমৃতও হলাহলের চাইতে মারাত্মক। এ স্থানের খাদ্য মানুষের উপযোগী নয়। এই দ্বীপের পানি সাপের বিষের চাইতেও মারাত্মক ও ভয়াবহ। এই দ্বীপের আকাশ হইতে যাতনার বৃষ্টি ঝরে। এই দ্বীপের মেঘমালা শুধু নির্যাতন ও দুশ্চিন্তা বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। এই দ্বীপের মাটি সুচাগ্র সদৃশ তীক্ষ্ণধার এবং ইহার কঙ্করপূর্ণ বাতাস অপমান ও লাঞ্ছনার পয়গাম বহন করিয়া আহাজারী করিয়া ফিরে।

আমাদিগকে অপ্রশস্ত অন্ধকার কুঠরিতে বন্দী করা হইল। ঘরগুলির উপরে ছাদ আছে সত্যই, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই নয়নের অশ্রুধারার ন্যায় বৃষ্টি ধারা সমগ্র ঘরটি প্লাবিত করিয়া দেয়। সেই সাথে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে এবং রোগের উৎপত্তি ঘটায়। ব্যাধি-বিমারী এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও ঔষধ এখানে দুষ্প্রাপ্য। অসংখ্য প্রকার রোগ নিত্যই আমাদেরকে আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু সেগুলির প্রতিরোধের পন্থা আমাদের জানা নাই। খুজলী, দাদ ও শরীরের স্থানে ফোস্কা পড়া এখানে রোগের মধ্যেই গণ্য নয়। কিন্তু সামান্য একটু মলম বা মামুলি কোন ঔষধের সন্ধানও আমাদের নাগালের বাইরে।

নামেমাত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে আছে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় রোগের উপশম না হইয়া বরং তাহা বর্ধিত হইতে থাকে। চিকিৎসকেরা নতুন নতুন দুঃখ-কষ্টের বার্তাবহ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে বসিয়া একটু সান্ত্বনার বাণী বা হৃদয়বিদারক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটুখানি সমবেদনা প্রকাশের জন্যও কোথাও কোন লোক পাওয়া যায় না। অবজ্ঞা, অবহেলা এবং কটুবাক্য বর্ষণ করিয়া দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করাই এই

স্থানের রীতি। মানুষকে কষ্ট দিয়াই এখানে লোকে শান্তি পায়। এখানকার দুঃখ ও রোগ-শোকের সঙ্গে দুনিয়ার আর কোন দুঃখ-কষ্টেরই তুলনা হয় না। সামান্য একটু জ্বর এখানে মৃত্যুর পয়গাম লইয়া আসে। সামান্য একটু সর্দিতেও মস্তিষ্ক স্ফীত হইয়া অসহ্য ব্যথার সৃষ্টি করে। এখানে এমন অসংখ্য রোগ নিত্যই আক্রমণ করিয়া থাকে যার উল্লেখ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে নাই। ইংরেজ নাসারা চিকিৎসকেরা রোগীদের উপর নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার খড়্গ চালাইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে মাত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাত্রে পরিণত হইয়া কতলোকের যে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত লোক যে চিরতরে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। রোগ না চিনিয়া ঔষধ দেওয়া এবং নতুন নতুন ঔষধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে যাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের মৃতদেহ কাটিয়া দেখা হয়। তারপর সেগুলি শয়তানের দোসর নিকৃষ্ট ডোমদের হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। উহারা পবিত্র লাশের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং নদীতে ফেলিয়া দেয় অথবা কোন পথের ধারে কিংবা বালির স্তূপের নীচে শৃগাল কুকুরের জন্য রাখিয়া দেয়। দাফন কাফন বা জানাজার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই।

কি হৃদয়বিদারক আমাদের এই কাহিনী। মৃতের সঙ্গে এই অমানুষিক ব্যবহার প্রতিনিয়ত চোখের সম্মুখে না হইলে সম্ভবতঃ মৃত্যু কামনাই এখানকার সকলের সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইত, আর ত্বরিত মৃত্যুই হইত সবচাইতে বড় কামনার ধন। আত্মহত্যা যদি ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং আখেরাতে মহা আযাবের অবশ্যম্ভাবী কারণ বলিয়া নির্দেশিত না হইত, তবে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে বোধ হয় মৃত্যুর শীতল হাত বাছিয়া নেওয়ার পন্থাই সকলে অবলম্বন করিত। এহেন অমানুষিক নির্যাতন কেহই স্বেচ্ছায় বরদাশত করিতে চাহিত না।

এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই আমি নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ফলে, আমার ধৈর্যের সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িল। অন্তর আমার সংকীর্ণ হইয়া আসিল। আমার ভাগ্যাকাশের চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া গেল। যে সামান্য মান মর্যাদাবোধ আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইতে বসিল। এখন আর ভাবিতেও পারি না যে, এই মহাবিপদ হইতে আত্মরক্ষার কোন পথ আদৌ খুঁজিয়া পাইব কিনা। দাদ-খুজলি অসহ্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সকাল সন্ধ্যা নিদারুণ কষ্ট ও কাতরানির মধ্যে অতিবাহিত

হয়। শরীর জখমের আধিক্যে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। প্রাণান্তকর ব্যথা বেদনার মধ্যে আমার দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন যেন আরও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। রোগের দাপটও ক্রমে বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। সেই সময় বোধ হয় আর বেশি দূরে নয় যখন এই খুজলী-পাঁচড়ার নিদারুণ যন্ত্রণা আমাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। হায়! এক সময় ছিল যখন জীবনের হেন সুখ শান্তি নাই, যাহা আমার আয়ত্তে ছিল না। আর আজ আমি বন্দী জীবনে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক যামানা ছিল যখন আমার নিরুদ্বিগ্ন জীবন সুখী সমৃদ্ধ মানুষেরও হিংসার উদ্রেক করিত। আর আজ আমি বন্দীত্বের দারুণ কষ্টের মধ্যে পঙ্গু ও চলৎশক্তিহীন হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু মৃত্যুও আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে না।

দুশমন যালেমরা আমাকে নিত্য নতুন দুঃখ কষ্টে পতিত করিয়া ধ্বংস করিতে তৎপর রহিয়াছে। কিন্তু এই দুনিয়ার বুকে আমার অসংখ্য হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জন থাকা সত্ত্বেও কেহ আমাকে সামান্য একটু সাহায্যও করিতে পারিতেছে না। এই দুশমনদের অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের অপবিত্র অন্তর যেন শত্রুতারই আকর বিশেষ।

এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া আমি এখন মুক্তি পাওয়ার আশা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি। সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি। তবু পরম করুণাময় বিশ্বপালক আল্লাহর অসীম করুণা সম্বন্ধে আমি নিরাশ নই। সেই পরাক্রান্ত মহান আল্লাহই অত্যাচরী ফেরাউনের কবল হইতে নিরীহ দুর্বল আল্লাহর বান্দাদের মুক্তির পথ করিয়া দেন। অত্যাচার-অবিচারের শত আঘাত তিনিই তাঁর করুণার প্রলেপ দিয়া শান্ত করিয়া দেন। সকল অত্যাচারী উদ্ধতজনের প্রতি তিনি ক্ষমাহীন কঠোর। সকল ভগ্নহৃদয়ের পক্ষে সান্ত্বনার উৎস আর প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারার জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন এবং সর্বপ্রকার জটিলতা সহজ করিয়া দেয়ার একমাত্র অধিকারী তো তিনিই। তিনিই হজরত নূহকে ঝড়ের দাপট হইতে, হজরত আইয়ূবকে কঠিন রোগ ও অকল্পনীয় বিপদের হাত হইতে, ইউনুসকে মাছের উদর হইতে এবং বনী-ইসরাঈলকে কল্পনাতীত নির্যাতনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি হজরত মূসা ও হারূনকে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কবল হইতে, হজরত ঈসাকে ষড়যন্ত্রকারীদের সীমাহীন ষড়যন্ত্র জাল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন;

স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফাকে কাফের শক্তির সর্বপ্রকার শত্রুতা ও আক্রমণের সম্মুখে বিজয়ী করিয়াছিলেন। সুতরাং বিপদ, রোগ শোক ও সর্বনাশা ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় আমিই বা কেন তাঁর অনন্ত করুণারাশি হইতে নিরাশ হইব? তিনিই আমার পরওয়ারদেগার, তিনিই ক্ষমাশীল। মৃত্যুর কিনারায় উপনীত হইয়াও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। তেমনি জীবনের প্রতিপদে ভুল-ভ্রান্তির আবর্তে ডুবিয়া থাকিয়াও যদি কেহ তাঁহার কাছে হাত তুলিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কত অগণিত বিপদগ্রস্ত লোক তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বিপদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পথহারা মুসাফির তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া উদ্ধার পায়, দুঃখ-কষ্ট হইতে নিস্তার লাভ করে। কত নিরাশ মানুষের মনোবাঞ্ছা তাঁহারই নামের ওসীলায় পূর্ণ হয়। হাত-পা বাঁধা অবস্থা হইতেও কত বন্দী তাঁহার মেহেরবানীতে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন মুক্তজীবনের স্বাদ অনুভব করিতে পারে।

আমি আজ মজলুম, ভগ্ন হৃদয়, দিশেহারা। এই বেশেই আমি আজ আমার মহান পরওয়ারদেগারকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছি। তাঁহার প্রিয় হাবীবের নামের বরকতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার মহান দরবারে আশা পোষণ করিতেছি। তিনি কখনও তাঁহার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেন না। মযলুম দিশাহারার আকুল আহবান তিনি শুনিয়া থাকেন। মযলুমের ডাকে সারা দেবেন বলিয়া তিনি ওয়াদবদ্ধ হইয়াছেন। বিপদ দূর করার আশ্বাসও তিনিই দিয়াছেন। সেই মহান আল্লাহই আমাকে অমানুষিক নির্যাতন হইতে মুক্তি দেবেন। তিনিই বর্তমানের এই অবর্ণনীয় বেদনাময় পরিস্থিতি হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। যে সমস্ত জঘন্য রোগে আক্রান্ত হইয়া আমি আজ বিনা চিকিৎসা ও বিনাযত্নেই ছটফট করিতেছি, তিনি আমাকে সেই কালব্যাধির কবল হইতে আরোগ্য দান করিবেন। যাহারা আমাকে নিরর্থক এখানে বাঁধিয়া আনিয়াছে, তাহাদের হাত তিনিই শিথিল করিয়া দেবেন। আমার ক্রন্দন, আমার বেদনাময় হা-হুতাশ একমাত্র তাঁহারই দয়াদ্র কর্ণে যাইয়া পৌঁছিবে। তিনিই তার প্রতিকার করিবেন। তিনিই আমার বর্তমান দুর্ভাগ্যের পরিবর্তে জীবনাকাশে সৌভাগ্যের নতুন সূর্যোদয় ঘটাইবেন। তিনিই একমাত্র সর্বশ্রোতা, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী। আমার এই নির্বাসনের বেদনা দূর করিয়া একদিন কল্পনাতীত সুখ ও মর্যাদার অধিকারী করিবেন।

হে আমার পালনকর্তা প্রভু! আমাকে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি দাও। সকল আকাঙ্ক্ষা পোষণকারীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী, সকলের ভরসা ও আশ্রয়স্থল, তোমার প্রিয় হাবীব, তাঁর পুণাত্মা সাহাবীগণ এবং তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজনের সকলের পাক রূহের ওসীলায় আমার প্রতি করুণা করো। হে দাতা, হে দয়ালু, তুমিই তো অক্ষম মযলুমের পক্ষ হইয়া উদ্ধত জালিমের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকো। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ কৃতজ্ঞতায় তোমারই সম্মুখে মস্তক নোয়ায়। তুমিই দুনিয়ার সকলকে লালন পালন করিতেছ। তুমিই সকলের মনের বাসনা পূর্ণ করিবে।

সংক্ষেপে আমার দুঃখ-দুর্দশা ও অমানুষিক বন্দী জীবনের বেদনাময় কাহিনী বলিয়া শেষ করা হইল। অন্যত্র দুইটি কবিতার মাধ্যমেও আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি করিয়াছি। ইতোপূর্বেও অবশ্য কাব্যের ভাষায় আমার নির্যাতন কাহিনী কালের পাতায় দাগ কাটিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনশত পংক্তির মাধ্যমে এক নির্যাতিত আত্মাই মাত্র মুখ খুলিয়াছে। অনবরত কাব্যের ভাষায় গুন গুন করিয়া আমি আমার নিত্য নতুন নির্যাতন কাহিনী গাহিয়া থাকি। সংগ্রহ করিলে তাও বোধ হয় আরবি সাহিত্যের সম্পদ হইয়া থাকিত। কিন্তু জানি না, তা সংগ্রহ করার ন্যায় সামান্য উপকরণের ব্যবস্থা হইবে কিনা। আর এহেন অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যে কখনও তা সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে কিনা। সর্বশেষ আমি আমার এই কাহিনী হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ও তাঁর পবিত্রাত্মা পরিবার পরিজনের এবং সাহাবীগণের প্রতি দুরূদ ও সালামের সহিত সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহর উপর ভরসা। সকল কর্মে পূর্ণতা বিধান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই সম্ভব।"

এই সময় নিকটবর্তী মসজিদ থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো। আযান শুনেই কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব চমকে উঠে বললেন– এইরে! রাত শেষ হয়ে গেছে। খায়রাবাদী সাহেবের কাহিনী ও বেদনা বিলাপও শেষ হলো। এবার উঠে পড়ো, চটপট উঠে পড়ো সবাই। ফজরের নামায আদায় করার জন্যে সবাই তৈরী হও গিয়ে...

–বলেই উঠে পড়লেন কাসিদ সাহেব এবং তাঁর সাথে উঠে পড়লো সকলেই। ফজরের নামায আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়লেন সবাই। একটানা ঘুমিয়ে সবাই জোহরের সময় উঠলেন। অতঃপর নাশ্‌তা-পানি খেয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন তাঁরা এবং নামায অন্তে নারী-পুরুষ সবাই আবার এক জায়গায় বসলেন। এই সময় কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেবের সন্তান

মাহমুদউল্লাহ মাহমুদ একটা ছবিওয়ালা বই হাতে এসে বাপের কোলে বসলো আর কিছুক্ষণ লাফালাফি করলো। তারপর বইটি মেলে ধরে বললো– আব্বু, বাঘ বাঘ!

উল্লেখ্য যে, মাহমুদের বয়স তখন তিন বছর পার হয়ে গেছে আর মায়ের তালিম পেয়ে পেয়ে সে অনেকটা ভালভাবেই কথা বলতে শিখেছে। ছেলের কথার জবাবে কাসিদ সাহেব বললেন– জি আব্বু, বাঘ। এটি একটি বাঘ।

চোখ বড় বড় করে মাহমুদ মিয়া বললো– হাম! বাঘ তোমায় খাবে!

কপট ভয়ে চমকে উঠে কাসিদ সাহেব বললেন– এ্যাঁ! খাবে? ও বাপরে! আমি এখন কি করবো তাহলে? বাঁচাও বাঁচাও, বাঘ আমাকে খেয়ে নেবে।

মাহমুদ মিয়া হেসে বললো– না না, খাবে না। ওকে গান শোনাও, তাহলে আর খাবে না।

গান শোনাবো? কিন্তু আমি যে গান জানিনে।

: তাহলে তোমাকে খেয়ে নেবে।

: সর্বনাশ! তাহলে উপায়?

: উপায় নেই।

হজরত আলী বললো– আমি গান জানি মাহমুদ মিয়া। আমি বললে হবে?

মাহমুদ মিয়া খুশী হয়ে বললো– হবে হবে। তাহলে তুমিই গান শোনাও–

হজরত আলী সুর করে বলতে শুরু করলো–

"আর বাঘের বাঘ, কি রসুলের জাহির,
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর–
আর বাঘের বাঘ।

এক বাঘের নাম চিতার মাও, সোনাপীরের ধোয়ায় পাও,
আর বাঘের বাঘ, কি রসুলের জাহির,
বারো বাঘে করে খেলা, আর সোনাপীর–
আর বাঘের বাঘ।"

হজরত আলী থামতেই মাহমুদ মিয়া বললো– থামলে কেন? বলো?

হজরত আলী ফের শুরু করলো–

এক বাঘের নাম্ আউল বাউল,
রাস্তায় বসে ভাজে চাউল

আর বাঘের বাঘ, কি রসূলের জাহির,
বারো বাঘে করে খেলা আর সোনাপীর–
আর বাঘের বাঘ–

এরই মাঝে খাবারের বাটি হাতে এসে মরিয়ম বিবি বললো– ঐ হয়েছে। এখন ওকে ছেড়ে দাও তোমরা। সকাল বেলা এক চুমুক দুধ খেয়েছে মাত্র। তারপর সারাবেলা আর কিছু খায়নি। ও এখন খাবে।

আসলেই মাহমুদের খুবই ক্ষুধা পেয়েছিল তখন। খাবার দেখেই সে 'খাবো খাবো' বলে মরিয়ম বিবির দিকে দৌড় দিলো আর মরিয়ম বিবি তাকে কোলে নিয়ে স্থানান্তরে চলে গেল।

এবার কাসিদ সাহেব বললেন– আজ সবার ছুটি। আজ সবাই ঘুমিয়ে নাও। পরের জনের কাহিনী, মানে বিলাপলিপি যদি একান্তই শুনতে চাও, দু'একদিন পরে সেটা শুনাবো।

ক্ষেপে গেল লায়লা বানু। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– দু'একদিন পরে মানে?

মানে, মওলানা মুহম্মদ জাফর থানেশ্বরীর কাহিনী যদি শুনতে চাও, তাহলে দু'একদিন পরে...

না-না, পরে নয়। কোন জিনিস ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কি আর তা ভাল লাগে? উনার কাহিনীও আজই শুনবো।

: আজই শুনবে?

আজই আজই। আজ রাতেই।

আজ রাতেই? কিন্তু ঘটনা তো প্রায় ঐ একই। একটানা দুঃখ আর বঞ্চনার কাহিনী।

তা হোক। তবু শোনবো। খায়রাবাদী সাহেবের বন্দী জীবন তো দুই তিন বছরের। ঐ থানেশ্বরী সাহেবের বন্দী জীবন কি তাঁর চেয়েও কম সময়ের?

কাসিদ সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন– কম সময়ের কি রকম? মাওলানা জাফর থানেশ্বরীর বন্দীজীবন পাক্কা বিশ বছরের। বিশটি বছর ধরে বন্দী জীবনের গ্লানি ভোগ করেছেন উনি।

যারপর নেই তাজ্জব হয়ে লায়লা বানু তাঁর চেয়েও সোচ্চার কণ্ঠে বললো– ও-ম্মা! সে কি, সে কি! তাহলে? কুড়িটি বছর ধরে বন্দী ছিলেন যিনি, তাঁর জীবন না শুনে আমরা থামবো?

বইঘর ওয়েবলিংক

বেশ তো! শুনবে, দু'একদিন পরে শুনো।

কভ্ভি নেহি। আজই শুনবো। টাটকা টাটকা। আজ না শুনলে ঘুমই আসবে না চোখে আমার।

এবার মেহের আলী বললো– জি ভাইজান, আজ না শুনালে আমাদের দুইজনের, মানে আমার আর মর্জিনা বিবির শোনাই হবে না এই পরের জনের জীবন কাহিনী।

কাসিদ সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– কেন-কেন? শোনা হবে না কেন?

কেন মানে, আপনি ফিরে এসেছেন শুনেই সেই আনন্দে দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছি আমরা। আমাদের বাড়িটা একজনকে দেখার কথা বলেই ছুটে এসেছি। কোন কিছু সামাল করে আসিনি বা দেখার কথাটাও ভাল করে বলে আসতে পরিনি। পরের দিনই ফিরে যাবো, এই ছিল চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত দুইজন মহান ব্যক্তির জীবন কাহিনীর কথা উঠায়, সেই কাহিনী শোনার জন্যে এই পাঁচ ছয় দিন ধরে এখানেই রয়ে গেছি। বাড়িতে ফিরে যাইনি। এরপর আরো দেরী করতে হলে আমাদের দুইজনের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয় ভাইজান। পরের জনের কাহিনী না শুনেই আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

কাসিদ সাহেব শশব্যস্তে বললেন– না-না, তা কেন? তাহলে আজই শোনাবো সে কাহিনী। কারো পুরোপুরি ঘুম হয়নি, এই চিন্তাতেই দেরী করতে চেয়েছিলাম।

লায়লা বানু বললো– তাতে কি আছে! রান্নাবান্না হয়ে গেছে। এখন খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লে আর আসরতক ঘুমালেই তো ঘুম অনেকখানি হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, অনেকখানিই হয়ে যাবে, তবে পুরোটা হবে না, এই আর কি!

হাসতে লাগলেন কাসিদ সাহেব। লায়লা বানু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– তো তাতে কি হয়েছে? মাত্র দুটো রাতের ব্যাপার তো। আপনার শোকে অমন কত রাত যে একদম নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটেছে আমাদের, সে খবর কি রাখেন?

কাসিদ সাহেব তাড়া দিয়ে বললেন– ওরে বাপরে! এরপর আর কথা চলে না। চলো চলো, সবাই খেতে যাই চলো। খেয়ে উঠে আবার একটু ঘুম আর এশার নামাজের পরেই আবার শুরু হবে দ্বিতীয় জনের কাহিনী।

***

এশার নামায অন্তে আবার যথারীতি বসে গেলেন সকলে। শুরু হলো মাওলানা মুহম্মদ জাফর থানেশ্বরীর দ্বীপান্তর জীবনের স্মৃতিকথা। কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব শুরু করে বললেন– মাওলানা জাফর থানেশ্বরী গ্রেপ্তার হন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আর মুক্তি পান ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

এই বিশ বছরের বন্দী জীবনের কাহিনী, অর্থাৎ তাঁর দীর্ঘ আন্দামান জীবনের অভিজ্ঞতা, ১৮৫৭ সালের ফৌজী বিদ্রোহ এবং জিহাদী আন্দোলন সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য তিনি 'তাওয়ারীখ-ই-আজিব' নামক একটি পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করেন। পুস্তকটি প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় লেখা। পুস্তকটি তাঁর জীবনস্মৃতি। "আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী" তারই স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ। আরবি ভাষার মতোই এই উর্দু ভাষাও তোমরা কেউ বুঝবে না। তাই, ঐ বঙ্গানুবাদটিই আমি সরাসরি পড়ে যাচ্ছি শুনো। একটি করে ছোট ছোট হেড লাইন দিয়ে বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে।*

ভূমিকা

আন্দামান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সারা ভারতের বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীরা আমার বন্দী জীবনের ইতিহাস জানতে চেয়ে সহস্রকণ্ঠে প্রশ্ন করতে থাকেন– কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছরের নির্বাসিত জীবনের অতীত কাহিনী যুগপৎ সকলের খিদমতে পেশ করা সম্ভব ছিল না। তাই সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী দিয়ে এই বইখানা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করি।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে "তাওয়ারীখ-ই-আজিব" নামে একখানা বই লিখি– সে আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারের ইতিহাস। তার কিছুদিন আগেই আমার মুক্তির আবেদনপত্রটি গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর নাকচ করেছিলেন। ফলে, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে, ছোট বড় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মনে একটি ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সে হল, আমি আর ছাড়া পাবো না। কিন্তু আমার মনোভাব আলাদা, করুণাময়ের অনন্ত অনুগ্রহ সম্বন্ধে

---

* 'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী' নামে উর্দু ভাষায় লেখা 'তাওয়ারীখ-ই-আজিব' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মাওলানা হাসান আলী এবং সম্পাদনা করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এই বাংলা অনুবাদটিই আমি আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এজন্যে অনুবাদক ও সম্পাদক উভয়ের কাছেই আমি কতজ্ঞ। - লেখক

কোনদিনই একদম নিরাশ হইনি। উল্লিখিত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলাম, গোটা দুনিয়াটাই যখন আশার বন্ধনে আবদ্ধ, তখন যবনিকার অন্তরাল কি রহস্য উদ্ঘাটিত হয় তাই দেখা যাক। উপসংহারে পাঠকদের খেদমতে এও নিবেদন করেছিলাম, তারা যেন দোয়া করেন যাতে সরকার আমাকে এই নির্বাসন থেকে সরিয়ে নেন, আর আমি দেশে ফিরে গিয়ে মাতৃভাষায় এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পারি।

আশ্চর্য, বই প্রকাশ হওয়ার পরপরই বিনা আর্জিতে আমার মুক্তির নির্দেশ এসে পড়লো। আদেশ দিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন। অবাক হয়ে ভাবি, এ যেন এক রহস্যময় হস্তক্ষেপেরই ফল।

থানেশ্বর শহরের ডেপুটি কমিশনার আমার বাসস্থান খানা তল্লাসী করার জন্যে টেলিগ্রাম যোগে আম্বালা জেলার কর্তৃপক্ষকে যার অধীনে থানেশ্বর শহর অবস্থিত, সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদদাতা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার একজন পুলিশ বন্ধু ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষাৎ মানসে তাঁর বাংলোতে উপস্থিত হন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তা জানতে পারেন এবং তাঁর ভৃত্য ও আমার প্রতিবেশী কাল্লুকে দুঃখের সঙ্গে তা বলেন। কাল্লু অবিলম্বে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে তক্ষুণি থানেশ্বরের দিকে ধাবিত হলো।

ভাগ্য আমার সংবাদদাতাকে আমার দরওয়াজার সম্মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ওদিকে টেলিগ্রাম পেয়ে আম্বালার পুলিশ সুপার ক্যাপ্টেন পার্সন এক বিরাট বাহিনীসহ খানা-তল্লাশীর পরোয়ানা নিয়ে সে রাতেই আমার বাড়ি এসে হাজির।

অদৃষ্টের পরিহাস লক্ষ করুন, দুইজন লোক– একজন কর্ণাল থেকে আমাকে অবহিত করার জন্য, অপরজন আম্বালা থেকে আমার গৃহ তল্লাশীর জন্য রওনা হলেন। প্রথমজন একজন পুলিশ, আমার হিতৈষী, কিন্তু আমার উপকার করতে পারলো না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি রাত্রি দুটোর সময় আমার বাড়ি পৌঁছে বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেললেন। তারপর ডাকলেন আমাকে। বাইরে এসে দেখি অভিনব দৃশ্য। সুপার আমাকে ওয়ারেন্ট দেখিয়ে বললেন– ইনকোয়ারির অনুমতি দিন।

বুঝলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে। চিন্তা করে দেখলাম প্রথমে ভেতরের ঘরে তল্লাশী হওয়াটাই ভাল। কারণ বাইরের ঘরে যে সর্বনাশা চিঠিটা লেখা রয়েছে তা যেন কোনক্রমেই পুলিশের হাতে না পড়ে। কিন্তু যা হবার তা হয়েই আছে, তা রোধ করার বৃথাই চেষ্টা। ও ঘরে মুনশী আবদুল গফুর ও আরো কয়েকজন নিদ্রিত ছিলেন। আমি এই বলে উঁচু গলায় ডাকতে থাকি 'পুলিশ সুপার ইন্‌কোয়ারীর

বইঘর.ও রোকন
জন্যে বাইরে আছেন– জলদি দরজা খুলুন।'

আমার উদ্দেশ্য ওরা যেন তল্লাশীর কথা শুনে দরজা খোলবার আগেই ঐ বিষাক্ত পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলেন। সুপার আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে আমাকে বাধা দিলেন। আমি তাঁর বাধা উপেক্ষা করে চেঁচাতেই থাকি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম কপাল তা হতে দিল কই! ভেতরের শায়িত লোকগুলো আমার চিৎকারের ইঙ্গিত কিছুই বুঝতে পারলো না; বরং ঘাবড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

বৈঠকখানায় অনুসন্ধান চলতে লাগলো এবং সেই পত্রখানা, যার জন্যে এত কিছু, সর্বপ্রথম আগে আমি এটা লিখেছিলাম। চিঠিটাতে মুজাহিদ বাহিনীর নামে কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের কথা আছে। এছাড়া পাটনা থেকে পাওয়া আরো কিছু পুরনো চিঠি এবং আম্বালা নিবাসী মোহাম্মদ শফীর পত্রখানাও ওরা পেয়ে গেল। এ সকল চিঠিপত্রে আপত্তিকর বিশেষ কিছু না থাকলেও এর ফলে পুলিশ বুঝতে পারলো যে, মুহম্মদ শফী ও পাটনার কিছু সংখ্যক লোকের বাড়ি অনুসন্ধান করা একান্তই অপরিহার্য। (এখানে) অনুসন্ধান কার্যশেষ করে পুলিশ মুনশী আবদুল গফুর আমার একজন মহুরী আর আব্বাস নামে একজন বাঙ্গালা ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আমিও পুলিশের দারুণ সন্দেহভাজন কিন্তু পরোয়ানা ও সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে বোধ হয় এ যাত্রা রেহাই পেলাম।

তবু পুলিশ চলে গেলে, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হল (আমার)। আমার ঘর থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বরূপ যে সকল কাগজপত্র তাদের হস্তগত হয়েছে আমার শাস্তির অনুকূলে সেগুলোই যথেষ্ট ছিল। তাই এখান থেকে ফেরার হওয়াই সঙ্গত মনে করলাম। এ ঠিক যে, প্রত্যক্ষভাবে আমি প্রহরাধীন ছিলাম না, কিন্তু তারা চতুর্দিক থেকে আমার সন্ধান নিচ্ছিল। মা ও স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলাম। আত্মগোপনে তাদের সম্মতি নিয়ে বের হয়ে যাই। একটা চালাকি করলাম। বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে প্রথমত পিলাপিলি নামক স্থানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে তহসীল ও থানা আছে। সেখানকার কর্মচারী ও পুলিশদের কাছে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলাম। তাদের সকলেই একবাক্যে আম্বালা গিয়ে ব্যাপারটার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জেনে আসতে বললো।

ফেরার

তাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ শেষে সন্ধ্যে বেলা পথে এসে নামলাম এবং বড় সড়ক ধরে পিলাপিলি থেকে আম্বালার দিকে রওয়ানা দিলাম। তখন তাদের অনেকেই অনুরাগ ও অনুকম্পাভরে সকরুণ দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখছিল।

বইঘর ও রোকন
আমি অশ্বারোহণ করেছি, তখন সকলেই বিশ্বাস করছিল আমি সত্যিই আম্বালা যাচ্ছি। দিনের আলো যতক্ষণ ম্লান হয়নি, আমি ঐ রাজপথ ধরে বরাবর আম্বালার দিকেই এগিয়ে চলছিলাম। মাইলটেক রাস্তা ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আম্বালার সড়ক ছেড়ে দিয়ে নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলের পথ ধরে থানেশ্বরের কাছাকাছি আমার নিজ জমিদারীর অন্তর্গত একটি পূর্ব নির্দেশিত জায়গায় যখন আসি, তখন রাত আটটা বাজে। দেখি, পরামর্শমতো আমার মা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর ছোট ভাই সাঈদ আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য আগেই উপস্থিত। তারপর, কয়জনকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আমি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে একখানি দ্রুতগামী গাড়িতে করে ভোরবেলা পানিপথে পৌঁছি। বত্রিশ ক্রোশ রাস্তা কম নয়। শহরে প্রবেশ না করে সড়কের উপরই সহধর্মিণী ও পুত্র-কন্যাদের বিদায় করলাম। সেখান থেকে একযোগে চল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে পরদিন একা দিল্লী গিয়ে উঠি। মিয়া বশীর উদ্দিন সওদাগরের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। www.boighar.com

এখানে থানেশ্বরের মিঞা হুসাইনী, পাটনার হুসাইনী ও আবদুল্লাহ নামে এক বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। শেষের দুইজন পাটনা থেকে কিছু আসরাফী নিয়ে এসেছিল। আমি সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে থানেশ্বরের মিঞা হুসাইনীর হাতে দিলাম। তাকে নির্দেশ দিলাম, সে যেমন করেই হোক, এই অর্থ যেন সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর নিকট পৌঁছে দেয়। হুসাইনী থানেশ্বরীকে বিদায় দেবার পর, আগন্তুক দু'জনকে আমার সঙ্গে পূর্বদিক নিয়ে যাবো ঠিক করি। তখন পর্যন্ত এই ধারণাই পোষণ করছিলাম– পথ পরিবর্তনের আমার এই চালাকি কেউ বুঝতে পারেনি। কাজেই আমার সন্ধানে এদিকে আসবে না কেউ। আম্বালায় বা তার পশ্চিম উপকণ্ঠেই আমার খোঁজাখুঁজি হতে থাকবে।

এজন্যে দিল্লী পৌঁছেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিনি। বরং শিকরাম ভাড়া করার জন্য স্বাভাবিক পোষাকে আমি স্বয়ং চাঁদনি চক পর্যন্ত গেলাম।

পনেরো ডিসেম্বর আমরা তিনজন শিকরামে সওয়ার হয়ে আলিগড় কোয়েলের পথে যাত্রা করি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়েলে পৌঁছে রেলগাড়ীতে চড়তে হবে। প্রাণপণে চলবার জন্যে গাড়োয়ানদের বকশিশ দিলাম। তখন পর্যন্ত কোয়েলের বাইরে রেললাইন বিস্তার লাভ করেনি।

তাড়াতাড়ি ষ্টেশানে পৌঁছাই একমাত্র কামনা। কিন্তু কি করিব, ভাগ্যের ফের। কয়েকটি চৌকিতে ঘোড়া না পাওয়ায় গাড়ী অকেজো। তখন বাধ্য হয়ে অন্য একটি ভাড়া করলাম। এত চেষ্টা সত্ত্বেও আলিগড়ে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল।

তবু আমার মনে হলো, যে খেলা খেলে এসেছি তাতে কিছুদিন অন্তত কেউ

বইঘর ও রোকন
আমাকে এ পথে সন্ধান করতে আসবে না। এবার আম্বালার দিকে একটু ফেরা যাক।

বারই ডিসেম্বর পার্সন সাহেব তল্লাশীর পর চলে গিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করবার সরকারী অনুমোদন লাভ করেন। পরের দিন তিনি সেই পরোয়ানাসহ থানেশ্বরে এসে হাজির। আমাকে না পেয়ে সমগ্র শহরে মহাতাণ্ডব শুরু করে দিলেন। বহু বাড়িতে তল্লাশী করা হল। অসংখ্য নরনারী গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ছিল আমার মা, ছোট ভাই ও তার বৌ। পুলিশ নির্মমভাবে এদের মারধোর করতে লাগলো। অকথ্য অত্যাচারের পরেও তারা ক্ষান্ত হলো না। পর্দানসীন মহিলাদেরকে এরূপ বেইজ্জতিও করা হলো যে, সে কাহিনী হৃদয় বিদারক। আমার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পানিপথ পর্যন্ত ধাওয়া করলো। কিন্তু মৌলভী রাজিউল ইসলামের নির্ভীক চেতা মায়ের সাহসিকতায় সে রক্ষা পেল।

অত্যাচার আর উৎপীড়ন সইতে না পেরে আমার ছোটভাই, যার বয়স তখন বারো কি তেরো, বলে দিল– আমার ভাই দিল্লী চলে গেছেন।

অনুসন্ধান ও পুরস্কার ঘোষণা

তৎক্ষণাৎ পার্সন সাহেব তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকগাড়ি যোগে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে পাঞ্জাবের সর্বত্র আমার অনুসন্ধান চলতে লাগল। আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ক্যাম্প আম্বালায় মুহম্মদ শফীর ঘরে খোঁজ করবার সময় দৈবাৎ তিনি লাহোরে ছিলেন। কাজেই তার দুইজন কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তারা সন্দেহের শিকার। একজন মৌলভী মুহম্মদ তকী, আরেকজন মুনশী আবদুল করিম। তাদেরকে ভয় দেখান হয়– যদি তারা সকল তথ্য প্রকাশ না করেন তাহলে তাঁদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হবে। প্রাণের ভয়ে মুহম্মদ শফীর সহোদর রকী ও মৌলভী তকী, যিনি তাঁর বহু পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী ও মসজিদের ওয়ায়েয, মুহম্মদ শফীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়ে গেলেন এবং পুলিশ যা শিখিয়ে দিল তাই আউড়ে জীবন রক্ষা করলেন। পক্ষান্তরে মুনশী আবদুল করিম পুলিশের তালিম মতো সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিনাদোষে মুহম্মদ শফীর সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন।

এদিকে পার্সন সাহেব দিল্লী পৌঁছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সমগ্র নগরী মন্থন করে ফেরলেন। হোটেল ও শহরের প্রবেশ দ্বারগুলো বন্ধ করে দিলেন। হাজার হাজার লোকের দেহ তল্লাশী ও শত শত লোককে গ্রেফতার করা হল। এ সকল ধরপাকড়ের সময় তাঁর কর্ণগোচর হলো, আমি অমুক শিকরাম যোগে

অমুক সময়ে আরো দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে আলিগড় কোয়েলে রওয়ানা হয়ে গেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম যোগে আলিগড়ে আমাকে গ্রেফতার করবার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

গ্রেফতার

অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস, আলিগড় বা আমার বাড়ি থেকে মাত্র দুশো মাইল দূরে, সেখানে যাওয়া মাত্র টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছে। তখনই পুলিশ আমাদের বেষ্টন করে ফেলল। এরপর জেলা সুপারের বাংলোতে নিয়ে গেল। তিনি আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি আর আমার সাথী দুইজনকে গ্রেফতার করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট যে তার বার্তা পাঠানো হলো, তার জবাব না আসা পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্থান থেকে আমাদের জেল হাজতে নিয়ে গেল।

সেদিনই সকাল বেলা আমি নামায পড়ছিলাম। তখন পার্সন সাহেব গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাকে বন্দীদশায় দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী। হুকুম দিলেন– 'একে ফাঁসির ঘরে খুব সাবধানে বন্ধ করে রাখ' আদেশ যথারীতি প্রতিপালন করা হলো।

একটা অতি সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে নিয়ে আমাকে বন্ধ করল। তার চারদিকে দু'তিন জন পুলিশের পাহারা।

খাদ্য

জীবনে এই প্রথম আমার জেলখানার খাদ্য খাওয়া। দুটি রুটি ও কিছু শাক আমার ভাগ্যে জুটলো। শাকের বর্ণনা আর কি দেব? মোটামুটি কয়টি ডাঁটা ছাড়া তাতে পাতার চিহ্নমাত্র নেই আর সেগুলো চিবানও কঠিন। রুটিগুলো যে আটা দিয়ে তৈরী হয়েছে তার চার আনাই বালু আর মাটি। করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করে তাই খেলাম। আমার পরবর্তী কারাগারগুলোতেও প্রায় সর্বত্র কয়েদীদের জন্য এরূপ খাদ্যই দেখতে পেয়েছি। এর কারণ, কয়েদীরা পেট ভরে খেতে পায় না। সুতরাং তারা যখন গম ভাঙ্গতে বসে, তখন ক্ষুধার জ্বালায় সেরে সেরে আটা চিবিয়ে বা পানিতে গুলে খেয়ে ফেলে এবং আটাতে বালু মিশিয়ে ওজন পূরণ করে দেয়। এভাবেই জেলখানার বাগানে হওয়া শাকসব্জি ও তরিতরকারী বিক্রি করে দেয়া হয়, অথবা অফিসারদের ভোগে চলে যায়। অগত্যা, অকেজো ডাঁটাগুলো যা জানোয়ারেও খায় না, তাই দা দিয়ে কুপিয়ে

কয়েদীদের জন্য পাক করা হয়। ভূখা কয়েদীদের কাছে এগুলোই রীতিমতো নিয়ামত। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে। নবাগতদের তা হঠাৎ গ্রহণ করা কষ্টকর। কিন্তু শীঘ্র জঠর জ্বালায় কঠোর দাহনে তারাও একেই পোলাও কোর্মার চেয়ে উপাদেয় মনে করে; কারণ এ জগতে সকল স্বাদের মূল হল ক্ষুধা।

জীবন-মরণ

পরদিন পার্সন সাহেব আমাদের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে পরমানন্দে দিল্লী রওনা হলেন। বাহন শিকারাম, তাতে আরোহণ করবার পূর্বে আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া ও গলায় একটি তৌক বা গলফাঁসের সঙ্গে আরো একটি লৌহশৃঙ্খল সংযোজিত হল এবং তার অপরপ্রান্ত একজন অস্ত্রধারী সিপাইয়ের হাতে দিয়ে তাকে আমার পেছনে বসালেন। স্বয়ং তিনি ও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ডান বা দু'ধারে হাতে তাঁমাচা নিয়ে উপবিষ্ট; পথ চলতে চলতে বার বার শাসাচ্ছিলেন, যদি একটুও নড়াচড়া করি তাহলে এই তাঁমাচা দিয়ে মারবেন। আলিগড় থেকে দিল্লী পর্যন্ত খানাপিনা তো দূরের কথা, প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও কোথাও একটু নামতে দেয়া হয়নি।

অবশেষে অতিকষ্টে লোহার শিকলি পরা অবস্থায় দিল্লী প্রবেশ করলাম। সেখানে ডিষ্ট্রিক পুলিশ সুপারের বাংলোতে একটি নিরন্ধ্র কক্ষে জীবন্ত কবরস্থ করার মতো আমাদের বন্ধ করে দেওয়া হল।

পরদিন দিল্লী থেকে কর্ণাল এবং কর্ণাল থেকে আম্বালায় অপসারিত হলাম। যখন সেখানে পৌঁছি, রাত অনেক। খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বিনা পানাহারে আমাদের তিনটি প্রাণীকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করা হল। এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত আমরা এখানেই ছিলাম।

পরদিন ভোর বেলা মিঃ পার্সন, মেজর উনকফিল, পুলিশের ডি.আই.জি. এ আম্বালার ডিপুটি কমিশনার ক্যাপটেন টাই ইয়াজুজ মাজুজের মতো আমার কামরায় ঢুকলেন। তাঁরা আমাকে বললেন– 'যদি মঙ্গল চাও তো সব খুলে বল।'

বললাম, 'আমি কিছুই জানি না।'

তখন পার্সন সাহেব আমাকে খুব ধমকালেন। তাতে উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় প্রহার শুরু করলেন।

পিটুনি চরমে পৌঁছলে আমি পড়ে গেলাম। তখন টাই ও উনকফিল কামরার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই নিদারুণ মারের পরেও আমি স্বীকার করলাম না। তারা বিফল, বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন।

যুলুম আর অত্যাচার যখন এই পর্যায়ে পৌঁছলো, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল এরা আমাকে কিছুতেই জীবন্ত ছেড়ে দেবে না। রমযানের কিছু রোজা কাযা ছিল, পরদিন থেকেই সেগুলো আদায় করতে থাকি।

আমি যখন রোযাদার, পরদিনও পার্সন সাহেব প্রত্যুষে এসে আবার মারপিট শুরু করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে আমাকে টাই সাহেবের বাংলোতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটে দৈত্যই মজুদ ছিল। একসাথে তাঁরা আমাকে খুব তোয়াজ করলেন। বললেন– তুমি যদি অন্যান্য মুজাহিদ ও জেহাদে সাহায্য পাঠায় যারা, তাদের নাম বলে দাও, তাহলে আমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাকে সরকারী সাক্ষী করে শুধু মুক্তিই দেবো না রাজ সরকারের উচ্চ পদেও বহাল করবো। আর যদি কিছু না বলো, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে।

কিন্তু আমি নির্বিকার। এত লোভ দেখিয়ে আমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে তারা ইংরেজিতে কি বোঝাপড়া করলেন, তারপর আমাকে একটি পৃথক কামরায় নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়েই ফের মারপিট। আঘাতের পর আঘাত, প্রহারের পর প্রহার। আমি তার কতটুকুই বা বর্ণনা করতে পারি? সংক্ষেপে, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এরূপ বিরামহীন প্রহার চলতে লাগল যে, কোন দিন কারো 'পরে এহেন নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বা-ফযলে ইলাহী সকলই সহ্য করে গেলাম এবং আপন প্রভুর সান্নিধ্যে এই মুনাযাতে নিমগ্ন ছিলাম, হে খোদা! দীন বন্ধু করুণা সিন্ধু! যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে ঈমানের এই অগ্নিপরীক্ষায় অবিচলিত থাকবার তওফিক দাও!

তারা সর্বোতভাবে ব্যর্থ হলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে রাত আটটার পর আমাকে জেলখানায় ফেরত পাঠালেন।

সারাদিন রোযা ছিলাম। বাংলোর বাইরে এসে গাছের পাতা ছিঁড়ে ইফতার করলাম। অতঃপর জেলখানায় আমার যে খাবার রক্ষিত ছিল তাই খেয়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে শুয়ে পড়ি।

'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী' পড়ে যাচ্ছেন কাসিদ আহসান সাহেব। দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছে লায়লা বানু। হজরত আলী, মেহের আলী ও অন্যান্যরা।

তহসীলদার

টাই সাহেবের বাংলোয় পুলিশ সুপারের হাতে নির্যাতন ভোগ করবার দিন বাংলোর বারান্দায় একজন মুসলমান তহসীলদার বসেছিল। জানতে পারলাম, তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার অপরাধ আমার গ্রেফতার হওয়ার

কয়েক বছর আগে কিছু সাংসারিক ব্যাপারে আমাকে একটা পত্র লিখেছিল। আদালতের কয়েকজন কর্মচারী শত্রুতা করে কর্তৃপক্ষের নিকট এই পত্রের ভুল ব্যাখ্যা দাখিল করে। ফলে তার এই হাল। তার ম্লান মুখ দেখে নিজের বেদনা ভুলে গেলাম। মনে মনে ভাবতে থাকি, 'আহা! আমার মতো অপদার্থকে একটা চিঠি লেখার অপরাধে বেচারার কি দুর্গতি! তার বদলা যদি আমারই সাজা হতো! আর সে মুক্তি পেয়ে যেত!

অকথ্য নির্যাতনের মধ্যেও আমি তারই জন্য দোয়া করছিলাম। করুণাময়ের অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত সে ছাড়া পেয়েছিল এবং তার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদে বহাল আছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও ধরপাকড়

ঐ তারিখের পর থেকে আর কোনদিন আমাকে সাক্ষী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয়নি। আমার সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে নিরাশ হয়ে মুহম্মদ রফী ও মৌলভী তকীকে– যারা আমারই মতো কয়েদী– হস্তগত করবার সাধনায় তাঁরা কৃতকার্য হলেন এবং তাদেরকে সমস্ত গুপ্তরহস্যের সংবাদদাতা নিযুক্ত করে ছেড়ে দেন। এদেরই বর্ণনাক্রমে মুহম্মদ শফীকে, এই ব্যাপারের সঙ্গে যার সামান্যই সম্পর্ক, লাহোর থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়। এদেরই নির্দেশে পার্সন সাহেব পাটনায় চলে যান। পাটনায় ঈশ্বরী প্রসাদ একজন পুলিশ কর্মচারী আর মিঃ টেইলার পাটনার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার। পরের জন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আহমদুল্লাহ প্রমুখ মুজাহিদীনকে বিনা দোষে নজরবন্দী করে রাখার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। এরাই এক্ষণে পার্সন সাহেবের সাহায্যকারী। তারা তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করতে লাগলেন। এদেরই প্ররোচণায় পার্সন সাহেব মাওলানা ইয়াহহিয়া, আলী, মাওলানা আবদুর রহিম, এলাহী বখশ সওদাগর ও মিঞা আবদুল গাফফারকে গ্রেপ্তার করে পাটনা থেকে আম্বালা পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে চলে যান। সেখানে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করেন। তাঁদের মধ্যে অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার ভীতি প্রদর্শন করে সাক্ষীর তালিকায় নাম লিখিয়ে নেন। হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়েও দেন অনেক লোক। একমাত্র কুমারখালি নিবাসী কাজী মিঞাজান অচল অটল রইলেন এবং গ্রেফতার হয়ে আম্বালায় পৌঁছলেন। দিল্লীর দুইজন সওদাগর বশীরউদ্দিন ও আলাউদ্দিন ও আরো বহুলোক দিল্লী থেকে গ্রেফতার হয়ে এলেন। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ পেশোয়ার থেকে দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার সীমান্ত বরাবর কোন বিত্তশালী মুসলমান,

কোন মৌলভী, এমন কি কোন নামাযী পর্যন্ত এই ধরপাকড়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পুলিশ যাকেই একবার আটক করেছে, তাকে দিয়ে নিজের পকেট গরম করে নিয়েছে। মোটকথা, এই প্রথম ধাক্কা ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত (১৮৬৩-৬৪) ধরপাকড়ের তুমুল ঝড় বইতে থাকে। শত শত লোককে ভয় দেখিয়ে ও শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল। এই পার্সানী অভিযান (চবৎংড়হধষ ঊীঢ়বফরঃরড়হ) এর কবলে পড়ে বেচারা হুসাইনী থানেশ্বরীও অনেকগুলো আশরাফীসহ দিল্লী থেকে ফেরার পথে গ্রেফতার হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও বাজেয়াপ্ত হলো এবং সে নিজে আমাদের সঙ্গেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

সত্যের বিকৃতি ও স্বার্থসিদ্ধি

এই ঘটনার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বড় বড় ইংরেজ অফিসার পর্যন্ত আইন কানুনের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতো হিন্দু-মুসলমানেরাও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রশিকে সাপ ও সরিষাকে পাহাড়ে পরিণত করে দেখিয়েছে। অকারণে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এবং আমাদেরকে নেপোলিয়ন বা মাহদী সুদানীর ন্যায় বৃটিশ গভর্নমেন্টের কল্পিত শত্রু সাজিয়ে তারা আপন আপন স্বার্থ উদ্ধারে ডিপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদসমূহে জুড়ে বসলো এবং অনেকেই গভর্নমেন্টকে প্রবঞ্চনা করে বড় বড় জমিদারী ও জায়গীর লাভ করলো। আর আমার সেই সংবাদদাতা গজন খাঁ নিজ পুত্রকে অবলম্বন করে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ দু'একটি গ্রামের জায়গীর পেয়ে গেল।

এরপর ফের বই থেকে চোখ তুলে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তার শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে মুখে বললেন–

'মিশকাত শরীফের সাক্ষ্য' শিরোনামে ছোট ছোট অনেকগুলো হেডিং সম্বলিত বিরাট এক অধ্যায় রচনা করেছেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী সাহেব। তাঁর বইতে এই অধ্যায় শেষ করে তিনি আবার মূল বর্ণনায় ফিরে এসেছেন। সেই মূল বর্ণনাই আবার পড়ছি, শোনো। পড়তে লাগলেন কাসিদ সাহেব–

অযথা হয়রানি

আবার সেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আম্বালা যুদ্ধের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ব্রিটিশ সৈন্য নিতান্ত অকারণে নিজ রাজ্য সীমানার বাইরে পররাজ্য ইয়াগিস্তানে

জবরদস্তি আক্রমণ করে বসলে সমগ্র ইয়াগিস্তানের অধিবাসী ও সোয়াতের আকন্দ সাহেব ভয়ানক চটে গেলেন। আম্বালার ময়দানে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হল। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে আফগানদের বশ করা না হলে একটি ইংরেজ সৈন্যও জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারতো না। এমনি অযৌক্তিক যুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ খুবই স্বাভাবিক। কাজেই গভর্নমেন্টের বিপুল ক্ষতি সাধিত হলো। আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত গত দুটি যুদ্ধের মতো আম্বালার যুদ্ধেও গুরুতর পরাজয় বরণ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ফিরে আসতে হলো বটে, কিন্তু কথায় আছে, 'গাধার কিছু করতে না পারো তো গাধার কান মলে দাও।' তেমনি ভাবেই যেন ইংরেজ সরকার আফগান ও উপজাতীয়দের প্রতিকার সাধনে ব্যর্থ হয়ে আসার পর আমাদের, গরীব প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন শুরু করে দিলেন।

নয়া যুলুম

যাকে ইচ্ছা খেয়াল খুশীমত শাস্তি দিতে লাগলেন এবং শত শত মুসলমানের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। ১৮৬৩ সালের শেষ ভাগ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ভারতে মুসলমানদের উপর কেয়ামতের আযাব চালু রাখলেন। হাজার হাজার মুসলমান শুধু প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে আরব ও গায়রাহ দেশে হিজরত করে চলে গেল। স্বার্থপর খয়ের খাঁ ও শক্রুর দল মনের সাধ মিটিয়ে চড়ে বেড়াতে থাকে। পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজসমূহে দশ বছর যাবত প্রায় এই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়।

রাওয়াল পিণ্ডিতে

ধরপাকড়ের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি তৈয়ার করার প্রয়োজনে একটি ডিপার্টমেন্ট খোলা হল। যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করা হত এবং যার ইচ্ছা ঘুষ খেতো। যে ঘুষ দিতে অসমর্থ, সামান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। চেম্বারলেন সাহেব স্বয়ং ওহাবী ধরপাকড়ের এই নবগঠিত ডিপার্টমেন্টের কমিশনার নিযুক্ত হলেন এবং রাওয়াল পিণ্ডিতে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হলো। অবস্থা এদ্দুর গড়াল যে, দিল্লীর মোহাদ্দেস মওলানা নযির হুসাইন, যিনি প্রকৃতই ছিলেন ব্রিটিশের হিতৈষী, ওয়াহাবীদের গোয়ান্দাগিরি করার অভিযোগে রাওয়াল পিণ্ডিতে আহূত হলেন।

চেম্বারলেনের মৃত্যু ও অতঃপর

কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আগেই আকস্মিকভাবে চেম্বারলেন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিপজ্জনক দপ্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে কেউ রাজী হলো না। সুতরাং তার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে গেল।

বিচার প্রহসন

তবু ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ধরপাকড় পালা চলতেই থাকলো। এপ্রিল মাসে জেলা আম্বালার ম্যজিস্ট্রেটের কোর্টে আমাদের মামলা উপস্থাপিত হলো এবং আমরা কারাগারের মৃত্যুকূপ থেকে আদালতে এসে হাজির হলাম। তখন জানতে পারলাম, আমার ছোট ভাই মুহম্মদ সাইদকে আমার বিরুদ্ধে ও মুহম্মদ শফীর ছোট ভাই মুহম্মদ রফীকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফাঁসির ভয় দেখিয়ে সাক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আরো পঞ্চাশ ষাটজন লোককেও যাদের অধিকাংশই মোল্লা মৌলভী, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এইসব সাক্ষীর অনেকেই আমাদের মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু উপায় নেই, সাক্ষ্য না দিলে পুলিশের উদ্যত দণ্ড ছাড়াও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার আশংকা। তাঁরা সেসন কোর্টে তাঁদের সাক্ষ্যপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কয়েদীদের মতো পুলিশের প্রহরাধীন ছিলেন এবং পুলিশের পক্ষ থেকেই তাঁদের জন্যে উপাদেয় খাদ্য ও পোষাকের ব্যবস্থা করা হত। এমনই সব গর্হিত কাজে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ই হচ্ছিল।

পুলিশ-জুলুম

পুলিশ নির্যাতনের কাহিনী তো বেদনাদায়ক। আব্বাস নামে একটি ছেলে, দীর্ঘকাল আমার ঘরে প্রতিপালিত হয়। আদালতে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুহব্বতের খাতিরে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনা দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। সেদিন রাতেই তাকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়ে যে, সেসনকোর্টে মোকদ্দমা পেশ হবার আগেই এই নিরপরাধ বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু নরহত্যার দায় থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য পার্সন সাহেব ছেলেটি রোগাক্রান্ত হয়ে মরেছে বলে ঘোষণা করলেন।

প্রথম যেদিন আমাদের আদালতে হাজির করা হয়, আমার ছোটভাইও অনিচ্ছুক সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে পুলিশ প্রহরায় কোর্টে এলো। একজন সিপাইয়ের মারফত সে আমাকে জানাল যে, পুলিশ লৌহদণ্ডের সাহায্যে তাকে আমার

বিরুদ্ধে সাক্ষী নিযুক্ত করেছে। প্রহার করে সে মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। এখন এজলাসে তা অস্বীকার করতে চায়। জবাবে আমি বলে পাঠালাম, আমার মুক্তি পাওয়া না পাওয়া তার বর্ণনার উপর মোটেই নির্ভর করে না। সুতরাং ওর পূর্ব প্রদত্ত বর্ণনা যদি হলফের গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে এখন বিপরীত বর্ণনা দিতে গেলে মিথ্যা হলফের দায়ে গুরুতর শাস্তি হয়ে যেতে পারে। এও বোঝালাম, আমি তো আবদ্ধ হয়েই আছি, উপরন্তু সেও যদি আটকা পড়ে, তাহলে বর্ষীয়সী মা দুঃখের পর দুঃখ সইতে না পেরে ইন্তেকাল করতে পারেন। সুতরাং তার পূর্ব প্রদত্ত বর্ণনার কোন পরিবর্তন না করাই বাঞ্ছনীয়। এতদসত্ত্বেও আমার সম্মুখে যখন এজহার হতে থাকলো তখন সে তার আগের এজহারকে অস্বীকার করে বসলো। ইংরেজ প্রভুরা তার এই বিরুদ্ধ-বর্ণনায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেও, বয়সের স্বল্পতার জন্য শাস্তি দিতে পারেনি। শুধু সাক্ষীর তালিকা থেকে নাম কেটে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।

সাক্ষীর সংখ্যাধিক্যের জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র এই মামলাই চলতে থাকে। ইংরেজ প্রভুরা আমাদের প্রতি এতই বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন যে, নামায পড়বার অনুমতি প্রার্থনা করলেও তা মঞ্জুর করা হত না। কিন্তু তারা আমাদের নামায বন্ধ করবেন কি রূপে? মামলা চলতে থাকাকালেই তৈয়ম্মম করে বসে বসে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায সমাপন করে নিতাম। এক সপ্তাহকাল চলবার পর আমাদের মোকদ্দমা সেশনে সোপর্দ করা হলো।

এ যাবত কাল আমরা পৃথক পৃথকভাবে ফাঁসিগৃহেই বন্দী ছিলাম। মামলা সেশনে দেওয়ার পর আমাদের সকলকেই জেল হাজতে বন্ধ করা হলো। দীর্ঘদিনের একক ও নির্জন বাসের দুঃখ দুর্ভোগের পর সকল বন্ধু একসঙ্গে মিলিত হতে পেরে অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমি তো প্রায়ই শেখ সাদীর এই বয়েতটি আওড়াতাম, যার অর্থ– 'অপরিচিতদের সঙ্গে কুসুম কাননে ভ্রমণের চেয়ে বন্ধু মহলে শৃঙ্খলিত পদে বাস করাও শ্রেয়।'

কিছুদিন পর এপ্রিলের শেষ ভাগে সেশন কোর্টে মেজর এডওয়ার্ডস সাহেবের এজলাসে আমাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হলো। ওখানেও এক সপ্তাহ পর্যন্ত মোকদ্দমার আয়োজন চলতে লাগলো। মুহম্মদ শফী ও আবদুল করিমের তরফ থেকে ব্যারিষ্টার মিঃ গেডাল নিযুক্ত ছিলেন। তারপর মামলা শুরু হলে, পাটনার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তদ্বিরকারী মওলানা মুহম্মদ হাসান ও মওলানা মুবারক আলী মিঃ প্লুডন নামক আর একজন উকিল নিয়োগ করলেন। ইনি একজন অভিজ্ঞ। বিচক্ষণ ও প্রধান আইনজীবী।

মিঃ প্লুডন তাঁর মুক্তার মালা সই করার জন্যে আমাদের কাছে গেলে মওলানা

আবদুর রহীম, মওলানা ইয়াহইয়া আলী, ইলাহী বখশ সওদাগর, হুসাইনীদ্বয়, কাজী মিঞাজান, আবদুল গাফফার ও মুনশী আবদুল গফুর প্রমুখ আটজন বিবাদী তাতে স্বাক্ষরদান করলেন। কিন্তু আমি দস্তখত দেইনি। বললাম, 'আমি তো নিজেই উকিল, আমি নিজেই আমার জবাবদিহি করব।'

মওলানা ইয়াহইয়া আলীও উকিল নিয়োগ করা ও এইভাবে অর্থ অপচয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি এমনই তরল ও নির্ঝঞ্ঝাট লোক, অনুরোধ করা হলে তিনি বিনা ওযরে দস্তখত করে দিলেন।

বিচার প্রহসন

সরকার পক্ষের উকিল ও তদবিরকারী ছিলেন মেজর উনকফিল ও মিঃ পার্সন। অপরপক্ষে দশজন বিবাদীর তরফ থেকে দুইজন উকিল নিয়োগ করা হয়েছিল এবং আমি স্বয়ং আমার জবাবদিহি করছিলাম। যখন কোন সাক্ষীর বর্ণনা আরম্ভ হত, তখন প্রথমে সেশন জজ তা লিখতেন ও স্বয়ং সওয়াল জেরা করতেন। তারপর আসত সরকারী উকিল এবং তারও পরে বিবাদীদের উকিলের সওয়াল জেরার পালা। সর্বশেষে আমি আমার সওয়াল জেরা সম্পন্ন করতাম। যেহেতু আমি এই মামলা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ওয়াকিফহাল, সাক্ষীদের সকলের অবস্থা, জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সুপরিচিত, ওকালতি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলাম এবং সওয়াল জেরার কৌশলও অন্যের তুলনায় ভাল ছিল, সেজন্যে অধিকাংশ সাক্ষীই আমার প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে দোহাই দোহাই করতো। এই মোকদ্দমায় সর্বসাধারণের জন্য আদালত খোলা থাকতো। তাই, বহুসংখ্যক দেশীয় ওদেশীয় ইংরেজ দর্শক এই বিচার প্রহসন দেখার জন্যে ভিড় করতেন। আম্বালা জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক প্রসেসররূপে আহূত হয়েছিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর বিবাদীদের জবানবন্দী তলব করা হল। দশজন আসামীর জবাব লিখিতভাবে তাঁদের উকিল দাখিল করলেন। অতঃপর সেশন জজ বাহাদুর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– 'বল, তোমার কি বলবার আছে।'

আমি সরকার পক্ষের প্রদত্ত প্রমাণপঞ্জীর প্রতিবাদ করে নেহাৎই যুক্তিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে আমার কৈফিয়ৎ লিখিয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ লেখার পর জজ সাহেব রাগে গর গর করে বললেন– 'এই জবাবে তোমার কোনই লাভ হবে না। বরং অপরাধ স্বীকার করে আদালতের অনুগ্রহ চেয়ে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

শত্রুর মুখে এই নীতিকথার সবক পেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম এবং

পরক্ষণেই বললাম, 'আমি শুধু ন্যায়বিচার পেতে চাই। কিন্তু দেখছি, আপনার কাছে তা পাবার কোন আশাই নেই।'

আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য দশ বার জন সাফাই সাক্ষী হাজির করতে চাইলাম। কিন্তু তা মঞ্জুর করা হল না। তারপর ১৮৫৪ সালের ২রা মে রায় প্রদানের তারিখ ধার্য হল। সেদিন আমি নিজেই আমার সাক্ষীদের উপস্থিত করলাম। কিন্তু এখনও তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হল না। মুহম্মদ শফী প্রমুখ অন্যান্য বিবাদীর অধিকাংশের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়া হল। কিন্তু সমস্তই নিরর্থক। কে কার কথা শোনে? বরং মুহম্মদ শফীর পক্ষ থেকে তাঁর সরকার-হিতৈষণা, তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ও নিজের প্রশংসিত কর্মজীবনের প্রমাণস্বরূপ যে শতাধিক সার্টিফিকেট দাখিল করা হলো, তার উত্তরেও বিদ্বেষ বহ্নি জর্জরিত জজ বাহাদুর মন্তব্য লিখলেন যে, এ সকল সার্টিফিকেটের প্রতিটি ছত্র অকাট্যভাবে মুহম্মদ শফীকে দোষী, অপরাধী ও দণ্ডিত হবার যোগ্য বলে প্রমাণ করেছে।

আমাদের যোগ্য ও প্রবীণ উকিল প্লুডন সাহেব বহু আইনগ্রন্থ ও নযীরের সাহায্যে যে জবাব তৈরী করেছিলেন তা এই 'মুলকা ও ছাতিয়ানা প্রভৃতি স্থান– যেখানকার যুদ্ধে সাহায্য প্রেরণ করার দায়ে এরা অভিযুক্ত বৃটিশ এলাকার বাইরে অবস্থিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মতে, 'যুদ্ধ, সম্রাজ্ঞী এবং বিদ্রোহ' শব্দগুলো ভারত সরকারের এলাকা-বহির্ভূত স্থানে সংঘটিত কোন যুদ্ধের প্রতি প্রযোজ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারার খ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জায়েদ ভারতের অধিবাসী হয়ে যদি সিংহলে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিংহল সম্রাজ্ঞীর এলাকাভুক্ত রাজ্য বিধায় সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। কিন্তু এখানকার ঘটনা তা নয়। সুতরাং এই ধারামতে এদের শাস্তি হতে পারে না।'

সেশন জজ ও অন্যান্য ইংরেজরা এই যুক্তিতে একদম নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তাঁরা 'হাঁ-হাঁ, ঠিক-ঠিক' বলা ছাড়া আর কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। এই মামলায় আমাদের প্রতি ইংরেজদের আক্রোশটাই ছিল মুখ্য। সেজন্য প্রথম থেকে তারা আইন-কানুনকে নির্বাসন দিয়ে রেখেছিলেন। এখন আমাদের উকিলের জবাবে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়ার গোপন অভিপ্রায়ে কিছুদিনের জন্য মামলার সমাপ্তি ঘোষণার কাজ স্থগিত রাখলেন। গভর্নর জন লরেন্স ও আরো অনেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আমাদের নিধনযজ্ঞে পাঠাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরামর্শ চলতে লাগলো। ভাগ্যান্বেষীর দল এদেরকে আগে

থেকেই বুঝিয়ে রেখেছিল এই লোকগুলোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ত্রাস সঞ্চার করে ওহাবীদেরকে ভারতভূমি থেকে সমূলে ওপড়াতে না পারলে ভারতের বুকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের টিকে থাকাই অসম্ভব হবে। এই যুক্তির পর আইন মান্য করবার আর কোন কারণ ছিল কি?

রায়

যাহোক দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে এই মোকদ্দমার শেষ অধিবেশ হল। জজ সাহেব গভর্নর বাহাদুরের ইঙ্গিতক্রমে তাঁর মন্তব্য ও মামলার রায়, তথা দণ্ড বিধানের ফতোয়া ঘরে বসেই লিখে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেদিন এজলাসে বসে প্রথমেই চারজন প্রসেসরকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এই মামলা আগাগোড়া শুনেছেন। এখন নিজ নিজ অভিমত লিখিতভাবে দাখিল করুন।

আমি লক্ষ্য করছিলাম, চারজন প্রসেসরই আমাদের দিকে তখনো পর্যন্ত তাকিয়ে আছেন। তাঁদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত। তাঁরা মনে মনে আমাদের মুক্তি কামনাই করছিলেন। কিন্তু জজ সাহেব ও কমিশনারের রায় যখন আমাদের শাস্তিপ্রদানের অনুকূলে দেখা গেল, তখন ভীত হয়ে তাঁরাও আমাদেরকে দোষী বলে অভিমত লিখে দিলেন। জজ সাহেব আইনগত এই সুবিধা লাভ করে টেবিলের ওপরে রাখা পূর্ব লিখিত রায়টাই পড়তে শুরু করলেন। তাতে আমাদের উকিল প্লুডন সাহেবের যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়তের এলোমেলো জবাব ছিল। সর্বপ্রথম তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন– তুমি খুব জ্ঞানী শিক্ষিত আইনজ্ঞ ও শহরের একজন নেতৃস্থানীয় অবস্থাপন্ন লোক। কিন্তু তুমি তোমার যাবতীয় জ্ঞান ও আইনগত পারদর্শিতা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে ব্যবহার করেছো। তোমারই মারফত সীমান্তে সরকার-বিরোধী যুদ্ধে অর্থ ও লোক প্রেরিত হত। তুমি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী এই সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া ভুলেও কোনদিন সরকারের মঙ্গল কামনা করোনি। সুতরাং তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তোমার মৃতদেহ তোমার আত্মীয় স্বজনদের হাতে দেওয়া হবে না। বরং নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে তা জেলখানার গোরস্থানে পুঁতে রাখা হবে।

আমার জবাব

পরিশেষে তিনি এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখলে তিনি পরম পরিতুষ্ট হবেন। তাঁর গোটা বিবৃতিটা আদ্য পান্ত নীরবে শুনে গেলাম। কিন্তু ঐ শেষ উক্তিটির পর আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। আমি জবাব দিলাম, প্রাণ দেওয়া নেওয়া খোদার ইচ্ছা। তাতে আপনার কোন হাত নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে আমার মৃত্যুর পূর্বে আপনাকেই ধ্বংস করতে পারেন।

এই সমুচিত জবাবে জজ সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফাঁসির হুকুম দেওয়ার অতিরিক্ত তিনি আর কি করতে পারেন? যতটুকু ক্ষমতা তার হাতে ছিল, তা তো প্রয়োগ করেই ফেলেছেন। আমার সেদিনকার ঐ মুখনিঃসৃত উক্তি এমন একটি ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, আমি আজ পর্যন্ত সুস্থভাবে জীবিত আছি। আর জজ সাহেব তাঁর হুকুম দেয়ার কিছু দিন পরেই নিতান্ত আকস্মিকভাবেই চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা বেশ স্মরণে আছে। ফাঁসির হুকুম শোনামাত্র এতই আনন্দিত হয়েছিলাম যে সপ্তরাজ্যের রাজত্ব পেলেও এমন লাগত না। মৃত্যুদণ্ডের রায় শোনামাত্র আমার চোখের সামনে বেহেশতের দরওয়াজা খুলে গেল। আমি হুরদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

তিন জনের ফাঁসি আট জনের দ্বীপান্তর

www.boighar.com

আমার পরে মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবকে, তাঁর পরে মুহম্মদ শফীকে এবং তারপর পালাক্রমে আটজন আসামীর প্রত্যেককেই শাস্তির হুকুম শুনিয়ে দিলেন। তন্মধ্যে আমি, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও হাজী মুহম্মদ শফী– এই তিনজনকে ফাঁসি; অবশিষ্ট আটজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন। শেষোক্তদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও প্রদান করলেন। মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবকেও অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। কিন্তু মুহম্মদ শফীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। সেদিন পুলিশ ও তামাশা দর্শনেচ্ছু নর-নারীতে জেলা আম্বালা কোর্টের বিশাল প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হুকুম শোনামাত্র ক্যাপ্টেন পার্সন সাহেবের অধীনে শতাধিক পুলিশ আমাদেরকে ঘিরে ফেলল। আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বার হওয়ার সময় পার্সন সাহেব আমার কাছ ঘেঁষে উপহাস করে বললেন– তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তোমার কাঁদা উচিত অথচ তুমি

বইঘর ও রোকন

এত উৎফুল্ল কেন?

চলতে চলতে জবাব দিলাম, সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করেই আমি আজ এত আনন্দিত। তুমি কাফের, তা বুঝবে কেমন করে?

এখানে বলে রাখা দরকার, ক্যাপ্টেন পার্সন সাহেব জজ বাহাদুর এডওয়ার্ডস অপেক্ষাও অধিকতর মুসলিম বিদ্বেষী। তিনি এই মোকদ্দমার প্রথম থেকেই আমাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে আসছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আমার লেখনি বর্ণনা করতে অসমর্থ। আল্লাহর বিচারনীতি ধীর ও মন্থর হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার ন্যায়বিচারক তিনি। আমার শাস্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই এই নরপিশাচটি উন্মাদ হয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে জাহান্নামের পথে চলে গেল।

সেদিন আদালত কক্ষ থেকে আমাদেরকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে অগণিত দর্শক আমাদের ফাঁসি দেওয়ার হুকুমের কথা শুনে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করছিল। কেউ ভাবলো এ খোদার ইচ্ছা, আর কেউ কেউ বা অদৃষ্টের লিখন। শেষ বারের মতো আমাদের চেহারা দেখবার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুলোক রাস্তার দুইপাশ ধরে জেলখানার দরওয়াজা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। জেল গেটে পৌঁছামাত্র পুলিশ আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই খুলে নিয়ে তার বদলা গৈরিক বসন পরতে দিল। আমাদের তিনজন ফাঁসির আসামীকে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি ফাঁসির কক্ষে আবদ্ধ করা হলো এবং বাকী আট জনকে জেলখানার অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে একত্র করে দেওয়া হল। দোসরা মে তারিখের রাত্রিতে সেই সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে এক রাত্রেই জাহান্নামের নমুনা বুঝতে পারলাম। পরদিন সকালবেলা ঐ জাহান্নামের বাইরে রাত্রিযাপন করবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে জেল কর্মচারীদের কাছে আমাদের গত রাত্রির দুর্দশার কথা বর্ণনা করলাম। কিন্তু প্রভুদের ভয়ে সকলেই বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। তারা জেলখানা থেকে বের হতে না হতেই তাদের সম্মুখেই একটি তার বার্তা এসে পড়লো। লেফাফা খুলে দেখা গেল, তাতে পরিষ্কারভাবে আদেশ দেওয়া আছে, এই তিনজন ফাঁসির আসামীকে রাতের বেলায় যেন বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুতে দেওয়া হয়। তারা কেউ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে রাজী হয়নি। কাজেই এটা অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদস্বরূপ। জেল কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ আমাদের তা জানিয়ে দিল।

ফাঁসির হুকুম রদ

চীফ কোর্টে মোকদ্দমা

বেশ ধুমধামের সঙ্গে আমাদের তিনজনের জন্য তিনটি ফাঁসি কাষ্ঠ ও তাদের রেশমি রশি তৈরী হয়ে গেল। ওদিকে ফাঁসির আদেশের অনুমোদন নেওয়ার জন্য মোকদ্দমার সমস্ত নথিপত্র পাঞ্জাবের চীফ কোর্টে পাঠান হলো। আমাদের উকিল মহোদয়রা পারিশ্রমিক কিছু বেশি নিয়ে মওলানা মুহম্মদ হাসান, মওলানা মুবারক আলী, আমার ভাই সাইদ, মুহম্মদ শফীর পুত্র আবদুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমভিব্যাহারে উচ্চ আদালতে উপনীত হলেন। মেজর উনকফিল সরকারী উকিল ও তদবিরকারকেরা আগেই সেখানে পৌঁছেছিলেন। এদিকে আমি হুকুমের নকল বার করে জেলখানায় বসে বসে খুব যুক্তিপূর্ণ একটি আবেদন পত্র তৈরী করলাম এবং তা জেল সুপারের মারফত চীপ কোর্টে পাঠিয়ে দিলাম। চীফ কোর্টেও এক মোকদ্দমার ব্যাপারে সগৌরবে কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেল। ওখানেও আমাদের উকিল মিঃ প্লুডন বহু যুক্তিপ্রমাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, ১২১ নং ধারায় এই সকল বিবাদীকে কখনই অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। অভিযুক্ত করলে তা সরাসরি বেআইনী হবে। অন্য কোন ধারায় তাদের উপর অভিযোগ আনা হোক। তদানীন্তন জুডিশিয়াল কমিশনার মিঃ রবার্ট ফাস্ট এই আইনসঙ্গত যুক্তি প্রমাণগুলো এজলাসে সর্বসমক্ষে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু এখানেও আগের মতোই, বোঝাপড়া করার জন্য মামলাটি আবার কিছুদিন মুলতবী রাখা হলো। ইতিমধ্যে সকল সংবাদপত্র আপন আপন অভিমত প্রকাশ করে বলল, এদের মুক্তি পেতে আর দেরী নেই, হুকুম শোনাবার অপেক্ষামাত্র। আমার পরিবারবর্গেরও আমার মুক্তি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, জেল থেকে বাইরে আসার জন্য তাঁরা আমাকে নতুন জামা-কাপড় প্রেরণ করেছিলেন।

চীফ কোর্টেও আমাদের মামলা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রইল। আমাদেরকে বেআইনীভাবে আটক করায় খুব সম্ভব বিলাতী কর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফাঁসির হুকুম শোনাবার তারিখ ২রা মে থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৮৬৪) পর্যন্ত আমরা ফাঁসিগৃহেই আবদ্ধ রইলাম।

আমাদেরকে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করাবার সমস্ত আয়োজন জেল কর্মচারীরা চালিয়ে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইংরেজ দর্শকদের কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হলাম। প্রতিদিন শত শত ইংরেজ নরনারী আমাদের দেখবার জন্য

ফাঁসিগৃহের সম্মুখে ভীড় জমাত। কিন্তু এখানে ফাঁসির কয়েদীদের ব্যতিক্রম মানে আমাদেরকে প্রফুল্ল দেখে তারা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের ফাঁসির দিন আসন্ন অথচ তোমরা এত খুশী কেন?

জবাবে শুধু এইটুকু বলতাম, আমাদের ধর্মে খোদার পথে এই রূপ অবিচারে মৃত্যুবরণ করার ফলস্বরূপ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করা যায়। সুতরাং শহীদ হওয়ার গৌরবেই আমরা এত আনন্দিত।

সেদিন বকরা ঈদ। আমরা তখনও আমাদের বধ্যভূমির তীর্থযাত্রার অপেক্ষায় ফাঁসিগৃহে দিন গুনছি। মনে হলো, আজ মুসলমানগণ প্রাণভরে কোরবানীর গোশত আহার করছেন। শান-ই-এলাহী, এমন সময় পোলাও কোর্মা কালিয়া কাবাব কোরবানীর দিনের সমস্ত উপাদেয় খাদ্য অজ্ঞাত স্থান থেকে ঐ জেলখানার মধ্যেই আমাদের জন্য এসে উপস্থিত হল। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেগুলো খেয়ে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম।

প্রহরীদের সংকল্প

আরেকদিনের ঘটনা। রাত্রে আমরা তিনজন ফাঁসির আসামী আমাদের ফাঁসিকক্ষে বসে গল্প করছিলাম। ঠিক সে সময় আমাদের প্রহরীরা গোপন সিদ্ধান্তক্রমে আমাদের তিনজনকেই ঐ মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাবার পরামর্শ দিলেন। কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে যা শাস্তি হতে পারে, তা তারা নিজেরা ভোগ করবেন। আমরা তাঁদের এই সাহস ও সদিচ্ছার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু জানালাম, আল্লাহ পাক ইহকালে পরকালে আপনাদেরকে এই সদিচ্ছার জন্য বদলা দান করবেন, কিন্তু আমরা পালাব না। তাঁর যেদিন মর্জি হবে আমরা আপনা-আপনিই মুক্তি পাব। আরো জানালাম, আমি পলায়ন করি এই ইচ্ছা তাঁর নেই। কাজেই আলীগড় পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারিনি– গ্রেফতার হয়ে এসেছি। সুতরাং বন্ধুগণ! তার পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব নয়।

কবি বলেছেন– বন্ধু আমার গলায় রশি বেঁধে দিয়েছেন, এখন তিনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

মিঞাজান সাহেবের ইন্তেকাল

আমরা যখন ফাঁসিগৃহে বন্দী তখন কুমারখালি নিবাসী কাযি মিঞাজান সাহেব পীড়িত হয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেখানে থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করবার জন্যে মাঝে মাঝেই আসতেন। তাঁর ইন্তেকালের দুই একদিন পূর্বে তিনি স্বপন দেখেছিলেন, মণিমুক্তা খচিত একটি সিংহাসন আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে উর্ধলোকে নিয়ে গেল। পর তিনি পরলোকগমন করেন। আমাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ খুব ধৈর্য্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। জেলখানার গোরস্থানে তাঁকে অন্তিম শয্যায় শায়িত করা হলো।

মায়ের মৃত্যু

আমি ফাঁসিঘরে বন্দী থাকাকালীন আর একটি ঘটনা। এক রাত্রে থানেশ্বরে আমার মাকে সর্পে দংশন করে। শুনেছি তিনিও অবিচলিত ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেই তাঁকে শেরেকী তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে বিষ নামাবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি রাযী হননি।

ভবিষ্যদ্বাণী

এখানে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা তখনো ফাঁসিকক্ষে আবদ্ধ। পরম করুণাময় তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে জানালেন যে, আমাদের ফাঁসিদণ্ড রহিত হয়ে যাবে এবং তৎপরিবর্তে হবে দ্বীপান্তর আর আমি সেখান থেকে জীবিতাবস্থায় পরিবার পরিজনের মধ্যে আবার ফিরে আসবো। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় দুই মাস পর আমাদের ফাঁসিদণ্ডের আদেশ রহিত হয়েছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ফাঁসিদণ্ড রহিত হওয়া ও কালাপানি যাওয়ার প্রতি আমাদের কিন্তু দৃঢ় আস্থা জন্মে গিয়েছিল। এমন কি আমি আমার ছোট ভাই ও কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে পত্র মারফত এই আশার বাণী জ্ঞাপন করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য সমবেতভাবে তখন আমাদের ফাঁসি দেবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং উক্ত আদেশ রদ হওয়ার আপাতত কোন লক্ষণও ছিল না, কেউই এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। কারণ, তখন এমনই সংকটময় সময়, কেউ আমাদের সপক্ষে একটি বাক্য উচ্চারণ করলেও অনায়াসে গ্রেফতার হয়ে যেত। এমনি সামান্য সামান্য কারণেই বহুলোক গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল। কারো ঘরে যদি আমার কিছু আসবাবপত্র পাওয়া যেত, অথবা আমার বাড়িঘর সব কিছু নিলাম ও বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কেউ যদি আমার পুত্র-কন্যাদের একটু জায়গা দিত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। তখন রোম সম্রাটও আমার পক্ষ হয়ে ইংরেজদের নিকট সুপারিশ করলে তা কিছুতেই মঞ্জুর হত না। এই পরিবেশের মধ্যে ফাঁসির হুকুম রদ হওয়া একান্তই অসম্ভব ও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল।

ফাঁসির হুকুম দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত

এখন সেই মোকাল্লেবুল কলুব (অন্তর পরিবর্তনকারী) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কার্যকলাপ লক্ষ করুন। অসংখ্য ইংরেজ নর-নারী আমাদেরকে ফাঁসি কক্ষে হর্ষোৎফুল্ল দেখতে পেলে সমস্ত ইংরেজ নর-নারী মহলে এটি একটি আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় আমাদের পরম শত্রুরারও ভাবতে লাগলো, আমাদের কাম্য এই শাস্তি দেওয়া উচিত হবে কিনা? বরং কালাপানি পাঠিয়ে দুঃখ-দুর্দশার চাপে নিষ্পেষিত করে আমাদের তিলে তিলে হত্যা করাই যেন বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখতে পেলাম সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আম্বালার ডিপুটি কমিশনার সাহেব ১৮৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে অকস্মাৎ আমাদের ফাঁসিকক্ষে উপস্থিত হলেন এবং চীফ কোর্টের রায় পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন– 'যেহেতু তোমরা ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করাকে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু মনে কর এবং তা শাহাদত বলে গণ্য করে থাকো, সেহেতু গভর্নমেন্ট তোমাদের এই কাম্য শাস্তি তোমাদেরকে প্রদান করবেন না। সুতরাং ফাঁসিদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত হয়ে গেল।' পর মুহূর্তে আমাদেরকে ফাঁসিঘর থেকে বাইরের ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল এবং অপরাপর কয়েদীর সঙ্গে একত্র করে দেওয়া হল। তারপর জেলখানার বিধানমতে কাঁচি দিয়ে আমাদের মাথার চুল, দাঁড়ি ও গোঁফ ছেঁটে লোমছাড়া ভেড়া বানিয়ে দিল। তখন দেখতে পেলাম মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব তাঁর কর্তিত শ্মশ্রুর লোমগুলো হাতে নিয়ে দুঃখ করে বলছেন, আফসোস করো না, তুমি খোদার রাস্তায় বন্দী হয়েছো এবং তারই জন্য কাটা পড়েছ।

ভাগ্যের পরিহাস

কুদরত-ই-এলাহীর আরো একটি উল্লেখযোগ্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। রাজদ্রোহিতার গুরুতর অপরাধের দরুন আমার জন্য একটি বিশেষ ধরনের খুব মজবুত ফাঁসিকাষ্ঠ ও ফাঁসি দেওয়ার জন্য রেশমী রশি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তকদিরের খেলা– আমার ফাঁসির হুকুম তো রদ হয়ে গেল, ইতিমধ্যে হত্যার দায়ে একজন গোরা ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত হলো। এবং আমার জন্যে করা ফাঁসির সমস্ত আয়োজন বেচারা ইংরেজের ভাগ্যে জুটে গেল। যাই হোক, ফাঁসির হুকুম রদ হওয়ার পর আমাদের তিনজন আসামীকেই অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা হলো।

নবী বকশ দারোগা, রহিম বকশ নায়েব। দারোগা ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। কিন্তু সুপারের ভয়ে তিনজনকেই ঢেঁকিতে কাগজ কুটবার কাজে নিয়োগ করলেন। জেলখানার ভেতরে এটাই ছল সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিছুক্ষণ ঢেঁকি চালাবার ফলে আমার পা দু'খানা অবশ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রিলিফ জেল সুপার ডাঃ কেটসন ঐ কাগজ ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাদেরকে ঢেঁকি চালাবার মতো কঠিন কাজে রত দেখে তিনি দারোগার উপর ভীষণ চটে গেলেন। মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও মুহম্মদ শফীকে সুতা খোলাবার মতো সহজ কাজের ভার দিলেন। আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন এবং যেখানে কাগজ বাছাই করা হচ্ছিল, হাত ধরে আমাকে সেই নর্দমার ধারে নিয়ে বললেন– এ সমস্তই অফিসের বাতিল কাগজ। তুমি এগুলো পড়ো, চিত্তবিনোদন হবে, আর কাগজগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলতে থাক, এই তোমার কাজ। তোমার হাতের লেখা কাগজও নিশ্চয় এতে থাকবে।

www.boighar.com

আল্লাহর ফযল ও করমে আমার পরিশ্রম অবসর বিনোদনে পর্রিবর্তিত হয়ে গেল।

সারাদিন এইভাবে কাটাবার পর রাত্রে আমরা সকলে ব্যারাকে নিদ্রা যেতাম।

জেলখানায় গিয়ে দেখতে পাই, কয়েদীরা শুধু ডালরুটি ও সপ্তাহে দুই তিন দিন মাত্র তেলে পাক করা তরকারী পেয়ে থাকে। ইংরেজ আমলের গোশত দুধ দৈ ঘি কেউ চোখেও দেখতো না। খোদা পাকের অনুগ্রহ দেখুন, আমাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের জেল সমূহের ইনস্পেকটর জেনারেলের নির্দেশে পাঞ্জাবের সমস্ত কয়েদী গোশত ঘি ও দৈ পেতে লাগলো। কয়েদীরা ভাবত, আমরাই এর নিমিত্ত। তাই তারা আমাদের জন্য দোয়া করত। মজার ব্যাপার এই যে, আমরা যদ্দিন পাঞ্জাবের জেলসমূহে বাস করছিলাম ততদিন সমস্ত জেলেই এরূপ খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের আন্দামান যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তই একদম বন্ধ হয়ে গেল। উপরন্তু কয়েদীরা গমের রুটির বদলে বজরার রুটি পেতে লাগলো।

আম্বালা জেলে থাকতেই এক ভীষণ সক্রামক জ্বরের কবল থেকে কোনক্রমে বেঁচে গেলাম।

এখানে দুই চারটি ব্যক্তিগত পার্থিব কথা বলে নিই। ১৮৬৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমার বাড়ি তল্লাশী হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমি হাজার হাজার টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিলাম। আমার গাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল, চাকর-নওকর ছিল এবং বহু সংখ্যক প্রজা ছিল। আমি ছিলাম এই শহরের

একজন নামকরা লোক। কিন্তু ফেরার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার মান সম্মান ও প্রতিপত্তি ধুলোয় বিলীন হয়ে গেল। আমার ফেরার হওয়ার কারণে অথবা আমি ইংরেজদের অত্যধিক ক্রোধভাজন হয়ে পড়ায়, মোকদ্দমা শেষ হবার আগেই গভর্ণমেন্ট আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছিল। পরদিন আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে কেউ বারান্দায়ও দাঁড়াতে দেয়নি। এক রাত্রের মধ্যেই আমার সমস্ত ধন-সম্পদ অন্যের হাতে চলে গেল। ক্রোক হওয়ার আগে আমার উত্তরাধিকারীদের এতটুকু সুযোগ ঘটল না যে তারা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে নিতে পারে। আমার ছোটভাই যে অর্ধেক অংশের মালিক, আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার হুকুম বের হওয়ার পূর্বে তার দাবী উত্থাপন করেছিল। তাতে শুধু একটি কামরা ছেড়ে দিল মাত্র। বাকী সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে নিল। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমার নিজের অংশের যাবতীয় সম্পত্তি আমি আমার স্ত্রীর নামে দেনমোহরের বিনিময়ে এক বায়নাপত্র লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু উক্ত দলিল পেশ করা হলেও ক্রোধে ও হিংসায় অন্ধ হয়ে তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। বরং আমার স্ত্রীকে দুইটি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

মিথ্যা সাক্ষী

মীর মজিব উদ্দীনের কারসাজি

পাঞ্জাবের চীফ কোর্টে আপীল রুজু থাকার সময় আমাদের উকিল প্রুডন সাহেব আমাকে লিখে জানালেন যে, ইংরেজরা ভাবছেন আমরা যদি আপীলে মুক্তি পাই তো ভাল। নইলে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবকেও তাঁরা গ্রেফতার করবেন। আমাদের আপীল না-মঞ্জুর হয়ে গেল। সুতরাং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে আমাদের এগারজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্য থেকে কাউকে শিখিয়ে পড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মীর মজিব উদ্দিন তহসীলদার, যিনি ঘুষ নেয়ার দায়ে আম্বালা জেলে আটক ছিলেন ও আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, ইংরেজরা তার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হলেন, তিনি যদি এই এগারজনের মধ্যে থেকে কাউকে ফুসলিয়ে ও বুঝিয়ে পড়িয়ে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রস্তুত করে দিতে পারেন তাহলে তাঁকে মুক্তিদান ও পুনরায় তহসিলদার পদে বহাল করা হবে। নিজ অবস্থার উন্নতির আশায় তিনি তাঁর কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। কিন্তু যখনই তাঁর প্রচেষ্টার খবর আমাদের কানে আসত, আমরা আমাদের সঙ্গীদেরকে বুঝাতাম,

বইঘর ও রোকন
বন্ধুগণ, আমাদের দুনিয়া তো বরবাদ হয়েই গেছে, বাকী আছে শুধু ধর্ম। মিথ্যা সাক্ষী সেজে যদি তা খুইয়ে বস, তাহলে তোমার দৃষ্টান্ত হবে না ইহকাল না পরকাল।

লাহোর জেলে প্রেরণ

এইভাবে মীর মজিব উদ্দিন সাহেবের সারাদিনের কারসাজি আমাদের এক মুহূর্তের উপদেশেই ব্যর্থ হয়ে যেত। তখন মীর সাহেব তার প্রভুদের বুঝিয়ে দিলেন, যদ্দিন মুহম্মাদ জাফর ও মওলানা ইয়াহহিয়া আলী এখানে আছে, তদ্দিন কাউকে সাক্ষীরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের দুইজন ও মিঞা আবদুল গাফফারকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। এবং মুহাম্মদ শফী, আবদুল করিম, এলাহী বখশ ও মুনসী আবদুল গফুর প্রমুখ আম্বালা জেলেই রয়ে গেলেন।

চমৎকার! আমার এই জেল থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুহম্মদ শফী ও আবদুল করীম প্রমুখরা সরকারী সাক্ষী সেজে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এঁদেরই মিথ্যা সাক্ষে তদানীন্তন আউলিয়া শামসুল ইসলাম মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আমাদের আগেই জুন মাসে আন্দামানে উপনীত হলেন।

মোকদ্দমার নথিপত্র ও মুহম্মদ শফীকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রমাণাদি আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, কিরূপে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে মওলানা শফীকে ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত ও তাঁর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অথচ মাত্র একটি বৎসর সাক্ষী বানাবার অজুহাতে তাঁকে মুক্তি দান করা হলো। অবশ্য এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে না হয়। যদি সে নির্দোষই ছিল বা এক বৎসর পর মুক্তি পাওয়া প্রমাণিত হল, তাহলে ঘটা করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত করার কি কারণ ছিল? আর সত্যই যদি সে গুরুতর অপরাধী ছিল, ও সেশন জজ সাহেবের রায়ের আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি নির্ভুল ছিল, তাহলে এক বছর পরেই তাঁকে মুক্তি দান করা হল কেন?

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওহাবী গ্রেফতারীর যে সকল মোকদ্দমা চলছিল তন্মধ্যে আমীর খাঁ চামড়ার মার্চেন্ট, মওলানা তবারক আলী, পাবনার অধিবাসী মওলানা আসিরুদ্দীন (জানা যায়, ইনি কলকাতার অধিবাসী এবং পাবনায় গ্রেফতার হন) ও ইসলামপুর নিবাসী ইবরাহিম মণ্ডল সাহেবের মামলাও চলছিল। এই সমস্ত

মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরী করা হত, অথবা সরকার পরে গোয়েন্দাদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হত। আমি স্বয়ং একজন সাক্ষীর মুখে শুনেছি, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাদেরকে শাসানো হত যে, এই শর্তেই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সাক্ষ্য না দিলে পূর্ব ওয়ারেন্টেই আবার গ্রেপ্তার করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও কালাপানি প্রেরণ করা হবে।

আম্বালা লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা জেলখানার ভেতরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তখন রমযান মাস। আমি রোযা ছিলাম। জেলখানার বাইরে একটি কামরার মধ্যে অনেকক্ষণ আমাদের কথাবার্তা চলছিল। পরনে আমার গৈরিক বসন। কম্বলের জামা ও পায়ে লোহার বেড়ী দেখে আমার স্বজনেরা অবাক। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ল। আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিলাম এবং ঈমান ও সবরের বিষয় বোঝালাম। দীর্ঘ সোয়া বৎসর পর আমার পুত্র সাদেককে সেদিন দেখলাম। সে এত বড় হয়ে গেছে, প্রথম তাকে চিনতেই পারিনি। তার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। এই ধরাধামে দ্বিতীয়বার আর তার সঙ্গে মুলাকাত হয়নি।

হ্যাঁ, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা আম্বালা থেকে লাহোর জেল অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। গৈরিক বসন, কম্বল পরিহিত যোগীর বেশ, হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ীর অলংকার। আমাদের সঙ্গে দুইটি গাড়ী থাকলেও পদব্রজেই চলছিলাম আমরা ত্রিশ চল্লিশ জন কয়েদি। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে গাড়ীতে ওঠান হত। তা ছাড়া সকলেই ঝন ঝন ঝনঝন শব্দে লোহার মল বাজাতে বাজাতে ক্রমাগত হাঁটছি। যা হোক, সোয়া বৎসর পর কারা প্রাচীরের বাইরে, মুক্ত হাওয়ায় পরিভ্রমণ করতে পেরে, রাস্তায় যা ইচ্ছে তাই কিনে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে, সর্বোপরি মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য লাভের আনন্দে এই সফরের দিনগুলো সার্থক হয়ে উঠলো।

মহারাজার বরযাত্রীদল ও আমরা

পথযাত্রার সময় ঘটনাক্রমে পাতিয়ালার মহারাজা হিন্দ সিংয়ের বরযাত্রী দল খুব ধুমধামের সঙ্গে আমাদের আগে আগে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। ফেব্রুয়ারী শেষের গোলাপী শীত, তখন সূর্যোদয় হচ্ছিল। একদিকে উদীয়মান সূর্যের আলোকচ্ছটায় বরযাত্রীদের দেহাবরণের সোনাচান্দি ও মণিমুক্তার চাকচিক্য, অন্যদিকে আমাদের বেড়ীর ও হাতকড়ার কৃষ্ণচ্ছটা। একদিকে শাল, কিংখাব ও বনাস্তের মনোহারিত্ব, অন্যদিকে আমাদের গৈরিক বসন ও কম্বলের সাদা কালোর প্রতিযোগীতা। ওদিকে হাতী ঘোড়ার হুংকার এদিকে বেড়ীর

ঝংকার। মহারাজার বরযাত্রীদল ও আমরা কয়েদীরা যেন পাশাপাশি প্রতিযোগীতা করে চলছিলাম। সে প্রতিযোগীতা মান ও অপমানের, ছোটর সঙ্গে বড়র। তবু দীর্ঘদিন পরে কারাগারের অন্ধ কক্ষ থেকে আমাদের বাইরের আলোকে আসবার আনন্দ বরযাত্রীদের আনন্দের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। আমরা হরিণের মতো নাচতে নাচতে ছুটে ছুটে চলছিলাম। যাদের কাছে কিছু টাকা পয়সা ছিল তারা রাস্তায় ফলমূল কিনে খেয়ে ফুর্তি করতে করতে যাচ্ছিল। লুধিয়ানা, ফুলওয়ার, জলন্ধর, অমৃতসর একে একে পিছনে পড়ে যায়। শেষে আমরা আমাদের শেষ মঞ্জিল লাহোরের শালিমার বাগের সম্মুখে পৌঁছলাম। সেখানে প্রত্যেকেই যার যা খুশী প্রাণভরে খেয়ে নিই। কারণ জেলখানায় প্রবেশ করলে নিয়মিত খোরাক ছাড়া অতিরিক্ত কিছু খেতে পাওয়া অসম্ভব।

বিকেল প্রায় তিনটের সময় আমরা লাহোরে সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে পৌঁছে গেলাম। আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে জেলের দরওয়াজায় বসিয়ে দেওয়া হল। প্রথমত একজন কাশ্মিরী হিন্দু দারোগা এসে আমাদের মোকদ্দমায় আসামীদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ও আন্তরিক দুঃখ জানায়। এরপর জেল সুপার ডাঃ গ্রে আবির্ভূত হলেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের পরিদর্শন করলেন, তারপর রোষভরে হুকুম দিলেন– এদের প্রত্যেকের পায়ে আড়াআড়িভাবে একটি করে লোহার ডান্ডা লাগিয়ে দাও। আদেশ দেওয়া মাত্র লৌহদণ্ড নিয়ে কামার এসে হাজির এবং আমাদের পদযুগলের বেড়ীর সাথে এক একটি একফুট লম্বা সেগুলো স্থাপন করল।

নিছক আক্রোশবশে শুধু আমাদের উপরই এই হুকুম প্রয়োগ করা হলো। সমগ্র জেলখানার ভেতরে আর একটি কয়েদীর পায়েও এই ডান্ডা দেখিনি। এর ফলে উঠাবসা ও চলাফেরা ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ল। রাত্রে পা মেলে শুতে পারা যেত না। জেলখানার মাঝখানে একটি কামরা ও তার চারপাশের প্রাঙ্গণসহ আটটি ব্যারাক। কয়েদীদের কায়িক পরিশ্রমের জন্য একটি কারখানাও ছিল। সাহেব প্রবর আমাদের মোকদ্দমার আসামীদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন যেন আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারি। বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যথা লৌহদণ্ডের দুর্ভোগ থেকেও গুরুতর ছিল।

সর্বাপেক্ষা কঠিন জায়গা এক নম্বর ব্যারাকে আমার স্থান নির্দেশ করা হলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বিকেল ছটার সময় আদেশ এসে পৌঁছল যে, আম্বালা জেল থেকে আগত সমুদয় কয়েদীকে যেন পৃথকভাবে রাখা হয়। কারণ এরা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত কারাগার থেকে এসেছে। এদের রোগ যেন এই জেলের

অন্য কয়েদীদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। এই নির্দেশক্রমে আমি যেখানে ছিলাম সেই এক নম্বর ব্যারাকে সকলের স্থান করা হলো। সকলে আবার মিলিত হতে পেরে অত্যন্ত খুশী হলাম।

জেলখানার এই নম্বরটি একজন মুসলমান জমাদারের চার্জে থাকায় আমাদেরকে বিশেষ কোন মেহনতের কাজ করতে হয়নি। উপরন্তু সুপার আমাকে সপ্তাহখানেক পরে এই ব্যারাকের মুনশী নিয়োগ করলেন। কিন্তু পায়ের ডান্ডা যেমন ছিল তেমনি রইল। এর ফলে প্রত্যহ ভোরে পরিদর্শনের সময় সুপার সাহেবের সঙ্গে আমাকে হরিণের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হত।

ছন্দলের উদারতা

একদিন রোববারে আমি আমার বিছানায় বসে আছি। সহসা জেল সুপার আমাদের নম্বরে এসে উপস্থিত হলেন এবং এখানকার কয়েদীদের তল্লাশী করবার হুকুম দিলেন। আমার বিছানার তলা থেকে কিছু লবণ বের হল। এইরূপ অপরাধে জেলখানায় বেত্রাঘাত করা হয়। আমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কি জবাব দেব? এমন সময় ছন্দল নামক একজন মুসলমান কয়েদী, যে আমার সঙ্গেই আম্বালা থেকে এসেছিল ও আমার খেদমত করত, বলে উঠল– হুজুর, এই বিছানা ও লবণ আমার, ওর নয়।

উনি বললেন– তা কেমন করে হয়?

ছন্দল জবাব দিল, আপনি আসবার আগে আমরা দুইজনে একটু বাইরে গিয়েছিলাম। এ সময় হুজুর এসে পড়ায় আমরা দৌড়ে এসে হাজির হই। কাজেই ইনি আমার বিছানায় আর আমি উনার বিছানায় বসে পড়েছি।

এই শুনে সুপার সাহেব হেসে ফেললেন এবং আমাদের দুইজনকেই নম্বরের বাইরে বেত্রাঘাত করার জায়গায় নিয়ে গেলেন। এইরূপ অপরাধে অন্যান্য কয়েদীর বেত দেওয়া শুরু হল। পরিশেষে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছন্দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কথা কি সত্য?

ছন্দল বললো, হ্যাঁ হুজুর! ঐ বিছানা ও লবণ আমার, বাকী আপনার ইচ্ছা।

এই জবাবে তিনি আমাদের উভয়কেই রেহাই দিলেন। কিন্তু ছন্দলকে বললেন, তুমি মৌলবীকে বাঁচাতে চাও। আমি তোমাকে মাফ করলাম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার থেক।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে কয়েদীদের এক বিরাট চালান মুলতান পাঠাবার আয়োজন হয়ে গেল। প্রতি দুইজন করে কয়েদীকে একটি

করে হাতকড়ি লাগানো এই আয়োজনেরই একটি অঙ্গ। আমার সঙ্গীটি আমাকে এতটুকু খাতির করল, আমার বাঁ হাতের সঙ্গে ওর ডানহাত বাঁধতে দিল। আমাদের মামলার আমি, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও মিয়া আবদুল গাফফার শুধু এই তিন জন মুলতান রওনা হলাম।

মওলানা আবদুর রহিম সাহেবকে আমাদের সঙ্গে আম্বালা থেকে পাঠান হয়নি। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে সেখানেই আটক রাখা। আগেই বলেছি, আমাদের আপীল না-মঞ্জুর হবার পর দুইটি কারসাজি শুরু হয়েছিল। তার একটি আগেই বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয়টি হল, মুজাহিদ বাহিনীকে ভারতে ফিরে আসার জন্য প্ররোচিত করা। এদেশে তাদেরকে জায়গীর প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এবং তাদের কয়েদীদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় কারসাজি সফল হয়নি। কারণ ঐ সকল রিক্ত ও সংসারত্যাগীর দল, যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দারুল হরব মনে করে, মহাবনের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা কেমন করে পার্থিব সম্পদের লোভে বা আমাদের মুক্তিলাভের আশায় সংরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান ত্যাগ করে আবার দারুল হরবেই ফিরে আসতে পারে? এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলে আমাদের দুই বৎসর পর মওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে আন্দামানে প্রেরণ করা হল।

লাহোর থেকে বিদায়

লাহোর থেকে বিদায় হবার সময় আমাদের একহাতে বিছানাপত্র অন্যহাতে হাতকড়া আর সিপাইরা তাড়া দিচ্ছিল জলদি কর জলদি কর, গাড়ি এসে পড়ল। এইভাবে জেলখানা থেকে অতিকষ্টে ইষ্টিশনে এসে পৌঁছলাম। আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হল। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত কোথাও দরওয়াজা খোলা হয়নি। জীবজন্তু ও মালপত্রের মতো আমাদেরকে এমনিভাবে বোঝাই করে নিয়ে গেল। অনুমান রাত আটটার সময় মুলতান পৌঁছি এবং ওখানেও ঘাড়ের উপর বিছানা চাপিয়ে অন্ধকারে টানতে টানতে আমাদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেই ভুখা অবস্থাতেই পশুবৎ জেলে খোঁয়ারে নিয়ে আবদ্ধ করল। আমি আর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব এই জেলে রইলাম, কিন্তু শহর কোন দিকে, বাজার কোথায়, চোখেও দেখতে পেলাম না। দুইদিন পর আবার মুলতান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে সিন্ধুনদের তীরে নিয়ে আমাদেরকে একটি গান বোটে চড়িয়ে দিল এবং তাতে সারিবদ্ধভাবে বসাল। এর পর পূর্বের বেড়ী হাতকড়ি ও ডান্ডার সঙ্গে নতুন করে লোহার আর একটি শিকল বেড়ীর মাঝখানে পরিয়ে দেয়া হল। এর ফলে কেউই নিজ নিজ

বইঘর ও ব্লোকন
জায়গা থেকে নড়াচড়া করতে সমর্থ ছিল না। এ সময়ে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে প্রায় আধ মণ করে লোহা ছিল। সেজন্য যতদিন জাহাজের আরোহী ছিলাম, ততদিন নিজ নিজ জায়গায় বসেই প্রস্রাব পায়খানার কাজ সম্পাদন করতাম। সিন্ধু নদের বুকভরা পানি আমাদের পদতলে থাকলেও পানির অভাবে তৈয়ম্মম দিয়েই নামায পড়তাম।

www.boighar.com

করাচী উপস্থিতি

এইতো অবস্থা, তবু আমরা আনন্দিত। কারণ জেলখানার বাইরে আসতে পেরেছি। তাছাড়া রয়েছে বন্ধুদের পরস্পর সাহচর্য, স্রোতস্বিনীর উদ্দামগতি আর পার্শ্ববর্তী আরণ্য দৃশ্য। এই অবস্থায় চলতে চলতে পাঁচ ছয়দিন পর আমরা কোটলিতে পৌঁছলাম। পথে সিন্ধুনদের তীরে শুক্কর বাখরা ও থট্টা নামক বিখ্যাত দুর্গ এবং কোটলির সম্মুখে সিন্ধুর অপর পারের বিখ্যাত হায়দারাবাদ শহরটি আমাদের দৃষ্টি গোচর হল। কোটলী থেকে রেল যোগে সেদিন আমরা করাচী যাই। এখানে বড় বড় টুপি ও টুকরির মতো বিরাট বিরাট পাগরী পরা সিন্ধিদের দেখলাম। টুপিওয়ালারা সম্ভবত মুনশী ও কেরানী এবং পাগরীওয়ালারা হিন্দু মহাজন। হিন্দুস্তানী ভাষা ও উর্দু আর ফার্সীর দৌরাত্ম্য মুলতানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধি ভাষারই প্রচলন দেখা গেল। সিন্ধি ভাষা ফার্সী অক্ষরেই লিখিত কিন্তু তার বোলচালে একটি শব্দও আমাদের বোধগম্য হয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ! করাচীর জেলখানায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতকড়ি ও পদযুগলে শোভিত লৌহদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া গেল। লোহার বেড়ীটুকুন রইল শুধু। মূলত অন্যান্য জেলখানার তুলনায় করাচীর জেলখানাকে অতিথিশালা বলা চলে। এখানে রাত্রিবেলা কয়েদীদেরকে জানোয়ারের মত ব্যারাকে বা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করে রাখা হয় না। তাদের জন্য বাংলো ধরনের উন্মুক্ত বাড়ি আর তাতে চাটাই শয্যা পাতা আছে। রাত্রে কয়েদীরা স্বাধীনভাবে জেলখানার সর্বত্র বিচরণ ও যেখানে ইচ্ছা শয়ন করতে পারে। কোন বাধা নিষেধ নেই। শান্ত্রীরা শুধু জেলের প্রাচীরের ওপরেই পাহারা দিয়ে থাকে। রাত্রে জেলখানার ভেতরে কোন প্রহরীর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। দীর্ঘ দুই বৎসর পর আকাশ ও তারার শোভা দর্শন করবার সৌভাগ্য এই প্রথম হলো।

করাচীতে হপ্তাখানেক থাকার পর আমাদের একটি পালের জাহাজে নিয়ে উঠান হল। এই সর্বপ্রথম করাচীতে সমুদ্র ও সামুদ্রিক জাহাজ দেখলাম। এই জাহাজকে বলে বগোলা; ছোট জাহাজ। কয়েদীদেরকে বস্তা বোঝাই করার মতো

জাহাজের নীচে তলায় ঠাসাঠাসি করে ভরে দিল। নঙ্গর উঠিয়ে বন্দর ত্যাগ করলে কিছুদূর এগুতে না এগুতেই জাহাজ দুলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদেরও বমন শুরু হয়ে গেল।

বোম্বাই

যাই হোক, অতিকষ্টে দুই তিন দিন পর আমরা বোম্বাই বন্দরে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি মাইলের পর মাইল জুড়ে হাজার হাজার জাহাজ। একে জাহাজের অরণ্য বলা চলে। বোম্বাই দুর্গের পাদদেশে ডিঙ্গির সাহায্যে আমাদেরকে নামান হল এবং সেখান থেকে রেলযোগে থানা জেলখানায় নিয়ে গেল। তা বোম্বাই বন্দর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে অবস্থিত। বোম্বাই শহরে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পার্শীদেরকে ভ্রমণ করতে দেখলাম। এরা গৌরবর্ণ, খুব সুন্দর আর প্রচুর অর্থশালী। এরা অগ্নি উপাসক জরদশতী ধর্মালম্বী। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের ইরান অধিকার করবার সময়ে এরা ইরান থেকে পালিয়ে ভারতের এই প্রান্তে এসে বসতি স্থাপন করে। বোম্বাই শহরের ইমারতগুলো আমার যদ্দুর দেখবার সুযোগ হয়েছিল খুব উঁচু এবং তাদের দেয়াল অসংখ্য জানালাযুক্ত। এই শহর একটি দ্বীপবিশেষ। একটি বাঁধের দ্বারা একে ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। বোম্বাই ও থানার মধ্যস্থলেও সমুদ্র প্রবাহিত। এর পানি ক্ষেতে আটকে দেওয়া হয়। আর রোদের উত্তাপে তা আপনা আপনি শুকিয়ে হয় সুন্দর লবণ। রেল লাইনের ধারে হাজার হাজার মণ লবণ স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। নারকেল গাছ আর তাজা ডাব এই প্রথম আমি বোম্বাইতে দেখলাম। এখানকার মেয়েরা পুরুষদের মতো কাছা এঁটে ধুতির আকারে তাদের শাড়ী পরে এবং তাদের হাঁটুর উপর পর্যন্ত ও তার চারদিক খোলা থাকে। হিন্দুরা বিরাট লম্বা লম্বা পাগরী মাথার ওপরে টুকরির মতো স্থাপন করে রাখে। এ অঞ্চলের ভাষা গুজরাটী বা মারাঠী। রেলগাড়ী থেকে নেমে পদব্রজে থানার বাজারের ভেতর দিয়ে জেলখানার দিকে যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গী কয়েদীরা কয়েকটি মিষ্টির দোকান লুট করল এবং অবলীলাক্রমে লুণ্ঠিত মিষ্টান্ন খেতে লাগলো। এদেরকে কয়েদী জেনে বেচারা দোকানদারেরা কিছু বলল না; বরং কয়েকজন দোকানদার তাদের মিষ্টি কয়েদীদের মুখে পুরতে দেখে যেন খুশীই হয়েছে। চলতে চলতে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা জেলখানার সামনে পৌঁছে গেলাম।

এই জেলখানাটি মারাঠীদের সময়কার একটি সুদৃঢ় দুর্গ। এর চতুর্দিকে গভীর পাকা খাল-পরিখার মতো। জেলে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের দেহ তল্লাশী শুরু হল। আমাদের প্রত্যেকের জুতো খুলে ফেরত দেয়া হয়নি। কথিত আছে,

একজন দগ্ধহৃদয় কয়েদী এই জেলের এক দারোগাকে একবার জুতা পেটা করেছিল। তার পর থেকে এখানে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে।

রাত্রে দুইখানা করে জোয়ারের রুটি ও কিছু অল্প ডাল দিয়ে আমাদেরকে পৃথক পৃথক কামরায় বন্ধ করে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে আমাদের পাঞ্জাবী কয়েদীদেরকে গমখোর দেশের লোক মনে করে জোয়ারের বদলে গমের রুটি সরবরাহ করতে তাকে এবং এইভাবে আমাদের পর পাঞ্জাব থেকে আগত সমস্ত কয়েদীর আহার্যের জন্যে চিরদিনের তরে গমের রুটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

ভোর বেলা আমাদের গোটা চালানকেই পাথর ভাঙ্গার কাজে লাগায়। অতিকষ্টে দুই একদিন তা সামাধা করলাম। আমাদের পাঁছবার দুই দিন পর ওখানে সতরঞ্জি তৈরীর কাজ শুরু হল। আমাদের সঙ্গের পাঞ্জাবী কয়েদীরাই হলো তার পরিচালক। তারা মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব ও আমাকে সতরঞ্জির কাজের উস্তাদ পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে নিল। এখানে একটি মাস বেশ আরামেই কাটে।

এই জেল ও এই প্রদেশে মারাঠী ভাষা প্রচলিত। সিন্ধুর মতো বোম্বাইতেও ফার্সী ও উর্দু অচল। করাচী ও বোম্বাইয়ের এই ভাষাগত সমস্যা দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, আমার বাকী জীবনটা বোধ হয় মূর্খের মতো কাটবে। লেখনি ধারণ করার সুযোগ হয়তো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। লেখাপড়ার সাহায্যে মর্যাদালাভ করবার যে আশাটুকু ছিল, তাও তিরোহিত হয়ে গেল। ভরসা থাকল শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ।

এই জেলখানার প্রধান জেলার একজন অত্যন্ত অহংকারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইবরাহিম নামে আর একজন সহকারী আমাদের প্রতি বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মাসখানেক থাকবার পর এখান থেকেও আমাদের বিদায়ের পালা এলো। সহকারী জেলার আমাদের রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে ভারী বেড়ীগুলো খুলে ফেলে নামমাত্র হালকা বেড়ী পরিয়ে দিলেন।

ভারতের সর্বত্র জেলখানাসমূহে দেশী লোকদের, বিশেষত ভদ্রলোকের বড় দুরবস্থা। তাদের জন্য না খোরাক পোষাকের সুবন্দোবস্ত আছে, না পায়খানা প্রস্রাবের। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তাদেরকে রাত্রে ব্যারাকে ব্যারাকে পশুর মতো আবদ্ধ করে রাখা হয়। দুষ্ট লোকদের অবশ্য আরাম আছে। দেশী কয়েদীদের কোন শ্রেণী মর্যাদা দেওয়া হয় না। কালো আদমী মাত্রই এক পর্যায়ভুক্ত। রাজা নবাব, মেথর-চামার সকলকে এক লাঠিতেই ঠ্যাঙান হয়। কিন্তু কোর্টপ্যান্ট পরা থাকলেই তার মর্যাদা আলাদা। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো উভয়েই ইংরেজ সাহেবদের কাছে উচ্চ মর্যাদা পেতে থাকে।

আন্দামান যাত্রা

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা যমুনা নামক জাহাজে বোম্বাই থেকে আন্দামান যাত্রা করলাম। এটা বিলিতী জাহাজ। তার নাবিক ও অফিসার সবই ইংরেজ। হিন্দুস্থানী ভাষা কেউ বোঝে না। মতিলাল নামে একজন ইংরেজি শিক্ষিত কয়েদী আমাদের সঙ্গে ছিল। তার মারফত আমরা নাবিকদের সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করতাম। তখন পর্যন্ত আমি ইংরেজির কিছুই শিখিনি। জাহাজে মুসলমানদের জন্য ডালভাত আর শুটকী মাছ, আর হিন্দুদের জন্য মিষ্টি তাজা চালের ব্যবস্থা ছিল। রুটি খেয়ে আমাদের সঙ্গী পাঞ্জাবীদের পক্ষে একমাস কাল একটানা দুই বেলা খাওয়া বড় কষ্টকর ছিল।

সমুদ্রে ঝড়

জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে তুফান ও তরঙ্গে ভয়ানক দুলতে থাকে। অধিকাংশ আরোহীই বমি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সাত বছর মেয়াদের একজন কয়েদী, যার মাত্র পাঁচ বছর বাকী ছিল, বমন হয়ে জাহাজের উপরই মারা গেল। আমরা শরিয়ত মোতাবেক তাকে গোছল করিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়লাম। তারপর অনেকগুলো পাথরের সঙ্গে বেঁধে তার লাশটিকে সমুদ্রে ছেড়ে দিই। আমাদের প্রহরারত মেরাইন পল্টনের সেপাই দল আমাদের যথেষ্ট মেহেরবানী করতো। জাহাজ যখন সিংহলের ধার দিয়ে চলছিল, তখন ভীষণ ঝড় উঠলো। হাজার হাজার মণ ভারী জাহাজটা ফুটবলের মতো পানির ওপর নাচতে লাগল। একেক সময় সমুদ্রের পানি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে একদিক থেকে আসত, আবার কখনো জাহাজ কয়েক হাত পানির নীচে চলে যেতো।

চৌত্রিশ দিন সমুদ্রের ওপর অবস্থান করার পর ১১ই জানুয়ারী বেলা বারোটার আগে আমাদের জাহাজ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে গেল। আম্বালা ত্যাগ করবার ঠিক এগার মাস পর আন্দামানে প্রবেশ করলাম। সমুদ্রতীরে বসানো কালো পাথরগুলোকে দূর থেকে মনে হলো যেন দলে দলে মহিষ সাঁতার কাটছে। জাহাজ নঙ্গর করবার কিছু পরেই পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের ইনচার্জ একখানি নৌকায় চড়ে আমাদের কাছে এলেন। তার নৌকার মাঝি একজন হিন্দুস্থানী। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কেরানী মুহুরীর দরকার আছে কিনা এবং অফিস আদালতের কাজ কোন ভাষায় চলে? আমার কথায় সে আমাকে মুনশী ঠাউড়ে কিছু বাড়াবাড়ি করেই বলল যে, ওখানকার হাকিম, আর মালিকরা

তো সব মুনশীই এবং তারাই সর্বেসর্বা। সুতরাং করাচী, থানায় ও বোম্বাই অবস্থানকালে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছিল, এই শুভসংবাদে তা কিছুটা লাঘব হয়ে গেল। সামনে বড় বড় বোট আর নৌকা। তারা এসে আমাদেরকে রুশদ্বীপ নামক পোর্ট ব্লেয়ারের সদর টাউনে নিয়ে যেতে থাকে। আর তীরের কাছাকাছি যেতে দেখি বহু সংখ্যক মুনশী মৌলবী পরিষ্কার ও মূল্যবান জামা কাপড় পরে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা এখনও নৌকা থেকে নামিনি। পাড় থেকে এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মুহম্মদ জাফর আর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব কি এই জাহাজে এসেছেন?

জবাবে আমি বললাম– হ্যাঁ, তাঁরা দুইজনই এসেছেন।

আমার এই জবাব শুনে তাঁরা পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে এবং হাতে হাতে করে আমাদেরকে নৌকা থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। নিচে নেমেই জানতে পারলাম, মওলানা আহমদুল্লাহ যিনি আমার এক বৎসর পর পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৫ই জুন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মানে আমার ছয় মাস আগেই আন্দামানে পৌঁছে গেছেন। অন্য একটি জাহাজের কয়েদীদের নিকট, যারা বোম্বাই থানা জেল থেকে আমাদের আগেই রওনা হয়ে মাত্র দুইদিন পূর্বে পৌঁছেছিল, আমাদের আগমনবার্তা জানতে পেরে মওলানা সাহেব আমাদের প্রতিক্ষায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তারই ইঙ্গিতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটে এসেছিল।

চলাফেরা করার অবাধ অধিকার

জাহাজ থেকে অবতরণ করার পর অভ্যর্থনাকারী দলের সঙ্গে মুসাফাহ ও মুয়ানেফা করলাম এবং আমাদের সহযাত্রী কয়েদীদের সঙ্গ ত্যাগ করে মুনশী গোলাম নবী সাহেবের বাড়িতে হাজির হলাম। তিনি মেরিন ডিপার্টমেন্টের মুহরী ছিলেন। সেখানে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। সেই বাড়িতেই আমরা তিনজন অবস্থান করতে থাকি। আমাদের পায়ের বেড়ী কেটে দেওয়া হলে আগে থেকে তৈরী করে রাখা ভাল পোষাকও পেলাম। সমবেত বন্ধুগণের সঙ্গে দস্তরখানায় বসে একত্রে আহার করলাম। তারপর থেকে আমাদের মুক্তিলাভের দিন পর্যন্ত আমাদেরকে আর কখনো কয়েদীর ব্যারাকে বাস করতে, তাদের পোষাক পরতে কিংবা আহার্য গ্রহণ করতে হয়নি। এদিন থেকেই যেন আমাদের সত্যিকার মুক্তি হয়ে গেল। যদিও দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল চাকুরেদের মতো নির্বাসন ভোগ করেছিলাম। তবু সেদিন বিকাল থেকে বাড়ি বাড়ি দাওয়াত হতে লাগলো।

বইঘর ও রোকন
এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন হতে থাকে যে, এমন উচ্চাঙ্গের আহার্য ভারতেও কোনদিন আমাদের ভাগ্যে জুটেনি। সারাজীবন আমাকে জেলের খানা খেয়েই কাটাতে হবে, আমার এই বদ্ধমূল ধারণাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর উত্তম প্রতিদানে চির অবসান ঘটিয়ে দিলেন এবং তাঁর অনন্ত মহিমার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখালেন।

এই দ্বীপে পৌঁছে দেখতে পেলাম স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র কয়েদীর ললাটে তাদের নাম, অপরাধ ও যাবজ্জীবন দণ্ড কথাগুলো উল্কি দ্বারা এঁকে দেওয়া হয়েছে। তকদিরের লেখার মতোই এই লেখাগুলো সারাজীবন অক্ষয় হয়ে থাকে, নিশ্চিহ্ন হয় না। কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির অনুগ্রহে আমাদের আন্দামান পৌঁছাবার পূর্বেই মাথায় উল্কি আঁকবার আদেশ গোটা ইংরেজ রাজত্ব থেকে চিরদিনের জন্য রহিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমাদেরকে সেই কলংকময় চিহ্ন বহন করতে হল না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের ৯২ ডিগ্রী ৪৩ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ও ১১ ডিগ্রী ৪৩ মিনিট উত্তর অংশে অবস্থিত। প্রায় এক হাজার দ্বীপের সমষ্টি এই দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত। এর আয়তন ১৭৪৬ বর্গফুট। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ছয়শো মাইলের মতো। ভূতত্ত্ববিদদের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় এই দ্বীপপুঞ্জ অতীতে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নৈসর্গিক উত্থান-পতন ও সমুদ্র তরঙ্গঘাতে ইহা স্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিণামে একটি অপরটি থেকে আলাদা হতে হতে শত শত সমুদ্রদ্বীপে রূপান্তরিত হয়। এখান থেকে মৌলমিন তিনশো মাইল পূর্ব উত্তরে, সিঙ্গাপুর চারশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, নোপাং সাড়ে তিনশো মাইল পূর্বদিকে, নেকোবর আশি মাইল দক্ষিণে, মাদ্রাজ আটশো মাইল পশ্চিম দিকে এবং সিংহল আটশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানকার দ্বীপগুলো সেই পর্বতময়। সমভূমি খুবই কম। মাউন্ট হেরিয়েট সর্বোচ্চ পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা এগারশো ষোল ফুট। সুপেয় পানির কোন স্রোতস্বিনী এখানে নেই। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে উঁচু টিলা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তা শুকিয়ে যায়। কূপ ও দীঘির সংখ্যা প্রচুর। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর দিকে একটি গন্ধকের পাহাড় আছে। তা থেকে সর্বদাই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। এখানকার জঙ্গলে শূকর ছাড়া আর কোন চতুষ্পদ হিংস্র পশু বা পক্ষী নাই।

www.boighar.com

নানা সম্পদ

লোয়াবে আবাবিল এখনকার এক উৎকৃষ্ট বস্তু। ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে এ ছাকানকুর, অর্থাৎ গো-সাপের মাংসের অপেক্ষাও নাকি অধিকতর মূল্যবান। বাজারে এর দাম টাকায় টাকায় তোলা। এখানকার জঙ্গলে হাজারো রকমের উৎকৃষ্ট ও মজবুত কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কাঠের থেকে এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার ঝাউ গাছগুলোও বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রবাল, বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক পাখী, নানা প্রকার শামুক, শঙ্খ ও বিচিত্র বর্ণের কড়ি ও ঝিনুক অন্যতম রপ্তানী দব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফলমূল আম, জাম তেঁতুল কাঁঠাল, বড়াল, জায়ফল, নারকেল, পান-সুপারী স্বভাববই এখানে আছে। এখন জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় পঞ্চাশ ষাটটি গ্রামও গড়ে উঠেছে। সব রকমের তরি-তরকারী ও খাদ্যশস্য যেমন ধান, ভুট্টা, অড়হর, মুগ, মাসকলাই, আখ এখানে প্রচুর জন্মে। কিন্তু গম ও ছোলা ধরনের রবিশস্য ও শীতপ্রধান দেশের শাকসবজি মোটেই হয় না। গভর্নমেন্ট গম ছোলা কলকাতা থেকে আমদানী করে। সেগুলোর দর প্রতি পাউন্ড সাত পাই। বারো মাসই মেলে এবং একই দর। কাজেই এসব জিনিসের জন্য কোন অসুবিধে হয় না।

বর্তমানে এখানকার আবহাওয়া এত চমৎকার যে, পৃথিবীতে আর কোথাও এমন স্বাস্থ্যকর স্থান আছে কিনা সন্দেহ। কলেরা, বসন্ত, জ্বর– এমনি সব ব্যাধির অস্তিত্ব নেই। আমার বিশ বৎসরের জীবনে কোনদিনই এইরূপ কোন রোগের খবর পাইনি।

বিষুব রেখার কাছাকাছি হওয়ায় এখানে বারো মাসই দিনরাত্রি প্রায় সমান থাকে, তারতম্য অতি সামান্য। শীতও নেই, গ্রীষ্মও নেই। বারো মাস আমাদের দেশের চৈত্র-বৈশাখ মাসের আবহাওয়া বিরাজ করে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে একটা চাদর গায়ে দেওয়ার দরকার হয়। শীতের দিনেও কেউ কম্বল তৈরী করে না। এখানে হেমন্ত ঋতু নেই, নেই বসন্ত। কিন্তু বারো মাসই বৃক্ষলতা ফুলে ফলে সুসুভিত থাকে। এখানকার আদিম অধিবাসী আজন্ম উলঙ্গ জংলী জাতিগুলোকে বাঁচাবার জন্যই যেন বিধাতা ঋতুর এই অপূর্ব ব্যবস্থা করেছিলেন।

বৃষ্টিপাত খুব বেশি। মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সাত মাস দিনরাত অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। এজন্যই বাড়িঘরের ছাদগুলো ঢালু করে তৈরী। আমাদের দেশের কাঁচা ও চ্যাপ্টা ছাদ ঐ বৃষ্টিতে একদিনও টিকতে পারতো না। শীতকালে কখনও বরফ পড়ে না, ঝড়ও হয় না কখনো।

জঙ্গল অত্যন্ত ঘন ও দুর্গম, গাছগুলো গগনস্পর্শী উচ্চ। কোন গাছ কেটে ফেললে তার ডালপালা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আদিম অধিবাসী

এখানকার অরণ্যে স্মরণাতীতকাল থেকে একটি আজন্ম উলঙ্গ জংলী জাতি বাস করে আসছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দিগম্বর। কাপড় চোপড় কেনার সংগতিও তাদের নেই। এই জংলীদের তথা কখন কোথা থেকে তারা এসেছে, ইতিবৃত্তান্ত কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তারা নরমাংস ভোজী নয়, এ কথা ঠিক।

পোর্ট ব্লেয়ারের নামকরণ

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে সর্বপ্রথম লেফটেন্যান্ট ব্লোয়ার নামে এক জাহাজী অফিসার এখানে এসে নোঙর স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই নামে এই দ্বীপের নাম পোর্ট ব্লেয়ার। এসময়, অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্বে গভর্ণমেন্ট আরো একবার দ্বীপান্তরের কয়েদীদের জন্য এই দ্বীপপুঞ্জকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তখনকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। তাই ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বসতি স্থাপনের পরও তার উচ্ছেদ সাধন করেন। পুনরায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাস থেকে যখন আবার বসতি স্থাপন শুরু হয়, তখন ওখানকার আদিবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এই অসন্তোষ ক্রমে সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। প্রথম সুপারিন্টেডেন্ট ডাঃ ওয়াফার সাহেবের শাসনকালে জংলীরা বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে একবার হেদুর ওপর এবং দ্বিতীয়বার আব্‌রতিনের ওপর আক্রমণ চালায়। সদয় ব্যবহার আর কুটনীতি দ্বারা ওদেরকে ক্রমে সরকারের বশীভূত করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় বহু হত্যাকাণ্ড করলেও, এখন জঙ্গল কি লোকালয় যেখানেই দেখা হোক, তারা ভদ্র আচরণেই অভ্যস্ত। এদের দৈর্ঘ সাধারণত চার ফুট থেকে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি পর্যন্ত। হাবশীদের মতো রং কালো, মাথা গোলাকার, চোখ বড় বড়, মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ান চুল। এরা খুব শক্তিশালী ও পরিশ্রমী।

আকিদা ও কালচার

সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এরা বারোটি জাতি বাস করে। এক জাতির ভাষা অন্য জাতির সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না। ওরা বিশ্বাস করে স্রষ্টা আকাশে আছেন। তিনি সকল বস্তুরই কর্তা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কাহারো দ্বারা সৃষ্ট নন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর বাসস্থান যে আসমান, তা খুবই সুন্দর। তাঁকে কেউ

দেখতে পায় না। তাঁরই আবাস থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তাঁরই নিকট থেকে বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের শিখা পৃথিবীতে আসে। তাঁরই হুকুমে মৃত্যু হয়। তিনি রুজী ও কল্যাণদাতা। তাঁর একজন স্ত্রী আছে। তাঁর নাম 'চানাপালক'। ইনিও স্বয়ম্ভু। কিন্তু তাঁর মর্যাদা বিধাতা অপেক্ষা হীন। ইতি সমুদ্রের মৎস পয়দা করেন এবং আকাশ থেকে সেগুলো ফেলে দেন।

এরা শয়তানকেও স্বীকার করে এবং মনে করে যে সমস্ত মন্দ কাজ শয়তানই করায়। কিন্তু তাদের মতে শয়তান দুই জন। একজন স্থলভাগের যার নাম 'আরাম চৌগলা'। কেউ যদি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ওরা মনে করে আরাম চৌগলা তাকে মেরে ফেলেছে। অপরজন পানির শয়তান। নাম 'জরুডাণ্ডা'। কেউ পানিতে ডুবে মরলে তারা বলে জরুডাণ্ডা তাকে হত্যা করেছে। এরা দেবদূতেও বিশ্বাসী। তারা মনে করে দেব দূতেরা নারী পুরুষ উভয় জাতি বিশিষ্ট। তারা জঙ্গলে বাস করে ও মানুষের দেখাশুনা করে। ভূত-প্রেতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু বলে যে, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এরা খুদা বা অন্য কাউকে পূজা করে না। নূহ (আ.) এর তুফানের প্রতি এরা আস্থাশীল। বলে যে, জমিনের উপর এমন একটি প্লাবন এসেছিল যে, তাতে সমগ্র পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল। তখন জংলীদের বুজুর্গ ব্যক্তিরা একখানি নৌকা তৈরী করে, তাতে আরোহণ করেছিলেন এবং তুফান প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল তাতে আত্মরক্ষা করেছিলেন। তুফান নেমে গেলে আন্দামানের কোন পাহাড়ে নৌকা পাড়ি জমিয়েছিল।

বিবাহ

এই আদিবাসীরা দুই-এর বেশি সংখ্যা গুনতে জানে না। আশৈশব ন্যাংটা চলাফেরা করে। মেয়েরা কেবল তাদের গুপ্তস্থানে ছোট একটি পাতা উল্টে রেখে দেয়। পুরুষেরা কেউ গোঁফ দাড়ি কি চুল কিছুই রাখে না। কাঁচের টুকরা দিয়ে কামিয়ে ফেলে। এদের বিয়ে শাদির ব্যাপারটাও খুব সাদাসিধে। বিয়ের সময় বর-কনে উভয়কেই লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। গোত্রের সকল লোক আসে এই সমাবেশে। একজন বরকে উঠিয়ে নিয়ে কনের সামনে বসায়। বরের সামনে অনেকগুলো তীর ধনুক রেখে দেয় আর তখন তাকে বলা হয়, সে এইগুলোর সাহায্যে শিকার করে স্ত্রীর প্রতিপালন করবে। তখন কাজী উচ্চৈঃস্বরে 'আবার এক' এই শব্দটি উচ্চারণ করে। এর অর্থ– নিয়ে যাও, এ তোমার স্ত্রী। এর পরই বিবাহ পাকা হয়ে গেল। তারপর সারাজীবন তাদের মধ্যে না আছে তালাক, না আছে ছাড়াছাড়ি। বিয়ের পর এদের মধ্যে ব্যভিচার হয় না।

সন্তান প্রসবকালে এদের পর্দা করবার কোন প্রয়োজন হয় না। সন্তান জন্মলাভ করবার পর একজন স্ত্রী লোক পাতা দিয়ে মাছি তাড়িয়ে থাকে– আর একজন নাড়ি কেটে শিশুকে কোলে নিয়ে বসে। প্রথমদিন অন্য কোন স্ত্রীলোক স্তন্যদান করে। দ্বিতীয় দিন থেকে শিশুর মা নিজেই স্তন্যপান করায়। প্রসবের পর পরই প্রসূতি চলাফেরা করতে থাকে। বেছে চলবারও প্রবণতা নেই। শিশু একটু বড় হলেই তীর ধনুক হয় তার প্রথম খেলার সামগ্রী।

বাসগৃহগুলো খুব ছোট ও নড়বড়ে। চারটি খাম মাত্র খাড়া করে তার উপর পাতার ছাউনি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে একটি আশ্রয় তৈরী করে নেয়। ঘরে স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কোন মালপত্র বা সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তীর ধনুকই ওদের আসল সম্পত্তি এবং ওটাই ওদের প্রাণ। ছোট ছোট ডিঙ্গি তৈরী করে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চলাফেরা করার এই তাদের অবলম্বন।

আন্দানের আবহাওয়ার উন্নতি

১৮৫৮ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। এখানে বসতি স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় একটি জাহাজী ব্যাধি মহামারিরূপে দেখা দেয়। ফলে হাজার হাজার লোক মানবলীলা সংবরণ করে। কিন্তু শুকুর আল্লাহর, আন্দামানে আমি পৌঁছবার এক বৎসর পূর্বেই ওখানকার সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আবহাওয়া তা কাশ্মীরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল। একে অস্বাস্থ্যকর স্থান উপরন্তু নতুন বসতি স্থাপন, সেইজন্য ইংরেজরা কয়েদীদের জন্যে এখানকার আইন-কানুন খুব মোলায়েম করে রেখেছিল। তাদের সঙ্গে সর্বোতভাবে সহৃদয় ব্যবহার করা হত। কিন্তু আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠলে ও বস্তির সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা এমন সব কঠোর বিধিবিধান প্রবর্তন করলো, যেগুলো হিন্দুস্থানের জেলখানার চেয়েও মারাত্মক।

আইনের নমুনা

আমাদের আন্দামান পৌঁছবার পর থেকেই এখানকার বিধানসমূহ কঠোর হতে লাগলো। অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে, নতুন কয়েদীকে এখানে এসে দশ বৎসর কাল কঠোর মেহনত করতে হবে, সে ভাণ্ডার থেকে পাবে খাদ্যখানা এবং মোটা কাপড়, ব্যারাক জীবনই তার ভাগ্য। তাছাড়া কোন রকম সহানুভূতিও তাকে দেখান হবে না। উদাহরণস্বরূপ– ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে প্রচারিত আইনের

একটি বাক্য উদ্ধৃত করছি– 'দ্বীপান্তর শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীগণকে কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত করা ও যাহাতে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে শুধু সেই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা উচিত হইবে।' তবে এই আইন-কানুন কেবল নবাগত কয়েদীদের প্রতিই প্রযুক্ত হচ্ছিল এবং আমরা পুরাতন লোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলাম।

আমি এখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অসংখ্য রাজা, নবাব, জমিদার মওলানা, মুফতী, কাযী, ডেপুটি কালেকটার, মুনসেফ, সদরই আমীন, রিসালদার সুবাদর, জমাদার কয়েদী আছে। এঁরা শুধু কালা আদমী ও জন্মগত হিন্দুস্থানী হওয়ার অপরাধে মুচি-মেথরদের মতো মোটা ভাত-কাপড় পেতেন এবং সাধারণ কয়েদীর ন্যায় তাদেরকে কায়িক পরিশ্রমে লিপ্ত হতে হতো। অথচ শ্বেতকায় ইউরোপীয়, এমনকি বাদামী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাও কোট প্যান্ট ও ইংরেজি ভাষার বদৌলতে গোরা সৈন্যদের মতোই খোরাক পোষাক পেত। অধিকন্তু তাদের বাসের জন্য একটি বাড়ি ও খেদমতের জন্য বিনাবেতনে একজন ভৃত্যও দেওয়া হতো। আর যে গোরা ইংরেজ বা এ্যাংলোর লাইসেন্স থাকতো, পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারাও পেত তারা।

আমাদের আন্দামান পৌঁছবার সপ্তাহ খানেক পরেই সিঙ্গাপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত সারাওয়াক দ্বীপের শাসক ব্রুক্স এর চাহিদামতো ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের পঞ্চাশজনকে সেখানে পাঠান হয়। সুতরাং এদের স্থানান্তরের ফলে কতগুলো উৎকৃষ্ট পদ খালি হয়ে গেল। সংবাদপত্র ও মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের মারফতে আন্দামান কর্তৃপক্ষ আমার যোগ্যতা ও জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন। এভাবে এখানে পদার্পণ করবার কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে সুপারিন্টেডেন্ট ও চীফ কমিশনারের কোর্টে সেকশন ক্লার্ক বা নায়েবে মীর মুনশী রূপে নিয়োগ করা হলো। বাসগৃহ ও চাকরও পেলাম। স্বাধীন নাগরিকের মতো যদেচ্ছা চলাফেরা করবার অধিকার ফিরে এলো। কোন বাধা নিষেধই রইল না। এ সময় আমার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর। পূর্ণ যৌবনকাল। এ বয়সে একক জীবন যাপন করা দ্বীন বা দুনিয়া কোন দিক দিয়েই নিরাপদ ছিল না। এমতাবস্থায় প্রথমত আমি আমার স্ত্রীকেই দেশ থেকে আনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে আইনগত বাধা ছিল। সুতরাং আমার পৌঁছবার কয়েক মাস পর সদ্য কাশ্মীর থেকে আগতা একটি অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করলাম। আকস্মিক বিপাকে পড়ে সে আন্দামানে এসেছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর মওলানা আবদুর রহীম সাহেব আন্দামানে পদার্পণ করেন। আমি তখন পরসুইরা প্রিন্ট নামক দ্বীপে থাকি। আন্দামানে

পৌঁছে তিনি প্রথমত ঘাট মুনশী নিযুক্ত হলেন এবং তার অল্পকাল পর হাসপাতালের কেরানীর পদ পেলেন। এইভাবে প্রায় নয় বৎসর কাল সরকারী পদে বহাল থাকার পর তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ের দোকান খোলবার টিকিট গ্রহণ করেন এবং এই দোকানদারী পেশার মারফতেই তাঁর মুক্তি লাভ হয়।

লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ড ও অতঃপর

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। কর্নেল মেইন অবসর গ্রহণ করে বিলাত চলে গেলেন। অক্টোবর মাসে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট, যিনি শেষ পর্যন্ত ভারতের কমান্ডার-ইন-চীফ পদে উন্নীত হয়েছিলেন, চীফ কমিশনাররূপে আন্দামান এলেন। তাঁরই শাসনকালে লর্ড মেয়োর সাহেবের নির্দেশক্রমে পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দীদের জন্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। লর্ড মেয়ো রচিত আইন কানুনগুলোও জারি হয়ে গেল। যার ফলে আন্দামানের বন্দীদের দুর্দশা হিন্দুস্থান ও বিলেতের জেলখানাসমূহের কয়েদীদের চেয়েও গুরুতর আকার ধারণ করলো। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডও এই স্টুয়ার্ট সাহেবের কার্যকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনা সংক্ষেপে পাঠকদের কাছে পেশ করছি।

লর্ড মেয়ো ছুরিকাহত

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল সাতটার সময় চারখানা গানবোট যোগে লর্ড মেয়ো বাহাদুর আন্দামানে পদার্পণ করলেন। বহু সংখ্যক সাহেব ও মেম দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ মানসে লর্ড সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন। সকাল ৮টার সময় তিনি পোর্ট ব্লেয়ারের হেডকোয়ার্টার রুশদ্বীপে কয়েকজন সঙ্গীসহ জাহাজ থেকে নামলেন। অবতরণকালে একুশবার তোপধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হলো। আযাদ ও কয়েদী হাযার হাযার নরনারী এই দৃশ্য দেখবার জন্যে তখন রুশদ্বীপের ঘাটে উপস্থিত ছিল। ঘাটে নেমেই তিনি দ্বীপের বাজারের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর ইস্কুল হাসপাতাল কয়েদী ও পল্টন ব্যারাকসমূহ পরিদর্শন করলেন এবং শেষে আন্দামান চীফ কমিশনারের বাংলোতে উপনীত হন। সেখানে নাশ্‌তাপর্ব সেরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন ও পরে গোরা সৈন্যদের ব্যারাক পরিদর্শন শেষে দ্বীপর দ্বীপে গেলেন। এই দ্বীপরের জেলখানাতেই সমস্ত দুষ্ট কয়েদীর স্থান। দ্বীপর সফর করবার পর তিনি চাটুমে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মাউন্ট হেরিয়েন্ট দ্বীপে চলে যান কিন্তু তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও চীফ

কমিশনার উভয়েই সন্ধ্যাকালে ওখানে যাওয়া থেকে তাঁকে নিরস্ত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু লর্ড বাহাদুর সে সব বিশেষ আমল দিলেন না। চাটুম থেকে গাড়ীতে উঠে মাউন্ট হেরিয়েন্টের পাদদেশে অবস্থিত হুটিয়ুনে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সওয়ারী যোগে ইয়াবু পর্বতে আরোহণ করলেন। তখন সূর্য অস্তমিত প্রায়। লর্ড বাহাদুর পাহাড়ের ওপরে বসে প্রাণভরে সমুদ্রে সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করলেন। বললেন 'এমন দৃশ্য জীবনে আর কোনদিন দেখেননি।' অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে মশাল জ্বলে উঠলো। তিনি সেই আলোকে নীচে অবতরণ করলেন। তখন একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাঁর চতুর্দিকে প্রহরারত ছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারী ও চীফ কমিশনার সাহেব তাঁর ডান ও বাঁয়ে দেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে চলছিলেন। তাছাড়া পেছনে বহু সংখ্যক অফিসার। সমুদ্রতীরে একখানা গাড়ী সেদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে পৌঁছতেই চীফ কমিশনার সাহেব বিশেষ কোন প্রয়োজনে লর্ড বাহাদুরের অনুমতিক্রমে কিছুক্ষণের জন্য পেছনে গেলেন। লর্ড বাহাদুর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীসহ ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ গাড়ীর নীচে লুক্কায়িত এক ব্যক্তি ছুরি হাতে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল এবং লর্ড সাহেবকে এমনভাবে দুইটি আঘাত হানলো যে, তিনি কম্পিত শরীরে সমুদ্রে গড়ে গেলেন। ঐ হট্টগোলে মশালের আলোগুলোও নির্বাপিত। একজন কয়েদী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আততায়ীকে ধরে ফেলল। নইলে সে হয়তো আরো দুই চারজনকে হত্যা করতো। লর্ড সাহেবকে সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষমান গাড়ীতে তাঁকে শায়িত করা হল। সেখানেই তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দুই একটি কথা বলতে বলতে মানবলীলা সংবরণ করলেন।

হত্যাকারীর পরিচয় ও তার বিবৃতি

অতঃপর হত্যাকারীর সঙ্গে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরগুলো অনুষ্ঠিত হল–

প্রশ্ন : কেন তুমি এই কাজ করলে?

উত্তর আল্লাহর হুকুমেই আমি তা করেছি।

প্রশ্ন : এই কার্যে তোমার কোন সঙ্গী আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহ আমার সঙ্গী।

তারপর তার প্রতি প্রযোজ্য আইনের বিধানাবলী পরীক্ষা করবার পর বেঙ্গল হাইকোর্টের অনুমোদনক্রমে হত্যাকারীকে ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার নাম শের আলী। সে জেলা পেশোয়ারের একজন পাহাড়ী আফগান। সে নিম্নরূপ

বইঘর ও রোকন

বিবৃতি দিয়েছিল–

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই আমার সংকল্প ছিল যে, আমি কোন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করব। সেই কয়েক বৎসর যাবত আমি এই ছোরাখানা তৈরি করে রেখেছিলাম। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী যখন লর্ড বাহাদুর আগমন করলেন এবং তাঁর সালামীর তোপধ্বনি হলো তখন আর একবার আমি ছোরাখানা ধার দিয়ে নিলাম। সারাদিন ঐ রুশদ্বীপে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম। সেখানে লর্ড বাহাদুরের চলবার পথে আমার সাক্ষাত ঘটতে পারত। কিন্তু সেখানে যাওয়ার অনুমতি পাইনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম, তকদীর তাঁকে আমার বাড়িতেই নিয়ে এলো। আমি তাঁর সঙ্গে পাহাড়ের উপরেও গিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গেই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু যাওয়া কি ফেরার পথে কিংবা পাহাড়ের ওপরে কোথাও এরূপ সুযোগ পাইনি। তখন এই গাড়ীর আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলাম এবং এখানেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হল।

লোকটি ক্ষীণকায়, খাটো এবং দেখতে কুৎসিত। কিন্তু ভয়ংকর শক্তিশালী ও সাহসী ছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে সে কয়েদীদেরকে সম্বোধন করে উচ্চৈঃস্বরে বলল, 'ভাই সকল! আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমি মুসলমান।'

তারপর সে কলেমা পড়তে লাগলো এবং ঐ কলেমা তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ পাখী উড়ে গেল।

এর মাত্র একমাস পুর্বে চীফ জাষ্টিস মিঃ নরম্যানকেও কলকাতায় এমনিভাবে একজন পেশোয়ারী পাঠান হত্যা করেছিল। এই সকল নৃশংস ও শিক্ষামূলক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের পক্ষে পাঠানদের শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজরা পাঠানদেরকে পূর্বাপেক্ষা বেশি খাতির করতে লাগল। অপর পক্ষে ওহাবীদের প্রতি তাদের শত্রুতা বেড়ে গেল।

ঈশ্বরী প্রসাদের চেষ্টা

লর্ড মেয়োর এই হত্যাকাণ্ডের পর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার লিমিট সাহেব আমাদের পুরাতন বন্ধু লালা ঈশ্বরী প্রসাদ এবং আরো একজন নামকরা পুলিশ অফিসার ওহাবীদেরকে এই মোকদ্দমায় জড়িত করবার সংকল্প নিয়ে পাড়ি দিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছলেন। এই ঈশ্বরী প্রসাদ ইতিপূর্বে আমাদের সঙ্গে প্রণয়

দেখিয়ে সার্জনের পদ থেকে ডেপুটি কালেকটরের পদে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু খোদাওয়ান্দ করীমের কৃপায় তখন কয়েকজন ভাল অফিসার পোর্ট ব্লেয়ারে ছিলেন। তাঁরা আমাদের কার্যকলাপ, চালচলন, এই হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকারী সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই এবারকার মতো ঈশ্বরী প্রসাদের শিকার সন্ধান ব্যর্থ হয়ে গেল। নইলে সে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেই অতীতের মতো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রস্তুত করবার কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলে দিলেন, 'ওহাবীদের সম্পর্কে আমি সবিশেষ ওয়াকিবহাল আছি। সুতরাং আমি আমার এলাকায় অকারণ এইরূপ অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হতে দেব না।'

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ওহাবী গ্রেফতারীর যে আগুন থানেশ্বরে জ্বলে উঠেছিল, তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। একে নেভাবার চেষ্টা না করে স্বয়ং আমাদের মুসলিম এবং হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দ তাতে তৈল ও তারপিন রূপ ইন্ধন যোগাতে লাগলো। তদুপরি হান্টার সাহেবের গবেষণা। তিনি ভারত সরকারকে এমন আতংকিত করে তুললেন যে, সরকার পাটনা সাদেকপুরের ঘরবাড়ি, যেগুলোতে মুজাহিদ বাহিনীর লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং তথাকার কল্পিত বিদ্রোহীদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে লাগলেন। এতেও দীল ঠাণ্ডা হল না। ১৮৭২ সালের শেষভাগ পর্যন্ত পাটনা-বাংলার নিরপরাধ মুসলমানদের গ্রেফতার কার্য অব্যাহত রাখা হল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে মওলানা তাবারক আলী ও মওলানা আমিরুদ্দীন আমাদের কাছে আন্দামানে পৌঁছেন। কিন্তু নবপ্রবর্তিত আইনসমূহের কড়াকড়ির দরুন দীর্ঘকাল তাঁদেরকে শ্রমস্বীকার করতে হয়। যাই হোক, কিছুকাল পর প্রথমজন ষ্টেশন ক্লার্ক ও দ্বিতীয়জন মাদ্রাসার ছাত্রদের উস্তাদ নিযুক্ত হন এবং মাত্র দশ বৎসর সাজা খাটবার পর ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের কৃপায় তারা আমাদের সঙ্গে আপন গৃহে ফিরে আসেন।

ওহাবীদের ওপর গভর্নমেন্টের এই ক্রোধ ও উপর্যুপরি তাদেরকে দশ বৎসরকাল ধরে সাগর পার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল– ভারতের বুক থেকে তাদের সমূলে উচ্ছেদ, যাতে করে তাদের বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি কিন্তু কালাপানি থেকে ফিরে এসে বিপরীত ফলই দেখতে পেলাম। আমার এদেশে অবস্থানকালে গোটা পাঞ্জাবে মোট দশজন ওহাবী মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন কি না সন্দেহ। অথচ এখন দেখতে পাচ্ছি, এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যার এক চতুর্থাংশ মুসলিম অধিবাসী মওলানা ইসমাইল সাহেবের অনুসারী নন। দিন দিন এই দলটি এমন বিরাটহারে বাড়ছে যে, একদিন যেমন প্রোটেস্ট্যান্টরা গোটা ইউরোপের ভেতর অকস্মাৎ বিস্তার লাভ করেছিল, এরাও যেন ঠিক তেমনি।

আসলে অত্যাচার দিয়ে আদর্শের গতিরোধ করা যায় না। বরং তাতে সে আরো শক্তিশালী হয়।

ইতিমধ্যে আমি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলাম। তাই ডঃ হান্টারের লিখিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থখানা পাঠ করবার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। অনেক চেষ্টার পর কলকাতা থেকে সাত টাকা মূল্যের এর দ্বিতীয় মুদ্রণের একখানা বই আনলাম। বইখানা পাঠ করে দেখলাম, ডক্টর-প্রবর এক স্থানে বিরাট ভূমিকা দিয়ে লিখেছেন– 'গভর্নমেন্ট যদি নরপতি সুলভ অনুকম্পাবশে ওহাবীদেরকে কালাপানি থেকে মুক্তি দেন, তাহলে তারা উহাকে আল্লাহর দান মনে করে হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তনের পর ইংরেজ রাজত্বের আরো অধিকতর ধ্বংস ও বরবাদীর কারণ হবে।'

www.boighar.com

গোড়া থেকে আমরা গভর্নমেন্টের যেরূপ ক্রোধভাজন ছিলাম, তাতে মুক্তি সম্পর্কে একরূপ হাত ধুয়েই বসেছিলাম। যা একটু হীন আশা ছিল, তাও এই মন্তব্য পাঠে তিরোহিত হতে লাগলো। এরপর গভর্নমেন্ট যখন যাবজ্জীবন দণ্ডপাপ্ত কয়েদীদের বিশ বৎসর সাজা খাটবার পর মুক্তি দেয়ার আইন প্রবর্তন করলেন, আমরা তারও বাইরে পড়লাম। তার ওপর গ্রন্থকর্তা স্বয়ং হান্টার সাহেব গভর্নর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হলেন, তখন আমরা সর্বাধিক নৈরাশ্য অনুভব করলাম। ভাবলাম, যার বই একবার পড়লে বিচক্ষণ ইংরেজও আমাদের চিরশত্রু হয়ে পড়ে, গভর্নর জেনারেলের দরবারে তাঁর এই নৈকট্য লাভের পর আমাদের মুক্তির প্রশ্নতো দূরের কথা, না জানি আরও কত কি বিপদ তিনি টেনে আনবেন।

ডক্টর হান্টারের গ্রন্থ থেকে আরও একটি তথ্য অবগত হলাম– তিনি তার বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'অধুনা আমি যখন সিমলায় বসে এই গ্রন্থ রচনা করেছি তখন মুহম্মদ শফী সরকারী সাক্ষীরূপে পাটনায় তার জ্ঞাতিভ্রাতাদেরকে গ্রেফতার করিয়ে দিচ্ছে। এই সেই শফী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আম্বালা কোর্টে যার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। যদি ফাঁসিকাষ্ঠেই ঝুলান হত, তাহলে আজ সহস্র সহস্র মুসলিম নরনারী তাকে শহীদ মনে করে তার কবর জেয়ারত করত। আজ সেই শহীদ ব্যক্তি সরকারী সাক্ষী সেজে তারই ধর্মালম্বী ও সহমতালম্বী ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রাণপণে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে।'

হান্টার সাহেবের এই মন্তব্য শুধু শফী নয়, সমস্ত মুসলমানের প্রতি কটাক্ষপাত, যদিও শফী ছাড়া সমাজগতভাবে আর কোন মুসলমানের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়। কারণ মুসলমানদের দলে আমিও ছিলাম, আমাকে কেন সাক্ষী করা হয়নি? ক্যাপ্টেন পার্সন ১৮৬৩ সালে আমাকে সাক্ষী বানাবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি

করেনি। কিন্তু সে চেষ্টাকে আমি শিশুসুলভ খেলাই মনে করেছিলাম। আমি ডক্টর হান্টারের সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত যে, 'মুসলমান দীনদার ও নির্ভীক পুরুষদের পক্ষে তা শোভনীয় নয়, যা মুহম্মদ শফী দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।' যেসব গরীব মুসলমান মুহম্মদ শফীর সাক্ষ্যে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তার সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করছেন? মুহম্মদ শফী তার এই কাপুরুষোচিত কার্যকলাপের দ্বারা সরকারী কয়েদ থেকে অবশ্য কয়দিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর কবল থেকে তো রেহাই পায়নি? অবশেষে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি যে সাক্ষী সাজিনি, আজও বেশ আরামে সশরীরে বেঁচে আছি। এখনো আমার অনেক শত্রু আছে, কিন্তু কেউই আমার একটি লোম পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।

১৮৭৬ সালের জুন মাস। আমি পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণ জেলায় মীর মুনশী নিযুক্ত হয়ে আবরডীনে বদলী হয়ে গেলাম। আমি যার অফিসের চাকুরে– ডেপুটি কমিশনার প্রার্থু সাহেব ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু ও শাগরিদ। ইনি আমার সহযোগিতায় পোর্ট ব্লেয়ারের একটি আইন গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে সাধারণ্যে প্রকাশ লাভ করে। আমি স্বয়ং তার উর্দু অনুবাদ করেছিলাম আর সেটাও মুদ্রিত হয়েছিল। আমার চৌদ্দ বৎসরের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রার্থু সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরই প্রস্তাবক্রমে আমার মুক্তির সুপারিশ করে ভারত গভর্নমেন্টের নিকট রিপোর্ট প্রদত্ত হয়েছিল। অবশ্য তার ফল হয়েছিল যা হবার তাই। হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী এমন চটে গিয়েছিলেন যে, ফলে আমার মুক্তি তো দূরের কথা বরং আমার মৃত্যু অথবা বৃটিশ রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত আমার মুক্তিলাভের আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়ে গেল।

মওলানা আবদুর রহীমের স্ত্রীর আবেদন পত্র

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মওলানা আবদুর রহীম সাহেবের পুত্র মওলানা আবদুল ফাত্তাহ সাহেব পিতার সাক্ষাৎ লাভের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছলেন এবং প্রায় এক বৎসর কাল এখানে থেকে ভারতে ফিরে গেলেন। মওলানা সাহেব খাস তাঁর মুক্তিলাভের জন্য একখানা দরখাস্তের মুসাবিদা নিজ পুত্রের মারফত ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। এই মুসাবিদা মোতাবেক একখানা দরখাস্ত তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে প্রেরিত হল। তাতে লেখা ছিল, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তথায় সেশন জজ ও চীফ কোর্ট উভয় স্থান

থেকেই এই নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, সাধুজীবন যাপন সাপেক্ষে চৌদ্দ বৎসর পর আবদুর রহীমের মোকদ্দমা পুনর্বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু এখন আঠার বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। তাঁর অভাবে আমি অত্যন্ত কষ্টভোগ করছি এবং তিনিও অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আমার বিনীত প্রার্থনা, সরকার বাহাদুর তাঁর মোকদ্দমাটিকে পুনর্বিবেচনা মারফত তাকে মুক্তিদান করুন।

এই দরখাস্ত পাঠ করে গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন ফাইল তলব করা ছাড়াও এ বিষয়ে পাঞ্জাব ও বাংলা সরকারের অভিমত চেয়ে পাঠালেন– এইসব ওহাবীকে খালাস করে দিলে কোন ক্ষতির কারণ আছে কিনা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অভিমত আসবার পর এই মোকদ্দমার ব্যাপারটি পরবর্তী বৎসরের প্রথমভাগ পর্যন্ত মুলতবী রাখা হল। এই দরখাস্ত কেবল মওলানা আবদুর রহীম সম্পর্কেই ছিল এবং সত্যিই তার কোন অপরাধ ছিল না। শুধু বিদ্রোহীদের বংশধর জ্ঞান করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সুতরাং আমরা শুধু তাঁরই মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলাম এবং এই উপলক্ষে আমার নিজের মুক্তিলাভের কোন কল্পনা আমার ছিল না। আমাদের আন্দামান অবস্থানের শেষ দিকে বেঙ্গল কোরের সমস্ত সাহেব পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং তাদের বিদ্বেষ অধিকতর আমাদের দিকেই ছিল। ১৮৮১ সালে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বয়স যখন প্রায় আশি বৎসর, বার্ধক্য ও দুর্বলতার জন্য তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও শত্রুদেরও অনুকম্পার পাত্র হয়ে পড়ে ছিলেন; নিজের এই মুমূর্ষু অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে কলকাতায় অবস্থিত তাঁর পুত্র মওলানা মুহম্মদ ইয়াকিন সাহেবকে ডেকে এনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। এই সাক্ষাৎকার পোর্ট ব্লেয়ারের আইন বিরোধীও ছিল না। নিছক ওহাবী হওয়ার কারণে তার এই দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আমিও দরখাস্ত পাঠিয়ে আবেদন জানালাম যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ রশীদকে পোর্ট ব্লেয়ারে আমার নিকটে আসবার অনুমতি দেওয়া হোক। এই দরখাস্তের সেই একই দশা। এ সময়ে আমার বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে আর একখানা দরখাস্ত দাখিল করলাম। তাতে জেলা কর্তৃপক্ষেরও দীর্ঘ সুপারিশ লিখিত ছিল। কিন্তু চীফ কমিশনার কর্নেল কিডল যে আদেশ জারি করলেন তার প্রতি ছত্রই যেন শত্রুতা ও বিদ্বেষের বিষোদগারে পূর্ণ। তখন আমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমি কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল। সর্বদাই তারা এই চেষ্টায় আছে যে, আইনগত কোন ফাঁক পেলেই বেত্রাঘাত ও দ্বীপরজেল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির দ্বারা মনের জ্বালা মেটাতে পারেন। কিন্তু খোদাওয়ান্দ করীম হেন কর্মকর্তা থাকতে আমার পরোয়া কিসের?

অসুস্থতাবশত মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব যখন শয্যাগত ও ক্ষীণ প্রদীপের মতো দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন মওলানা আবদুর রহীম সাহেব তাঁর মুমূর্ষু অবস্থার কথা বর্ণনা করে কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন, দ্বীপরে তাঁকে (আহমদুল্লাহ সাহেবকে) দেখাশোনা করবার কেউ নেই এবং তিনি (আবদুর রহীম) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সুতরাং মওলানা সাহেবকে আবরডিনে তাঁর গৃহে স্থানান্তরিত করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

এই দরখাস্ত এমন যা পাঠ করলে পাষাণও বিগলিত হয়। অথচ তা নামঞ্জুর হয়ে গেল এই জন্য যে, আবদুর রহীম ও আহমদুল্লাহ উভয়েই ওহাবী। ওহাবীদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করা যেতে পারে না। মওলানা সাহেবের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়লো। এদিকে সাহেবদের মতিগতিও নৈরাশ্যজনক। তখন মওলানা আবদুর রহীম সাহেব আর একবার আবেদন জানালেন যেন তাঁকে রাত্রিকালে দ্বীপরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করবার এযাযত দেওয়া হয়। বহু আলোচনা ও সমালোচনার পর এই দরখাস্তখানা গৃহীত হয় এবং সেই মতে মওলানা আবদুর রহীম সাহেব ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা রোগীর শয্যাপাশে উপনীত হন।

সেই রাত্রেই ২১শে নভেম্বর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ২৮শে মহররম ১২৯৮ হিজরীর সোমবার রাত ১টার সময় তার প্রাণপাখী জান্নাতুল ফিরদৌসে উড়ে গেল। মওলানা সাহেবের মৃত্যুকালে আবদুল ওয়াহিদ নামক তার একজন কর্মচারী হাসপাতালে তাঁর শিয়রে উপস্থিত ছিল। তার বর্ণনায় জানা গিয়েছিল, মওলানা সাহেব, যিনি কয়েকদিন যাবত অজ্ঞান ছিলেন, মৃত্যুর মুহূর্তে চোখ খুলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া মালিকুল মুলক' পড়তে পড়তে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

২১শে তারিখে আটটার সময় আবরডিনে আমরা এই সংবাদ পেলাম। বন্ধু-বান্ধবসহ আমরা বহুলোক সকাল ৯টার সময় দ্বীপরে পৌঁছি। আমি আবরডিনে জেলা কাচারীর মুনশী ছিলাম। সুতরাং জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ দ্বীপ ত্যাগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাহেবেরা আমার উপর যেরূপ বিদ্বেষপরায়ণ তাতে অনুমতি পাওয়ার কোন আশা ছিল না। এ হেন অবস্থায় আমি আল্লাহর ভরসায় বিনা অনুমতিতেই ওখানে চলে গেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একখানা দরখাস্ত লিখে জানিয়ে দিলোম যে, মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁর দাফন কাফনে শরিক হওয়ার জন্য দ্বীপরে রওনা হলাম। অদ্যকার এই অনুপস্থিতির জন্য যেন আমাকে মার্জনা করা হয়। দ্বীপরে পৌঁছে আমরা শেষবারের মতো ইংরেজ প্রভুদের

খেদমতে আর একখানা আবেদন জানালাম যে, মওলানা সাহেবের মৃত দেহটিকে আবরডিনে তার সহোদর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবের কবরের পার্শ্বে সমাহিত করবার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, এ দরখাস্ত খানাও মঞ্জুরী পেল না। সুতরাং গোসল ও জানাজার পর তাকে দ্বীপরের কাছাকাছি ডান্ডাসপেন্টের গোরস্থানে দাফন করা হল।

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার প্রথমা স্ত্রী পানিপথ থেকে লিখে পাঠালো যে, মেয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। আমার মুক্তি পাওয়ার বাহ্য লক্ষণ না দেখে সেখানেই যাতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে তার অনুমতি চাইল। শুভকার্যের খরচাদি উপলক্ষে কিছু টাকা পাঠাতেও লিখলো। আমি তিনশো টাকা, কিছু গহনাপত্র ও কাপড়চোপড় পানিপথে পাঠালাম। লিখলাম তুমি কোন দীনদার পরহেজগার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিও।

আমার জিনিসপত্র পৌঁছলে আমি বিবাহে যোগদান করতে না পারায় ওখানে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। আমার স্ত্রী ও কন্যা অশ্রু বিগলিতকণ্ঠে প্রার্থনা করছিল, হে কাদের, হে করীম, তাঁকেও এই বিবাহ উৎসবে যোগদান করবার তৌফিক দাও।

খোদাওয়ান্দ করীম সেই মুহূর্তেই যেন তাদের ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন। এই সালেরই ৩০শে ডিসেম্বর আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার অর্ডার হয়। এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছার আগেই আমার স্ত্রী জানতে পারে। আমি তাকে লিখে দিলাম, আমি স্বয়ং আসছি, আমি এসেই সকল ব্যবস্থা করব।

মুক্তির তারিখ যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো ততই আগন্তুক প্রত্যেক বোটেই আমার মুক্তির আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এদেশের উপহারযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত জমা করে নিয়ে বিদায়ের জন্য বসে রইলাম।

সকলের মুক্তির আদেশ

অবশেষে ১৮৮৩ সালের ২২শে জানুয়ারী সোমবারে মহারাণী নামক গান বোট এই সংবাদ নিয়ে পৌঁছল যে, ওহাবী বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট যত কয়েদী আছে সকলকেই মুক্তি দিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাদের নিজ নিজ সরকার তাদের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবে। এ সময় আমি মওলানা আবদুর রহীম, মিঞা আবদুল গাফফার, মওলানা তাবারাক আলী, মওলানা আমীরুদ্দীন ও মিঞা মসউদ মোট এই ছয়জন ওহাবী মামলার আসামী ওখানে ছিলাম। আমাদের সকলেরই রেহাই হয়ে গেল।

আমার মুক্তির আদেশ তো পেলাম। এখন আমার স্ত্রীর কি হবে? বলা প্রয়োজন, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলাম। তখন তার মাত্র চৌদ্দ বৎসর কয়েদী জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। সুতরাং সেই বোটেই হিন্দুস্থান গভর্নমেন্টকে জানান হল, যতদিন তার স্ত্রীকে মুক্তি প্রদান করা না হয়, ততদিন সে হিন্দুস্থানে রওনা হতে পারে না। আমার মুক্তির আদেশ পেয়ে আমিও তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব সরকারকে জানালাম, এখানে আমার একটি সুন্দর বাসাবাড়ি আছে, উপরন্তু মাসিক একশত টাকা বেতনে আমি চাকরি করছি। পান্তরে হিন্দুস্থানে আমার বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া সম্ভবত পাঞ্জাবের অফিসারবৃন্দ অহেতুকভাবেই আমাকে পীড়ন করবেন। আমাকে একজন অতীত কয়েদী মনে করে হয়তো কোন চাকরীও না দিতে পারেন। তাই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আমি প্রার্থনা করছি যে, স্বাধীনভাবে আমাকে অত্র কালাপানিতে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হোক, যাতে আমি সময় সময় হিন্দুস্থানে গিয়ে আমার সন্তান সন্ততিদের দেখে আসতে পারি।

পাঞ্জাব সরকার কিন্তু এই আবেদন মঞ্জুর করলেন না। পান্তরে পরিবারবর্গসহ আমাকে ভারতে প্রস্থান করবার নির্দেশ দিলেন। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভারতে আমাকে চাকরী দিতে কোন আপত্তি হবে না। পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের চীফ কমিশনারকে ১৮৮৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে লিখিত ১১৬ নং পত্র অনুসারে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

সঙ্গীদের প্রস্থান

তেসরা মার্চ তারিখে মওলানা আবদুর রহিম, মিঞা আবদুল গাফফার, মওলানা আমিরুদ্দীন ও মওলানা তাবারাক আলী সাহেবান পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রা করে সম্পূর্ণ নিরাপদে আপন আপন গৃহে ফিরলেন। এরপর আটাশে এপ্রিল মিঞা মসউদও রওনা হয়ে গেলেন। একাকী আমি শুধু স্ত্রীর মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম। ১লা মে তার মুক্তির আদেশ এল, কিন্তু তখন সে ছয় মাসের গর্ভবতী। সমুদ্রেও ঝড় তুফানের মৌসুম তখন আরম্ভ হয়েছে। এই সমস্ত অনিবার্য কারণে নভেম্বর পর্যন্ত পোর্ট ব্লেয়ারে বাস করবার অনুমতি চেয়ে নিলাম। ইত্যবসরে আমার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আসবাবপত্র সমস্তই বিক্রয় শুরু করলাম। এবং যেন তেন প্রকারে তা সম্পন্নও হল। বাকী রইল শুধু কাঠের তৈরী আমার শয়ন গৃহ। এখানে কোন মসজিদ ছিল না। সে জন্য অসুবিধা হত। আমি আমার ঘরটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। সকলেই তাতে খুব আনন্দিত

হলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মেজর বার্চ সাহেব বিদ্বেষসৃষ্ট মনোভাব নিয়ে রিপোর্ট দিলেন যে, এই লোক ওহাবী, এই মসজিদও ওহাবীদের দখলে থাকবে। অতএব এই কারণে এখানে মসজিদ স্থাপন করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এই ওহাবী বিদ্বেষ এমন নিঃস্বার্থ সৎকাজেও অন্তরায় হয়ে পড়ল।

পোর্ট ব্লেয়ারের আইন-কানুন ও চালচলন

পোর্ট ব্লেয়ারে অবতরণ করবার পর সেখানকার আনুষঙ্গিক ভৌগোলিক ও আদিম বাসিন্দাদের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এখন তার আইন-কানুন, পোষাক পরিচ্ছদ ও চালচলন সম্পর্কে কিছু বলে এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করছি–

শাসন

এই দ্বীপটি অন্যান্য অঞ্চলের মতো চীফ কমিশনার শাসিত একটি পৃথক দেশ। আন্দামানের চীফ কমিশনার বাহাদুর নিজ পদাধিকার বলে যে কোন এ্যাক্ট ইচ্ছা করেন এখানে জারি করতে পারেন। তিনি তাঁর অধীনস্ত অফিসারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী ক্ষমতা দান করতে পারেন এবং তিনি এখানকার সেশন জজও বটেন। তাঁর আদেশ বা বিচারই ফাইনাল, তার কোন আপীল চলতে পারে না। শুধু ফাঁসির মোকদ্দমার বেলায় গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বাকী দেওয়ানী ও ফৌজদারী যাবতীয় কাজের বেলায় চীফ কমিশনারই সর্বেসর্বা। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন জাহাজ, যাত্রী, মাল বা আসবাবপত্র কিছুই এখানে আসতে পারে না। তাঁর অমতে কোন ব্যক্তি এই স্থান ত্যাগ করতেও অসমর্থ।

চীফ কমিশনার এখানকার রাজধানী রুশদ্বীপে বাস করেন। তাঁর বেতন মাসিক তিন হাজার টাকা।

এই অঞ্চলটি দুই জেলায় বিভক্ত। দক্ষিণ জেলার প্রধান শহর আবরডিন এবং উত্তর জেলার প্রধান চাটুম। উত্তর জেলার কর্তৃপক্ষের অধীনে বেশ কয়েকজন এ্যাসিষ্ট্যান্ট ও একস্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার আছেন।

এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনতন্ত্র ও নিয়মাবলী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে আসছে কিন্তু বরাবর কড়াকড়ি ও কঠোরতার

দিকেই এর গতি। যিনিই চীফ কমিশনার হয়ে নতুন আসেন তিনিই নতুন নতুন আইনের মারফত আরো কঠোরতা বৃদ্ধি করেন। এখানে বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার কয়েদী ভারত থেকে প্রেরিত হয়। বর্তমানে প্রায় চৌদ্দ হাজার কয়েদী অবস্থান করছে। আগেই বলেছি, জাহাজ থেকে অবতরণ করবার এক মাস পর তাদের পায়ের বেড়ী কেটে দেওয়া হয়। তাদের জন্য এখানে কোন জেলখানা নেই। তারা অফিসার কয়েদীদের অধীনে ব্যারাকে বাস করে। দিনের বেলায় ভারতীয় জেলখানার কয়েদীদের মতো কায়িক পরিশ্রম করা বাধ্যতামূলক। দুইবেলা তারা তৈরী আহার পায়। ব্যারাকগুলো পাহারা দেবার জন্য কোন পুলিশ বা সৈন্য নেই। কয়েদী অফিসারেরাই সব রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোট কথা, কয়েদীদের দেখাশোনা করা ও পাহারা দেওয়া, তাদের ভাগ করে কাজে লাগানো এবং তাদের দ্বারা কাজ আদায় করে নেয়ার সকল দায়িত্ব কয়েদী অফিসারদেরই। এরা মাথায় লাল পাগরী ও গলায় চাপরান পরে। খোরাক ছাড়াও এরা পদমর্যাদা অনুসারে গভর্নমেন্ট থেকে নগদ বেতন পেয়ে থাকে। নতুন কয়েদীরা সদ্ভাবে জীবন যাপন সাপেক্ষে তিন চার বৎসর কিছু কিছু বেতন পেতে আরম্ভ করে। বেতনভোগী হওয়ার পর এরাও পাট্রাদার অফিসার নিযুক্ত হয়। দশ বৎসর কাল সৎভাবে জীবনযাপন করবার পর প্রত্যেক পুরুষ কয়েদী টিকিট পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। টিকিট পাওয়ার অর্থ এই যে, কয়েদী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার পেল। এখন সে শহরে বা বস্তিতে যে কোন পেশার সাহায্যে ইচ্ছামতো জীবন যাপন করতে পারে। এরূপ প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি কয়েদীদের বস্তি আছে। এসব বস্তিতে কয়েদীরাই নম্বরদার, চৌকিদার এবং পাটোয়ারী। যারা কৃষি কাজের টিকিট গ্রহণ করে সরকার থেকে তারা গ্রামের ভেতরে পনের বিঘা পরিমাণ জমি পায়। তিন বৎসর পর্যন্ত তাদের খাজনা মাফ। কখন কখন সরকার থেকে তাদেরকে গরু, খোরাক ও টাকা পয়সা সাহায্য দেওয়া হয়। রুটিওয়ালা, মিঠাইওয়ালা বা নাপিত এরাও নিজ নিজ পেশার জন্য মাঝে মাঝে সরকারী সাহায্য পেতে থাকে। তার মানে, টিকিট পাওয়ার পর কয়েদীরা আযাদী লাভ করে, সে ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারে।

নারী কয়েদীরা নারী কয়েদী অফিসারদের অধীনে একটি পৃথক দ্বীপে ব্যারাকে বাস করে। ব্যারাকে বাসকালে যাতে তাদের নৈতিক চরিত্রের পতন না ঘটে, সেজন্য যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ব্যারাকে তারা যাঁতা পেশা, সেলাই এমনি ধরনের হালকা কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা পাঁচ বৎসরেই আযাদীর টিকিট পেয়ে থাকে। কিন্তু টিকিট পেলেও, বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যুবতীদের ব্যারাকের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। পাঁচ বৎসর মেয়াদ

ফুরোবার পর মেয়েরা ইচ্ছানুসারে যে কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় টিকিট ওয়ালা ছাড়া অন্য কারুর বিয়ে করা নিষিদ্ধ। বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের দ্বীপে গিয়ে যাকে পছন্দ করে প্রয়োজন হলে টাকা পয়সা দিয়েও তার সম্মতি আদায় করে। দুইজনে রাজী হওয়ার পর উভয়ের স্বীকৃতি ও প্রণয়ের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করবার একটি অঙ্গীকার পত্র চীফ কমিশনার সাহেবের সম্মুখে বসে লিখে দিতে হয়। তারপর স্ত্রী স্বামীর ঘরে চলে যায়। টিকিট প্রাপ্ত কয়েদীরা দেশ থেকে তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকেও আনতে পারে। বিশ বৎসর কাল কোন কয়েদী সৎভাবে জীবন যাপন করলে সে মুক্তিও পেয়ে থাকে। মুক্তি লাভের পর ইচ্ছা করলে ঐ দেশেও থাকতে পারে, নয় স্বদেশে চলে যেতে পারে। টিকিট লাভের পর হালাল রোজগারের মারফত কয়েদী লক্ষ টাকা সঞ্চয় করলেও কারু কিছু বলবার নেই। কিন্তু টিকিট না পাওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে বা বিনা অনুমতিতে নিজের কাছে বা পরের কাছে কোথাও টাকা পয়সা জমা রাখতে পারে না। শ্রমরত কয়েদী ব্যারাক ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতি এক বৎসর তিন মাসে একখানা করে চিঠি দেশে পাঠাতে পারে। দেশ থেকে একখানা চিঠি পেতে পারে। পক্ষান্তরে টিকিটপ্রাপ্ত কয়েদী মাসে একটি পত্র পেতে পারে ও দিতে পারে।

বিচিত্র মানুষের মেলা

পোর্ট ব্লেয়ার এমনি স্থান যেখানে দুনিয়ার প্রায় সব জাতির এক অদ্ভুত সমাবেশ। এখানে চীনা, বর্মী, বাঙ্গালী, নিকোবরী, কাশ্মীরী, ইরানী, কামরানী, আরবি, ফার্সী, হাবশী, পর্তুগীজ, দিনেমার, এ্যামেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী এবং ভারতের সমস্ত জেলা ও সমস্ত শহরের লোক, যথা– ভটিয়ৎ, নেপালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, উড়িয়া, গুজরাটী, পেশোয়ারী, আসামী, কর্নাটকী, বুন্দেলখণ্ডী, মাদ্রাজী, কোল, সাঁওতাল, তেলেঙ্গী, মৈথিলী, মারাঠা, বাঙ্গালী– সমস্ত মওজুদ। এরা পরস্পর এক সঙ্গে বসে কথা বলবার সময় মাতৃভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু এখানেও কোর্ট ও বাজারের ভাষা হিন্দুস্থানী। সমস্ত দেশের লোক এখানে এসে আপনা আপনিই হিন্দুস্তানী ভাষা শিখে ফেলে। আমার মনে হয়, গোটা পৃথিবীর মধ্যে এক সঙ্গে এত বিভিন্ন জাতির বাস আর কোথাও নেই। যেন একটি অপূর্ব মেলা। এই ধরাপৃষ্ঠে এত বিভিন্ন জাতির সমবায়ে এহেন মেলা আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী পুরুষ ও মাদ্রাজী স্ত্রীলোক, কিংবা ভূটানী পুরুষ ও পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক অথবা সিন্ধি পুরুষ ও কর্ণাটকী স্ত্রীলোক প্রভৃতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ, যারা একে অপরের ভাষা বুঝতে অসমর্থ। অথচ যখন স্বামী স্ত্রী

তর্ক লাগে বা তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তখন একে অপরকে নিজ নিজ ভাষায় গাল দিতে থাকে, কিন্তু কেউ কারো গাল বুঝতে পারে না। তখন বাস্তবিকই এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানকার বিয়ে-শাদি উপলক্ষে দেশ দেশান্তরের মেয়েরা সমবেত হয়। তারা আপন আপন ভাষায় গান গায়, আপন আপন ভঙ্গিতে নৃত্য করে এবং আপন আপন দেশীয় পোষাক পরিধান করে। এই দৃশ্য পরম উপভোগ্য।

হিন্দুস্থানের বহু পুরাতন ব্যাধি জাতিভেদ প্রথার এখানে অস্তিত্ব নেই। কোন মুসলমান পুরুষ যে কোন শ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোককে বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে থাকে। অনুরূপভাবে হিন্দুদের জন্যও হিন্দু হওয়াই যথেষ্ট, একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া অনাবশ্যক।

অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, নিজ নিজ পোষাক-পরিচ্ছদ, সংস্কার, বোলচাল ও খানাপিনা প্রত্যেকের নিকটেই প্রিয়।

জংলীরা জঙ্গলে বাস, উলঙ্গ চলাফেরা ও কীটপতঙ্গ আহার্য নিয়েই সুখী। আমাদের খাদ্য দেখে তারা নাক সিটকায়, সে পোলাও-কোর্মাই হোক না। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে তারা দারুণ অস্বস্তিবোধ করে। বর্মী ও চীনারা আমাদের ঘৃতজাত খাদ্যের গন্ধ পেলেই নাকে কাপড় দিয়ে সরে পড়ে। আমাদের পোলাও কালিয়া ও কোর্মার গন্ধে আরবিদের মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হয়। ইংরেজরা আমাদের আতরের গন্ধ সইতে পারে না। মোট কথা, বাল্যকাল থেকে যে লোক যে জিনিসে অভ্যস্ত, তার কাছে তাই উত্তম।

আন্দামান থেকে বিদায়

নয়ই নভেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। সেদিন আমাদের বিদায়ের প্রাক্কালে বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করলাম। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল 'আঠারো বৎসর এখানে অবস্থানের পর আজ আমি খাকসার চিরদিনের জন্য আপনাদের খেদমত থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্থান যাত্রা করছি। এই উপলক্ষে যে সামান্য আহার প্রস্তুত করা হয়েছে, আশা করি তাতে শামিল হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।'

যাঁর কাছেই এই নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছালো বিনা দ্বিধায় তিনিই ছুটে এলেন। রওনা হবার মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে দুপুর বেলা আমার বাড়িতে এই আহারের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার বিদায়ে সমবেত বন্ধুদের চোখে অশ্রুর প্লাবন জাগলো। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে উঠে যিনিই কিছুই বলতে চেষ্টা করলেন, দুই এক কথা বলতেই তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। আমার নিজেরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু

বইঘর ও রোকন
একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। মনের কথা মনেই রয়ে গেল, কিছুই বলা হল না।

সেদিন ছিল শুক্রবার। মওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের সঙ্গে শেষ জুমআর নামায আদায় করে স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ রুশদ্বীপে চলে এলাম। আমাকে বিদায় জ্ঞাপন করবার জন্য শেষ পর্যন্ত বহু মেয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছিল। বিকেল চারটার সময় রুশদ্বীপ থেকে নৌকাযোগে গান বোটের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তীরবর্তী অসংখ্য নর-নারী আনন্দে ও দুঃখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রোদন করছিল।

এসময় আমি আমার স্ত্রী ও আমাদের ছয়টি সন্তান আমরা মোট আটটি প্রাণী ছিলাম। আমার সঞ্চিত ও স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সর্বমোট তখন আট হাজার টাকা। আমার অতীত স্মৃতি স্মরণে এলো। মনে পড়ে ১৮৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে এই ঘাটেই নেংটি পরা অবস্থায় নিতান্তই একাকী জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলাম। আর আজ? আজ এহেন দুঃখ কষ্টের স্থান থেকেই আট হাজার টাকা ও আটটি প্রাণী সমবেত ফিরে চলেছি। একি আশ্চর্য কুদরত! সেদিন যমুনা জাহাজ আমাকে যে স্থানে নামিয়ে দিয়েছিল আজ যে জাহাজে আরোহণ করতে যাচ্ছি, তাও ঠিক সেই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ভোরবেলা জাহাজ থেকে নেমেছিলাম, আর আজ সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে উঠছি। আঠারো বৎসর কাল আমার এই দ্বীপে অবস্থানকে একটি দীর্ঘ স্বপ্ন বলে মনে হল। মনে হচ্ছিল, আজই সকাল বেলা যমুনা জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এই বিকেল বেলায় ফিরে চলেছি।

www.boighar.com

বিদায়

যাই হোক, বিকেল পাঁচটার সময় মহারাণী নামক জাহাজে উঠে তার এককোণে নিজেদের স্থান করে নিলাম। দেখি আমরা ছাড়া আরো বহু মুক্তিপ্রাপ্ত নর-নারী– ইউরোপীয় ও হিন্দুস্তানী যাত্রী আছে। মৌসুম বেশ মনোরম। এবং সমুদ্র স্বাভাবিক। ঢেউ বা তুফানের নাম গন্ধ নেই। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরাও সজল নয়নে আন্দামান দ্বীপগুলিকে একে একে বিদায় জানিয়ে পশ্চাতে ফেলে যেতে থাকি। ক্রমে রাত্রি হল। জ্যোস্নালোকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের জাহাজ কোকোদ্বীপে উপনীত হলো। দুইদিন চলবার পর কিছু বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। যাত্রীদের তাতে অসুবিধে কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হতেই বৃষ্টি একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর তাতে দুঃখ কষ্টের শেষ। আলী রেজা

নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী যারপর নেই, আমাদের যতন নিচ্ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি আমাদের জন্য মাছ-মাংস, নানা রকম উৎকৃষ্ট খাবার, চা-কফি বরফ-ফলমূল, মণ্ডা-মিঠাই সর্বদাই তৈরী রাখতেন।

বেশ আরামেই সফর কেটে গেল। যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, নূরুদ্দীন নামক একজন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর স্ত্রীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো। পানিতে ভিজে, শীতে তখন যাত্রীদের করুণ অবস্থা। তেমনি প্রসূতিও ঠাণ্ডায় কম্পিত কলেবরে তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিল। এখানে আসওয়ানী (এক প্রকার ঔষধ) কোথায় পাওয়া যাবে? কাজেই প্রসূতির কপালেও ডালভাত। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, মা ও শিশু কারুর অসুখ বিসুখ হয়নি। উভয়েই সুস্থ। জাহাজ যখন কলকাতায় পৌঁছলো শিশুর বয়স তখন মাত্র দুই দিন। কিন্তু তাতে কি! মা তর তর করে জাহাজ থেকে নেমে গেল। মুক্তির এমনি মহিমা। স্বাধীনতার এমনি আনন্দ!

ঘরের পানে

চারদিন চার রাত্রি জাহাজে অতিবাহিত করবার পর তেরই নভেম্বর আমরা কলকাতায় পৌঁছলাম। সেখানে চীনা পাড়ায় মওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সহোদর মওলানা আবদুর রউফ সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠি। এখানে তিন দিন কাটালাম। তৃতীয় দিন রাত ৯টার সময় কলকাতা থেকে রেলযোগে আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করি। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে কানপুর, কানপুর থেকে আলীগড়, আলীগড় থেকে সাহারানপুর। এবং সেখান থেকে আম্বালা পর্যন্ত মঞ্জিলে টিকিট কিনে কিনে চললাম। এরপর উনিশে নভেম্বর রাত নটার সময় ক্যাম্প আম্বালা ষ্টেশনে উপনীত হই। কলকাতা থেকে আম্বালা পর্যন্ত দুইজন সেপাই ও একজন নায়েক আমার ছেলেমেয়ে ও মালপত্র দেখা শোনার জন্য আর্দালী হিসাবে আমার সঙ্গে ছিল।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা আমি আম্বালা শহর পৌঁছলাম। মনে মনে আমার এই বিশ বৎসরকাল সফরের পথ ভারতের মানচিত্রে পরিমাপ করি। দেখতে পেলাম, আম্বালা থেকে লাহোর ও বোম্বাই হয়ে পোর্ট ব্লেয়ার এবং পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কলকাতা হয়ে আম্বালা পর্যন্ত মোট প্রায় সাত হাজার মাইল অতিক্রম করেছি। অন্য কথায়, ভারতের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা ছাড়া গোটা ভারতের সমগ্র সীমাপরিমাণ পথ ভ্রমণ করা হয়েছে। ক্যাম্প আম্বালার সদর বাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে পরিবার নিয়ে সেখানে উঠলাম।

এখানে ওদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে এগারোই ডিসেম্বর তারিখে রেলযোগে দিল্লী রওনা হলাম। সেখানে একরাত্রি কাটলো। তারপর দিন বিকেলে এক্কা

বইঘর ও রোকন
গাড়ি করে পানিপথে পৌঁছি। ঘটনাক্রমে পুরো বিশ বছর পর এও ঠিক সেই তেরই ডিসেম্বর। এই তারিখেই বিশ বৎসর আগে আমি পানিপথ থেকে দিল্লী পলায়ন করেছিলাম। এই দৈব যোগাযোগে অবাক বিস্ময়ে মনে হলো, আজই ভোরবেলা আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে পানিপথে রেখে দিল্লী গিয়েছিলাম এবং দিল্লী থেকে আজই পানিপথে ফিরে এলাম।

যাই হোক, মাগরিবের নামাজের পর পানিপথে আমার বাড়িতে পৌঁছলাম। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রী ও আমার কন্যা আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। আমার ফেরার হওয়ার দিন যার বয়েস ছিল মাত্র কয়েকমাস সেই মেয়ে এখন বিশ বৎসরের পূর্ণ যুবতী।

পানিপথে পাঁচদিন থেকে কর্ণাল হয়ে থানেশ্বরে গেলাম এবং সেখানে একরাত্রির মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আবার আম্বালায় ফিরে এলাম। যেখানেই গিয়েছি, আমাকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় করেছে।

দেশে পৌঁছে যখন দেখলাম সরকারী আক্রোশে নিপতিত বলে কোন দেশী লোকও আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করেন না, তখন বাধ্য হয়ে পাঞ্জাব সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি সরকারী চাকরির জন্য দরখাস্ত করলাম। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আম্বালা বিভাগের কমিশনার লিখলেন (পত্র নং ২৪, তাং এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) যে, মুহম্মদ জাফরকে চাকরি বা ওকালতি করবার অনুমতি কিছুতেই দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, সুযোগ পেলেই সে পুনরায় সরকারের সঙ্গে শত্রুতা করবে। চাকরি ও ওকালতি উভয় দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে আপীল-নবিশী কাজের অনুমতি চেয়ে আবার দরখাস্ত করি। কিন্তু তাও না-মঞ্জুর হয়ে গেল।

আবেদন

আমার প্রতি লোকাল গভর্ণমেন্টের মনোভাব যখন এই, তখন আমি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিন বাহাদুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে জানালাম। অবশ্য আজ পর্যন্ত তাঁরা এর জবাবদানে আমাকে অনুগৃহীত করেননি। এরপর আমার তৃতীয়া স্ত্রী, যাকে কর্তৃপক্ষ পোর্টব্লেয়ার থেকে আমার সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য করেছিল, সে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের নিকট একখানা আবেদন পত্র প্রেরণ করল। তাতে লেখা ছিল– ১. যতদিন সরকার বাহাদুর আমার স্বামীকে নজরবন্দী করে রাখবেন, যে কারণে তিনি জীবিকার্জনের কোন উপায়ই করতে পারছেন না, ততদিন পর্যন্ত যেন সরকার আমাদের খোরাক পোষাক ও থাকবার জন্য একখানা বাড়ির ব্যবস্থা করেন। ২. আর যদি খোরাক পোষাক প্রদান করা

সরকারের পক্ষে কষ্টকর হয়, তাহলে তারা যেন অবশ্য অবশ্য আমাদের আজাদ করে দেন। কারণ, নজরবন্দী রেখে খোরাক পোষাক না দেওয়ার মতো অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। ৩. এর কোনটাই যদি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকারী খরচে যেখান থেকে আমাদের আনা হয়েছে, সেখানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

সরকার বিদ্বেষপরায়ণ না হলে উল্লিখিত তিনটি প্রার্থনার একটি নিশ্চয় মনজুর করতেন। দিল্লীর কমিশনার সাহেবের নিকট অভিমত চাইলে, তিনি লিখেছিলেন, মুহম্মদ জাফরকে আজাদ দেওয়াই উচিত। যাতে সে নিজের রুজির ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাবের একজন নামকরা খয়ের খাঁ স্যার বাচ্চন সাহেরেব 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' জবাব (পত্র নং ১৪১৭, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর তরফ থেকে দিল্লী বিভাগের কমিশনারের নিকটে)-এর ফলে এই মতেরও কোন দাম রইল না। সাহেব প্রবরের জবাব কাজী রতল বুক সাহেবের বিখ্যাত ফয়সালা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তিনি লিখলেন, 'মুগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ও বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল দিল্লী জেলা ব্যতীত পাঞ্জাবের যে কোন শহরে মহম্মদ জাফর বাস করতে পারে। কিন্তু যেখানেই যাক না কেন, সর্বত্র তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থাকবে, যেন কোন মহাজন বা সওদাগর অজ্ঞতাবশত তাকে চাকরিতে নিয়োগ না করে। পাঞ্জাবেও কোন রাজা বা নওয়াবের রাজ্যে যেতে তাকে ইজাজত দেওয়া যাবে না।'

এই সমস্ত বিদ্বেষমূলক নির্দেশাবলীর পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায়, আমি যেন আমার সন্তান-সন্ততিসহ অনাহারে মৃত্যুবরণ করি। আমার আশ্চর্য লাগে এই যে, সরকার বাহাদুরের নিয়াত যদি এই ছিল, তাহলে আমার মতো মুসলমানকে যার আচরণ সম্পর্কে সমগ্র হিন্দুস্তানের মুসলমান কান পেতে আছে, মুক্তি দিয়ে ফিরিয়ে আনবার কি প্রয়োজন ছিল।

যাই হোক, আমার এই বেকার থাকাকেও আমি আল্লাহ পাকের একটি নিয়ামত মনে করি। সত্যিকার কথা এই যে, ক্ষুণ্নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থা, চাকরি বা কোন কাজ, কিছুই না থাকার ফলে আমি যে অবসর ও নির্জনতা পেলাম এবং আমার যে ঈমানের উন্নতি হলো, তা ওকালতি ও চাকরি অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়। আমার প্রতি তাঁর নেক নজর ও নেয়ামতের বর্ণনা কতই আর করবো? আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অন্য কারুর উপর ন্যস্ত না হয় তাঁর এই অভিপ্রায়ের একটি উৎকৃষ্ট নজীর এই যে, ক্যাপ্টেন টেম্পল সাহেব যখন বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে আমার দেখাশোনা করছিলেন তখন আমার মনোযোগ মুসাব্বেবুল

বইঘর ও রোকন
আসবাবের প্রতি না হয়ে এই সাহেবের অনুকম্পার প্রতিই নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই শেরেকী মনোভাবে আমার লিপ্ত হওয়া সেই 'আহদাছ লা-শরীক'-এর আদৌ মনঃপূত ছিল না। তাই তিনি টেম্পল সাহেবকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করে বাহ্যিক কোন উপায় ছাড়াই আমার প্রতি তাঁর রাজ্জাকী গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রাকালে আমার মনে স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, আমি যেহেতু আরবি, ফারসী, উর্দু, ইংরেজি, নাগরী প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষিত এই ইংরেজি আদালতের আইন-কানুনসমূহ ও সরকারী চাকরির নিয়মাবলী সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জন করেছি সুতরাং বিরাট ভারত রাষ্ট্রে কখনই আমার রুজী রোজগারের অভাব হবে না। কিন্তু এই কারুনী চিন্তাধারাও সেই কাদেরে-মোতলেবের অভিপ্রেত ছিল না। তাই দেখতে পাই, আমার এত জ্ঞান-গরিমা থাকা সত্ত্বেও মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি চাকরি যোগাড় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

০ ০ ০

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব এই পর্যন্ত পড়ে থেমে গেলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– মওলানা মুহম্মদ জাফর থানেশ্বরী সাহেব তাঁর কিতাব 'তাওয়ারীখ-ই-আজিব' অর্থাৎ 'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী'তে এই পর্যন্ত লিখেছেন। এরপর আর কিছু লেখেননি। কাজেই, আমার আর কিছু পড়ার নেই।

কাসিদ সাহেবের ছেলে মাহমুদউল্লাহ মাহমুদ পাশেই মরিয়ম বিবির কাছে ঘুমিয়ে ছিল। এই সময় সে একবার একটু জোরে কেঁদে উঠলো। এতেই হুঁশ ফিরলো সকলের। কাসিদ সাহেব দ্রুত দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন– এই রে! রাতও তো আর বাকী নেই। একটু পরেই ফযরের আযান পড়বে মসজিদে।

হজরত আলী বললো– সেকি! তাহলে তো আর শুয়ে পড়া যাবে না।

কাসিদ সাহেব বললেন– না না, শুয়ে পড়েবে কি? যাও যাও, সবাই গিয়ে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে অজু করে এসো। ফজরের নামায আদায় করে গতকালের মতো একবারে ঘুমিয়ে পড়বে। যাও...

সত্যি সত্যিই রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলে অজু করে আসতে আসতেই ফজরের আযান শুরু হলো। এতে করে, ফজরের নামায আদায় করে তবে শুয়ে পড়লেন সকলে।

একটানা ঘুম দিয়ে পৌনে দুপুরের দিকে ঘুম থেকে সকলেই উঠলেন।

বইঘর ও ব্লগ
ইতিমধ্যেই ময়নার মা ও মরিয়ম বিবি নাশ্‌তা-পানি তৈরী করে রেখেছিল। হাতমুখ ধুয়ে এসে কাসিদ সাহেবসহ সকলেই একসাথে নাশ্‌তা-পানি করলেন। এরপর কাসিদ সাহেব মেহের আলীকে দুপুরের খাওয়ার কথা বলতেই মেহের আলী শশব্যস্তে বলে উঠলো– না না, তা আর মোটেই সম্ভব নয় ভাইজান। ওদিকে আমার বাড়ি-ঘরের কি অবস্থা হলো, কে জানে? শুধু ঐ দুই মহান ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত শোনার টানেই এ কয়দিন পড়ে রইলাম এখানে।

কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব বললেন– তা কেমন শুনলে? দ্বীপান্তরে গিয়ে অসংখ্য ঈমানদার আলেম উলামাদের যে অবস্থা হয়েছিল তা কেমন বুঝলে?

মেহের আলী বললো– করুণ, ভাইজান করুণ! তাঁদের সেই দুর্দশার কথা মনে উঠতেই জান আমার কেঁপে উঠছে এখনো। তাঁদের ঐ স্মৃতি আজীবন আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।

মেহের মিয়া!

তবে একটা সান্ত্বনা ভাইজান, আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত দান করেছেন। যাঁরা এখন বেঁচে আছে, তাঁদেরও করবেন।

: জরুর জরুর। এতে কোন সন্দেহ নাই।

তা আমরা এখন উঠি ভাইজান। আর একদণ্ডও আমাদের অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখনই আমরা, মানে আমি আর মর্জিনা বিবি বাড়ির দিকে রওনা হই।

যাবে? ঠিক আছে, এখন যাও। তবে কিছুদিন পরে আবার এসো কিন্তু–

অবশ্যই আসবো ভাইজান, অবশ্যই আসবো। এখন চলি– আসসালামু আলাইকুম!

ওয়ালাইকুমস সালাম। হজরত মিয়া, তুমি সাথে যাও। এদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো...

হজরত আলী সাগ্রহে বললো– আচ্ছা ভাইজান, আচ্ছা।

হজরত আলী তার শক্ত লাঠিখানা হাতে নিয়ে মেহের আলীদের সাথে রওনা হলো। হজরত আলীর হাতে লাঠি দেখে মেহের আলী হেসে বললো– কি ব্যাপার? একেবারে লাঠি হাতে বেরুলে যে হজরত আলী ভাই!

হজরত আলী বললো– লাঠি হাতে বেরোনই ভাল। পথে প্রান্তরে শেয়াল কুকুরদের কথা বাদই দিলাম, এখন যা দিনকাল পড়েছে, তাতে বাঘেরা কিছুটা খামুশ হলেও ফেউদের তাফালিং তো কমেনি।

তা বটে, তা বটে।

ঘাটের কাছাকাছি আসতেই যে লোক মেহের আলীর বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল বৈঠা

বইঘর ও রোকন

হাতে সে লোক হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো। তা দেখে মেহের আলী কিছুটা শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার মোসলেম মিয়া? তুমি হঠাৎ এদিকে?

পাহারাদার মোসলেম মিয়া বললো– তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম মেহের ভাই। সেই যে এলে, তোমাদের আর ফেরার নামটি নেই। তাই তোমাদের ডাকতে যাচ্ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা। তা বাড়িতে আমার সব ঠিকঠাক আছে তো?

তা আছে। দুই বাড়ি সামলানো আমার পক্ষে কষ্টকর হলেও, সব ঠিক রেখেছি। পান থেকে চুন খসতে দেইনি।

ধন্যবাদ মোসলেম মিয়া, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি।

বেশ। এবার চলো। খেয়া নাও এইমাত্র ওপারে চলে গেল। আমরা ঘাটে গিয়ে একটু বসি। এসো হজরত আলী ভাই, এদের এগিয়ে দিতেই এসেছিলে বোধ হয়? এদের নায়ে তুলে দিয়ে তবে তুমি যাবে। এখন এসো–

মর্জিনা খাতুনসহ এরা তিনজন ঘাটে এসে বসলো এবং খেয়া নাও ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই কে একজন লোকের সাথে কথা বলতে বলতে সেখানে এলো ফটিক চান ফটকে। ঘাটে কারা বসে আছে, সেটা লক্ষ্য করলো না তাদের দুইজনের কেউই। সাথের লোকটি ফটকেকে বললো– সবই তো জানলাম গোয়েন্দা সাহেব, কিন্তু একটা কথা জানা হলো না।

ফটকে বললো– একটা কথা! কি কথা?

লোকটি বললো– আমাদের এই মানিকচক বাজারের একটা লোকের কথা।

মানে?

মানে, আমাদের এই মানিকচক বাজারের ঐ বিদ্বান ব্যক্তি, মানে কাসিদ আহসান উল্লাহকে এক বছরের অধিকাল হলো দেখছিনে। কোথায় গেল লোকটা? আপনি গোয়েন্দা মানুষ। নিশ্চয়ই তার খবর আপনি জানেন?

ফটিক চান ফটকে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– ট্যান্টেনাস ট্যান্ট! আলবত জানি।

জানেন? সে এখন কোথায়?

www.boighar.com

দ্বীপান্তরে, দ্বীপান্তরে। আন্দামানের দ্বীপান্তরে।

: দ্বীপান্তরে?

আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। এক ঠ্যালায় ব্যাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

বইঘর ডটকম

: বলেন কি!

নেংটি মেরে বসে সে এখন দিনরাত পাথর ভাঙ্গছে আন্দামানে।

চুপ করে বসে থেকে হজরত আলীরা এতক্ষণ এদের কথা শুনলো। এবার হজরত আলী, মেহের আলী এবং মোসলেম মিয়া লাঠি বৈঠা হাতে তিনজনেই একসাথে হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো– তবে রে শয়তান! উনি পাথর ভাঙ্গছেন আন্দামানে?

www.boighar.com

চোখ তুলে চেয়ে লাঠি বৈঠা হাতে এদের তিন জনকে একসাথে দেখে আঁতকে উঠলো ফটকে। হজরত আলীর ভাইজানের কিছু হলে ফটকেকে নির্ঘাত খুন করবে হজরত আলী– এ হুঁশিয়ারী হজরত আলী আগেই ফটকেকে দিয়েছিল। এবার তার একদম সামনে পড়ায়, আঁতকে উঠে ফটকে চিৎকার দিয়ে বললো– ওরে বাবারে! খুন করলো, আমাকে খুন করলো। বাঁচাও... বাঁচাও...

বলেই দৌড় দিলো ফটকে। সদর রাস্তা ছেড়ে সে জঙ্গলের পথ ধরলো এবং প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো বন জঙ্গল কাঁটা-গোঁজা ভেঙ্গে!

আলহামদুলিল্লাহ

স মা প্ত

www.boighar.com

বইঘর ও রোকন

শফীউদ্দীন সরদার রচিত গ্রন্থসমূহ

www.boighar.com

❖ ঐতিহাসিক উপন্যাস

- বখতিয়ারের তিন ইয়ার
- দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত
- রূপনগরের বন্দী
- বখতিয়ারের তলোয়ার
- গৌড় থেকে সোনারগাঁ
- যায় বেলা অবেলায়
- বিদ্রোহী জাতক
- বার পাইকার দুর্গ
- রাজ বিহঙ্গ
- শেষ প্রহরী
- বারো ভূঁইয়া উপাখ্যান
- প্রেম ও পূর্ণিমা
- বিপন্ন প্রহর
- সূর্যাস্ত
- পথহারা পাখি
- বৈরী বসতি
- অন্তরে প্রান্তরে
- দাবানল
- ঠিকানা
- ঝড়মুখী ঘর
- অবৈধ অরণ্য
- দখল
- রোহিনী নদীর তীরে
- ঈমানদার
- শাহজাদী
- লাওয়ারিশ

❖ কবিতা

- সার্বজনীন কাব্য

www.boighar.com

❖ কল্পকাহিনী

- সুলতানের দেহরক্ষী

❖ ভ্রমণ কাহিনী

- সুদূর মক্কা মদীনার পথে

❖ সামাজিক উপন্যাস

- রাজনন্দিনী
- অপূর্ব অপেরা
- শীত বসন্তের গীত
- চলন বিলের পদাবলী
- পাষাণী
- দুপুরের পর
- রাজ্য ও রাজকন্যারা
- থার্ড পণ্ডিত
- মুসাফির
- গুনাহগার

❖ রম্য রচনা

- রাম ছাগলের আব্বাজান
- চার চান্দের কেচ্ছা
- অমরত্বের সন্ধানে [রকম

❖ শিশু সাহিত্য

- ভূতের মেয়ে লীলাবতী
- পরীরাজ্যের রাজকন্যা
- রাজার মেয়ে কবিরাজ

❖ নাটক

- গাজী ম-লের দল
- সূর্যগ্রহণ
- বন মানুষের বাসা
- রূপনগরের বন্দী
- কাকড়া কেত্তন

❖ কাব্য নাট্য

- দীপ দুর্নিবার
- রাজপুত্র

www.boighar.com